

KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHAN KENDRA  
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. KLMGK 200	Place of Publication ১৪ মার্চ পত্রিকা, ঢাকা-১৬
Collection KLMGK	Publisher শ্রী ৪২০০০
Title ভগ্নাত	Size 7" x 9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number ১৪/১ ১৪/৪	Year of Publication প্রতি- (১৪) ১৪১১ 11 Jan 2005 প্রতি- (১৪) ১৪১২ 11 Sep 2005
	Condition : Brittle - Good ✓
Editor অরুণ গোস্বামী	Remarks :

D Roll No. KLMGK
------------------

# চক্রবাক্স

বর্ষ ৬৪ সংখ্যা ৪ শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪১২

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি

ও

গবেষণা কেন্দ্র

১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি-নির্ভর মূলত বস্তুবাদী সভ্যতায়  
মানুষ বাহ্যত পরিবর্তনশীল, কিন্তু তার অন্তরসত্তাও কি তাই?  
এই প্রশ্নেরই উত্তর সন্ধানে পূর্ব ইউরোপের অগ্রণী চিন্তাবিদ  
ভার্কাব হাভেলের সদর্ভ 'মানুষের নবমূল্যায়ন'।

বিশ্বজিৎ রায়ের গবেষণাধর্মী নিবন্ধ—

'গ্রন্থ-বিজ্ঞাপন : নির্মাণ, জ্ঞাপন ও নীরবতা'।

১৯৭৪ সালে রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত প্রয়াত  
ননীমাধবচৌধুরীর অপ্রকাশিত আত্মকথার সূচনা—

প্রমথ চৌধুরীর সময়ের কথা, মজঃফরপুরের  
স্বদেশীদের সশস্ত্র মুক্তি প্রয়াসের কথা।

সম্পাদনায় সুমিতা চক্রবর্তী।

'বাক সংস্কৃতি নির্মাণে ডিরোজিওর অবদান'—

ড. শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়ের গবেষণা ও  
মৌলিক বিশ্লেষণ।

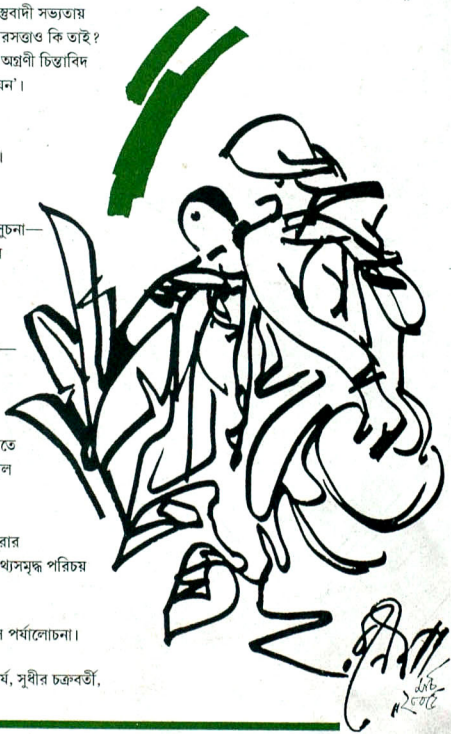
'ভাঙা পথের রাজা ধুলায়'-এ এবারের কিস্তিতে

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সতীশচন্দ্র ঘোষ, জেনারেল  
খিমাইয়ার কথা।

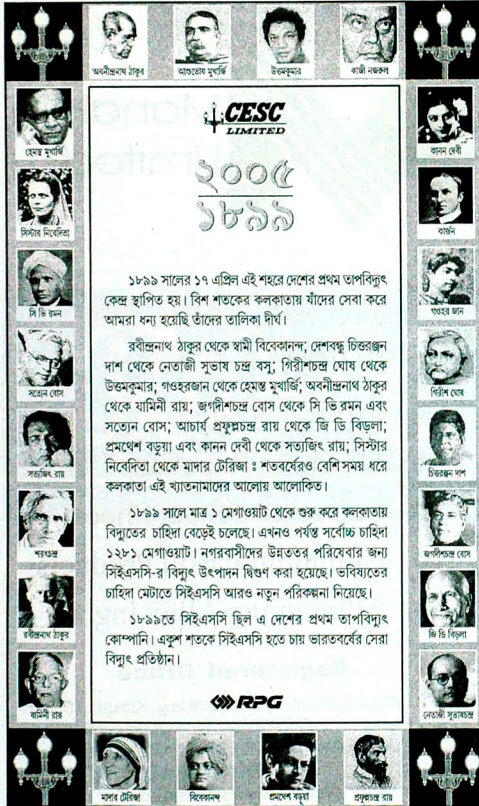
প্রায় ষাট বর্ষ ব্যাপী রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ত্রিপুরার  
রাজপরিবারের গভীর হৃদয়তার সম্পর্কের তথ্যসমৃদ্ধ পরিচয়  
দিয়েছেন প্রসাদরঞ্জন রায়।

বাংলা বানান ও বর্ণমালা সংস্কারের ইতিহাস পর্যালোচনা।

মূল্যবান গ্রন্থসমালোচনায়— সৌরীন ভট্টাচার্য, সুধীর চক্রবর্তী,  
কুমার রায় প্রমুখ।







কলিকাতা পিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি  
ও  
গবেষণা কেন্দ্র  
১৮/এম, ঢামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

বর্ষ ৬৪ সংখ্যা ৪  
শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪১২

চুপ

### প্রবন্ধ

- মানুষের নবমুখ্যায়ন ভদ্রাব হাভেল ২১৭
- গ্রন্থ-বিজ্ঞাপন : নির্মাণ, জাপান ও নীরবতা বিশ্বজিৎ রায় ২২০

### কবিতা

২২৯-২৩৬

- মণিকৃষ্ণ ভট্টাচার্য : সুরজিৎ দাশগুপ্ত & অমিত্যভ গুপ্ত & মুহম্মদ মতিউররাহ
- সুদীপ দে সরকার : মেঘ মুখোপাধ্যায় : পবিত্র মুখোপাধ্যায় : কালীকৃষ্ণ গুহ

### ধারাবাহিক স্মৃতিচারণ

- আমার সময়ের কথা নবীমাদব চৌধুরী ২৩৭
- ভাঙা পথের রাজ্য ধূলায় সুবর্ণেন সেনগুপ্ত ২৪৯

### প্রবন্ধ

- বাক-সংস্কৃতি নির্মাণে ডিরোজিওর অবদান শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় ২৫৭

### ছোটগল্প

- কেন্দ্রানুকূল্য সূভাষ ঘোষাল ২৬৫

### সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতি

- ত্রিপুরা ও রবীন্দ্রনাথ প্রসাদরঞ্জন রায় ২৭২
- বাংলা বানান ও কবীমালা সংস্কারে চাই দুই বাংলার যৌথপ্রয়াস সূর্য্যংগ ভট্টাচার্য ২৭৮

### গ্রন্থসমালোচনা

২৮৫-৩০৪

সম্পাদক : আবদুর রাউফ

শিল্পপরিচালনা : রশ্মি আয়ন দত্ত

সম্পাদনা সহকারী : মেঘ মুখোপাধ্যায়

উপদেষ্টামণ্ডলী

শঙ্খ ঘোষ

দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

সুবর্ণেন সেনগুপ্ত

রশ্মি আয়ন দত্ত

তুষার তালুকদার

### স্মরণে

- সদ্যপ্রয়াত কবি ডাক্তার চক্রবর্তী তারাপদ আচার্য ৩০৫
- চিঠিপত্র : শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : হিরন্ময় ভট্টাচার্য ৩০৮

মূল্য ১৫  
ডাক ১০

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক ইমেজ আইডিয়েল প্রিন্টার ১০৫ পদ্মানবতলা রোড  
কলকাতা-৪১ থেকে মুদ্রিত এবং ৫৪ পঞ্চদশ আভিভিট, কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত  
অক্ষর বিন্যাসে ক্যাটস আই ● ৪৪ রিয়েন ধর সরণি, কলকাতা ১২

নং ১০৩০৭৯০

তোমার ছায়ায় তোমার মায়ায়  
২০০ বছর ধরে....

**State Bank of India**  
With you all the way since 1806  
Helpline : 1600 345 3455  
www.statebankofindia.com

বর্ষ ৬৪ সংখ্যা ৪

জুলাই

শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪১২

## মানুষের নবমূল্যায়ন ভাষ্কর হাভেল

‘মা’ মানুষের নবমূল্যায়ন’ সম্বন্ধটি আসলে একটি লিখিত ভাষণ। The New Measure of Man নামে ভাষণটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ৩৮-৩৭-১৯৯৫ তারিখের নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায়। ১৯৯৫ সালের ৪ জুলাই আমেরিকার ‘ফিন্যান্ডেলক্সিয়া লিবাটি মেডেল’ নেওয়ার সময় ফিন্যান্ডেলক্সিয়ার ‘ইনডিপেন্ডেন্ট হল’ ভাষণটি পাঠ করেছিলেন ঢেক রিপাবলিকের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট ভাষ্কর হাভেল। রাষ্ট্রনায়ক ছাড়াও মননশীল লেখক, কবি এবং নাট্যকার হাভেল বহুল চর্চিত ব্যক্তিত্ব। মুক্তবুদ্ধি এবং মতাদর্শের স্বচ্ছতার কারণে পূর্ব ইউরোপের নেতৃস্থানীয় বুদ্ধিজীবী হিসাবে ভাষ্কর হাভেল আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী।

ভাষণটির বিষয়বস্তু আজ দশ বছর পরেও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক মনে হওয়ায় আমরা সেটির অনুবাদ মূদ্রণে প্রণোদিত হয়েছি।— সম্পাদক : চতুরঙ্গ

আধুনিক যুগ শেষ হয়েছে একথা (আজ) বলার পেছনে যথেষ্ট কারণ রয়েছে। অনেক কিছুই নির্দেশ দিচ্ছে যে আমরা একটা সন্ধিক্ষণের মধ্য দিয়ে এগোছি যখন দেখা যাচ্ছে যে একটা কিছু অপসৃতপ্রায় এবং অন্য একটা কিছু যেন নানা যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে জন্ম নিচ্ছে। যেন কিছু একটা ভেঙে চূরনার হচ্ছে, তার পচন হচ্ছে, কিছু নিজেই নির্মেষ করে নিচ্ছে, আর, এমনও যা অস্পষ্ট, তেমন একটা কিছুর উদ্ভব হচ্ছে ধ্বংসাত্মকের মধ্য থেকে।

এই সন্ধিক্ষণের বিশিষ্ট স্বরূপ হল বিভিন্ন সংস্কৃতির মিলন এবং একীকরণ। এটা বহুসংস্কৃতির ও আধ্যাত্মিক জগতের একটা সমান্তরাল স্থিতির মতন। এটা একটা এমন সময় বা কাল যখন প্রচলিত মূল্যবোধগুলো ভেঙে ওড়িয়ে যাচ্ছে এবং যখন সময় ও স্থান কালের দূরত্বে থাকা সংস্কৃতিগুলোর আবিষ্করণ ও পুনরাবিষ্করণ ঘটছে। এই আবিষ্করণের ফলে এবং বিভিন্ন উপাদানের সংযোগে ক্রমশ নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টি হচ্ছে।

আজ এই মানসিকতা অথবা মানুষের দুনিয়ার এই স্থিতিতে কলা চলে আধুনিকতার পরের অবস্থা বা স্থিতি। আমার কাছে এ অবস্থার প্রতীক হল: এক কেবুইন উটের উপর চড়ে আছে, পরনে তার জাতীয় আলখামার মতো পোশাক, তার নীচে সে পরেছে একটা ‘জিন’, হাতে তার ট্রানজিস্টর রেডিও এবং উটের পিঠে হুলছে একটা ‘কোকোলেলা’র বিজ্ঞাপন।

আমি এটাকে বিদ্রূপ করছি না, অথবা বিচার-বিশ্লেষণও করছি না এই বলে যে পশ্চিমী বাণিজ্যিক প্রসার অন্য দেশের কৃষ্টি-সংস্কৃতিগুলোকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। আমি একে দেখছি মিশ্রিত সাংস্কৃতিক যুগের একটা আদর্শ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হিসাবে। আমি দেখি, যেন কিছু একটার সৃষ্টি বা জন্ম হচ্ছে তার নির্মূল্য হিসাবে। আমরা এমন এক জায়গায় এসে পড়েছি যখন একটা কাল আর একটা কালের স্থান গ্রহণ করছে। যখন নাকি সব কিছু সম্ভব, ঠাঁ, স-ব কিছু সম্ভব, কারণ আমাদের সভ্যতার নিজস্ব কেন্দ্রও নিয়মমীতি, নিজস্ব কেন্দ্রও নন্দনতত্ত্ব নেই।

এটা সন্ধিক্ষণের সঙ্গে সংযুক্ত অথবা (বলা যায়) পৃথিবী সম্বন্ধে আধুনিক ধারণার ভিত্তি যে বিজ্ঞান তার সঙ্গে সংযুক্ত। সাধারণ এবং বিচারবুদ্ধি দিয়ে জানা নিয়মমীতিগুলোতে স্বতঃস্ফূর্ত বিশ্বাস ও নির্ভরতা বিজ্ঞানের যে সম্প্রদায় ঘটিয়েছে তাতেই প্রাযুক্তিক সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছে। এটাই প্রথম সভ্যতা যা সারা বিশ্বে ছড়িয়েছে এবং সমস্ত সমাজ ও গোষ্ঠীকে এক সূত্রে গেঁথে সারা বিশ্বের ভাগ নির্ধারণ করেছে।

সেই সঙ্গেই এও মনে হচ্ছে যে পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক যা আধুনিক বিজ্ঞান পালন-পোষণ ও সংগ্রহ করেছে, তা তার অন্তর্নিহিত ক্ষমতাকে ক্ষয় করে দিয়েছে। সম্পর্কে কিছু ফাঁক রয়েছে। এটা বাস্তবের ভেতরকার প্রকৃতির সঙ্গে এবং মানুষের



হাভাবিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে পারেনি। তাতে 'স্কিনোফ্রেনিয়া' মানসিক রোগের সৃষ্টি হয়েছে; যে-মানুষ সব কিছুই সিনে লক্ক রাখে সে নিজেই কিনা নিজের সব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে।

জ্ঞানিকাল আধুনিক বিজ্ঞান শুধুমাত্র বস্তুর বাইরের আবরণকেই বর্ণনা করে। এটা বাস্তবের একটা দিক মাত্র। বিজ্ঞান যতই গভীরে গিয়ে থাকে একমাত্র দিক বস্তুকে বর্ণনা করে, একমাত্র সত্তা বলে ভাঙছে ততই সে ভুল পথে আমাদের পরিচালনা করেছে। আমাদের পূর্বপুরুষের চেয়ে আমরা অভাববীণ্যভাবে বিমূর্খগণ সঞ্চে জেনেছি অনেক কিছু। কিন্তু তা সত্ত্বেও যতই অনুভব হয় যেন আমাদের চেয়ে পূর্বপুরুষেরা প্রকৃত সত্তাকে উপলব্ধি করেছেন অনেক বেশি গভীরভাবে।

প্রকৃতি এবং আমাদের বেলায় একই ব্যাপার ঘটছে। আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, তাদের ক্রিয়াকর্ম, তাদের ভেতরকার গঠন এবং তাদের জৈব-রাসায়নিক প্রতিক্রিয়াগুলো যতই বর্ণনা করা যাক না কেন, ততই আমরা বুঝতে পারি না তাদের মূল অর্থ, উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য, যেগুলো সৃষ্টি করে সব কিছুকে একত্রে, যেগুলোকে আমরা একমাত্র সত্তার মতো অনুভব করি।

আমাদের অভিজ্ঞতার জগতটা মনে হয় বিশুদ্ধ, বিবাক্তিক। বিশেষজ্ঞরা আমাদের কাছে প্রকৃত জগতের যে কোনও তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে পারেন, তবু যেন ক্রমশই কম থেকে কম বুঝতে পারছি। আধুনিকতার পরবর্তী যুগে আমরা বাস করি, সেখানে সব কিছুই সম্বল অর্থাৎ সব কিছুই অনিশ্চিত।

উপরেক্ত পরিস্থিতির সামাজিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব আছে। এ গ্রহের সভ্যতা, আমরা যার অংশ, তা নানা পার্থিব চ্যালেঞ্জ বা ভ্রম নিয়ে আমাদের সামনে আসে। আমরা তাদের সামনে অসহায়। কারণ আমাদের সভ্যতা স্বল্পত আমাদের জীবনের অধিকার দিয়েছে একটা পৃথিবীকে পরিচেনে কিন্তু ভেতরকার সত্তা চলছে বিভিন্ন পরস্পর নিয়ে। বাস্তব জ্ঞানের যুগ যুগ ক্রম উত্তর হয়ে মানুষের প্রশ্নের, ততই, মনে হয়, মনুষ্য তার অতীতে যেমন হতে চিন্তেই নিজে জীবনের পুরনোদের নিকশতার মতো গভীরভাবে লিপ্ত হয়ে আছে।

এর ফলে বিভিন্ন সভ্যতা, যেগুলো সামনে মিলে মিশে যাচ্ছে অন্য সভ্যতার সঙ্গে, অনুভব করছে নতুন আগ্রহ নিয়ে নিজস্বের ভেতরকার স্বাভাব্য এবং আমাদের ভেতরকার পার্থক্যগুলোকে। সংস্কৃতির সজাব্য বাড়ছে এবং এ সভ্যতা ইতিহাসের অন্য সময়ের তুলনায় অনেক তীব্রতর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রাজনীতিক সভ্যতা চিহ্নিত। বিশ্বজোড়া বহু সংস্কৃতিকে সভ্যতাকে বর্ণনায় বলা সমাধান খুঁজছেন তাঁরা চিহ্নিত করে। কী করে গাণ্ডিও অবস্থানের সূর্য তৈরি করা যাবে, কোন আদর্শের ভিত্তিতে এটা সম্ভব, সেই সিদ্ধান্তের প্রয়োজন বোধ করছেন।

এ সব প্রশ্ন প্রাধান্য পেয়েছে বিশেষ গুরুত্ব নিয়ে বিশেষ শতাব্দীর দুটি বিশেষ রাজনৈতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে। এগুলো হল উপনিবেশিকতার অবসান এবং অন্যটি সাম্যবাদের সমাপ্তি। গত কয়েক দশকের কৃত্রিম বিশ্ব-নিরমানীত্বগুলো খুলিয়াছে হয়েছে বাটে, তবে নতুন সেনেও নৈতিক বিধিনিয়ম সৃষ্টি হয়নি। সে জন্য এই শতাব্দীর শেষ বছরগুলোতে রাজনৈতিক প্রচেষ্টা হওয়া উচিত বিভিন্ন সংস্কৃতি, সমাজ, মানুষের জাতি ও ধর্ম প্রভৃতির সম্মেলিতভাবে সমস্যার মতো বা আশ্রয় সৃষ্টি করা।

অনেকে বিশ্বাস করেন যে প্রাচ্যবৃত্তি পদ্ধতি অবলম্বন করে এভাবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। নতুন সাংগঠনিক, রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিক পন্থার আবিষ্কার হবে তার মাধ্যম। ঐরা, বহু-সংস্কৃতিক যুগের উপযোগী সাংগঠনিক রূপেরা বোঝার প্রয়োজন হয়েছে টিক। তবে সেগুলো যদি জনসাধারণ-শীকৃত মূল্যবোধের ভেতর থেকে উদ্ভূত না হয়, তাহলে সব চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

নতুন একটা বিশ্ববিজ্ঞানবোধ সৃষ্টির জন্য সম্পূর্ণ ভাবাবিক্রম উৎস সন্ধান করতে হবে, আমরা সত্যাপন এমন জায়গার খোঁজ করি, যেখানে বর্তমান যুগের মানসীত সফল হয়েছে এবং যেখানে বর্তমান যুগের ঐতিহ্যও প্রচলিত। এ নির্মাণকাজে সর্বপ্রথম যে মূল্যবোধগুলোর পত্তন হয়েছিল সেগুলোকে, আমি উল্লেখ করছি অস্থিতির (unique) যে মানুষ তার প্রতি শ্রদ্ধা, মানুষ-মানুষীর স্বাভাব্য এবং জন্মগত অধিকারগুলোকে সম্মান এবং জন-মানুষীয় সমস্ত শক্তির উৎস এ ভালোর প্রতি সম্মান—এই মূল্যবোধগুলো। আধুনিক গণতন্ত্রের মূল ভিত্তির কথাই বলছি। এমনকী এই চিন্তাগুলোও যেন পর্যাণ নয়। আমাদের আরও অনেক এগোতে হবে, অনেক গভীরতায় যেতে হবে।

আজ আমরা কিনা জাগরণ রয়েছে এবং বিভিন্ন পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছে যা কিনা দ্রাসিক আধুনিক মানসগুলোতেও সত্যেরাধিকার প্রতিক্রিয়া ঘটচ্ছে না। যাকে, সৃষ্টিকর্তার দেওয়া মানুষের জন্মগত অধিকারের অধিকারের নীতিটা এসেছে এবং আধুনিক বিশেষ ধারণা থেকে, একেবারে মানুষই যে প্রকৃতি এবং বিশ্বকে বৃত্তে রপ্তম সেই ছিট্টির শীর্ষে এবং বিশ্বজগতের অধীর হয়ে।

এই আধুনিক নৃতত্ত্ববৈজ্ঞানিকতা অনিবার্যভাবে একটা ধারণার সৃষ্টি করে যা বোঝায় যে যিনি মানুষের জন্মগত অধিকারবীণ্য অবিকাচওলা দিয়েছেন তিনি এই বিশ্ব থেকে অবদান রাখছেন। তিনি আধুনিক বিজ্ঞানের ধরাধোঁয়ায় বহিরে এত হয়ে গেছেন যে তাঁকে যীরে যীরে একান্ত এক পরিসরে টেনে দেওয়া হয়েছে, বৈজ্ঞানিকভাবে কল্পগণ্ডে না থেকে, অন্তত এমন যার যেনো সর্বসাধারণের কোনও দায়দায়িত্বের বারাদি নেই। মানুষের নিজের চেয়ে উচ্চতর শক্তির অবস্থান সম্বন্ধে ধারণা সহজই যেন মানুষের উচ্চাশার পক্ষে বিশ্ব হতে শুরু করেছে।

মানবিক অধিকার এবং স্বাধীনতার চিন্তাকে হতে হবে অর্থহীন যে কোনও বিশ্বনীতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তবু আমরা মনে হয় এ চিন্তার অবস্থান এখন যেভাবে আছে তার থেকে ভিন্ন জায়গায় ভিত্তিহীন হবার প্রয়োজন আছে।

আপাত-বিদ্রোহিতার মধ্যেও যেন হারানো এই প্রকৃত বাস্তবতাকে নতুন করে দেখার প্রেরণা দেখা যাচ্ছে বিজ্ঞানে। আধুনিকতার পরের এই নতুন বিজ্ঞান এমন সব ভাবনা-চিন্তার সৃষ্টি করছে যা তাকে নিজের সীমার বাইরে এনে ফেলেছে। দুটি উদাহরণ দেব আমি।

(উদাহরণস্বরূপ) নৃতাত্ত্বিক সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধিত আদর্শগুলো আমাদের একটা চিন্তাধারার সম্মুখীন করে যা মনুষ্যপ্রকৃতির মতনই প্রচীন। আমরা কেবল দেবসত্ত্ব ব্যতিক্রম নই যা ক্ষুদ্র পরমাণুর স্রষ্টাসৃষ্টিসম্মুখ অংশ, যা বিশ্বের অনন্ত গভীরতার মধ্যে ঘূর্ণমান। বরং এ বিশ্বের সঙ্গে রহস্যজনকভাবেই আমরা সংযুক্ত। আমরা তারে প্রতিফলিত মেঘের সারা বিশ্বের বিবর্তন আমাদের মধ্যে প্রতিফলিত।

যে মুহূর্তে মনে হতে শুরু করে যে আমরা সারা বিশ্বজগতের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত, সে মুহূর্তে বিজ্ঞান তার বহিসীমায় পৌঁছে যায় যেন।

নৃতাত্ত্বিক সৃষ্টিতত্ত্বের আদর্শগুলোর সঙ্গে বিজ্ঞান নিজেকে দেখছে বিজ্ঞান এবং অস্তিকথার (myth) মাঝের সীমানায়। ফলে বিজ্ঞান যুরপথে মানুষের কাছে হাজির হচ্ছে এবং তাকে নিজে তার হারানো সত্তা। এটা সে করছে মানুষকে বিশ্বজগতের মধ্যস্থানে আবার স্থান করে।

দ্বিতীয় উদাহরণ হল 'গাইয়া হাইপোথেসিস' (gaia hypothesis)। গাইয়া হাইপোথেসিস-তত্ত্ব সব প্রমাণগুলোকে একত্র করে দেখায় যে পৃথিবীর বাইরের আবরণের স্তরে এবং জৈব অংশের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে একটা সম্পূর্ণ সঙ্গ (system), একটা বিশাল সত্তা, একটা জীবন্ত হৃদয় হাকে জীবিত করে দেবী 'গাইয়া'র নাম দেওয়া হয়েছে। একেই দেখা হচ্ছে ধর্মীমাতার মতো প্রায় সব ধর্মের মধ্যেই।

গাইয়া হাইপোথেসিস অনুযায়ী আমরা এক যুগের সত্তার অংশ। আমাদের ভবিষ্যৎ কেবল আমরা আমাদের জন্য কী করছি তার উপর নির্ভর করে না, 'গাইয়া' সমগ্রের জন্য কী করছি তার ওপরও নির্ভর করে। আমরা তার স্কতির কারণ হলে, উচ্চতর নীতির অর্থাৎ জীবনের বাইরে সেও আমাদের বিনাশের কারণ হতে পারে।

নৃতাত্ত্বিক আদর্শ এবং গাইয়া হাইপোথেসিসকে কিসে এত প্রেরণাদায়ক করে? একটা সোজা ব্যাপার: ঠোঁটই আমাদের মনে করিয়ে দেয় যা আমরা বর্ধন করে অনুভব করে এসেছি, যা বহুকালা ধরে আমাদের ভুলে যাওয়া অতিকথার (myth)

প্রতিফলিত এবং হায়তবা যেটা মূল একটা অভিব্যক্তির মতো আমাদের মানসজগতের মধ্যে সৃষ্টি হয়ে রয়েছে। অর্থাৎ কিনা আমরা যে পৃথিবী এবং বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত এই সচেতনতা রয়েছে। আমরা এখানে একা নই শুধু আমাদের একটা বরাবর আমরা এক যুগের রহস্যমা সত্তার অঙ্গীভূত অংশ যার বিরুদ্ধে চলা প্রায় অসম্ভব এই সচেতনতা আমাদের মধ্যে আছে।

সব ধর্মের মধ্যেই এই ভুলে যাওয়া সচেতনতা সহজে আছে। সব সংস্কৃতিই বিভিন্ন রূপে তাকে উপলব্ধি করে। এটিকে একটা জিনিস যা মানুষের নিজের সম্বন্ধে, বিশেষ করে স্থান কী, আসলে বিশ্বপ্রকৃতি।

জনগণের আজ প্রকৃত আশা যে পৃথিবীতে নিশ্চয়তার পুনরুদ্ধার হতে সম্ভব। আমরা যে নিকটবর্তে শেকড়গুলো আছি এবং একই সময়ে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যেও স্থিত আছি এই বোধের পুনরুদ্ধার সম্ভব, সেই আশা। এই সচেতনতাই আমাদের আত্মোন্নতির (Transcendence) ক্ষমতা এনে দেয়।

আন্তর্জাতিক ফোরামের রাজনীতিকরা নতুন করে বারবারের ভগতে পারেন যে নতুন বিশ্বনীতির ভিত্তি হবে সর্বক মানুষেরই জন্মগত অধিকারকে শীকৃতি এবং সম্মান দেওয়া। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়টি যদিও সত্তার অঙ্গীকরণের প্রতি সম্মান থেকে উদ্ভূত হবে না, বা উদ্ভূত হবে না বিশ্বপ্রকৃতির অঙ্গীকরণের প্রতি, অঙ্গীকরণ প্রকৃতির প্রতি এবং আমাদের অঙ্গীকরণের প্রতি প্রতি সম্মান থেকে, ততদিন পর্যন্ত এর কোনও মূল্য বা অর্থই থাকবে না।

যে-ব্যক্তি বা মানুষ বিশ্বনীতি এবং সৃষ্টির প্রাধান্যকে স্বীকার করে, যে-বিশ্বপ্রকৃতির অংশ হবার অধিকারকে মূল্য দেয় এবং একে অংশগ্রহণ করে, তখনকার সেইজনই নিজে এবং তার প্রতিবেশীকে সম্মান ও সত্যিকারের মূল্য দিতে পারে।

বোঝা যাচ্ছে যে আজকের বহু সংস্কৃতির ভগতে পাণ্ডিত্যপূর্ণ স্বাধীনতা এবং স্ফূজনীয় সহযোগিতার সত্যিকারের সম্মান হবার এবং স্ফূজনীয় কার্যক্রমকে শুরু হতে হবে সব সংস্কৃতির মূল্য থাকা মানুষের হৃদয়-মনের অঙ্গীম গভীরতায় থাকা থিঙ্ক থেকে, যেটা রাজনৈতিক মতবাদ, বিশ্বাস, বিরুদ্ধতা, সমবেদন ইত্যাদি নয়। এর প্রতি হতেই হবে আত্মোন্নতির মধ্যে।

দু'শো আঠারো বছর আগে এই বাড়িটাতেই স্বাধীনতা যোবার সময় কালা হয়েছিল যে সৃষ্টিকর্তা মানুষকে স্বাধীনতার অধিকার দিয়েছেন, মনে হয় সেই স্বাধীনতার আশায় মানুষ তখনই পাবে যখন সে, যে স্বাধীনতা দিল তাকে মনে রাখতে পারবে।

— অনুবাদ : ড. রেণুকা বিশ্বাস। তিনি আমেরিকার লক হাভেন্স ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভেনিয়ার প্রোসেসরে ইয়ার্টিস।



## প্রবন্ধ

## গ্রন্থ-বিজ্ঞাপন : নির্মাণ, জ্ঞাপন ও নীরবতা

বিশ্বজিৎ রায়

## ১. বিশ্ব-বনের দোকান!

রবীন্দ্রনাথের পুনশ্চ কাব্যগ্রন্থের পত্র কবিতার শেষ তবকে দুইকালের কথা আছে—সেইকাল আর একাল। রবীন্দ্রনাথ সেইকাল আর একালের সীমানা নির্দেশ করছেন ছাপাখানার সূত্রে। যে সময় ছাপাখানার সৈন্য 'কবিতার সমাধিকাণ্ডে' দেয় নি সেসে কালী মাথিয়ে / যাইজলিক জীতায়-পেচা কাব্যশিও / তলিয়ে যেত না গলায় এক-এক গ্রাসে' সেই ছাপাখানার স্পর্শবিকৃত উপভোগ্য কাব্যবসরের কালই সেইকাল। সাহিত্য আদ্যদান সেইকালে অর্থনৈতিক কুড়া ছিল না। সেই শ্রুত-কাণ্ডের কালে চোখ বুজ্ঞে কান পেতে-কাব্যখানি শুনে, রসিক, কবিকণ্ঠে পরিয়ে দিতেন বিনিপয়সার মালা। একালে ছাপাখানার সৈন্য সেই আনন্দকৃত্যকে রূপান্তরিত করেছে কেন্দ্রবোচর কর্মকাণ্ডে। 'তোমরা আনুগমিক মালবিশ্ব/কিনে পড় কবিতা/আরাম-দোয়ারা বসে // ... কবিকে পরিয়ে দাও না বেলুপুত্রের মালা/সেখানে পাঁচকিনে নির্যে যালস।' পত্র কবিতার এই যে সেইকাল বনাম একাল, যার একদিকে রয়েছে সাহিত্যিক অবসর, অর্থনীতিবিশীল কাব্যআদ্যদানের উপভোগ্য ভগ্ন, ছাপাখানাবিহীন শ্রুতি-অবসর তার প্রতি রবীন্দ্রনাথের মনোভাব অনুকূল। ছাপাখানা 'নিশীথ রাত্রের তারাগুলি' 'যে অবকাশের নীল আকাশের আসরে' ছিল তার থেকে ছিড়ে নিয়ে তাদের পুরে দেয় 'একই সঙ্গে এক খাঁচায়'। তাহলে কি যে ছাপাখানার প্রসাদে রবীন্দ্রসাহিত্য জনবর্তী হয়েছে সেই মুদ্রণ-মাধ্যমের প্রতি রবীন্দ্রনাথের চূড়ান্ত ক্ষোভ ছিল? ছাপাখানার একাল তাঁর কাছে কি তাহলে নিরুপায় অভিশপ্ত এক পত্র?

মুদ্রণশ্রুতির নিরিখে সেইকাল আর একালের বিভাজন অবশ্য রবীন্দ্রনাথই যে শুরু করেন তা নয়। রবীন্দ্রনাথের আগে বঙ্কিম এই দুই কালের ভূমিকাগুলি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তিত। বঙ্গদর্শন পত্রিকার মাধ্যমে ১৮৮৭ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল ব্যাঙ্গালার পাঠক পড়ান তত্ত্ব। পাঠক এই নতুন বর্গের ভূমিকা কী? 'রামায়ণ আর মহাভারত আমাদের জাতিবন্ধনের মূল ছিল; ইহা পড়িতেন অল্প লোক, কিন্তু শুনিতেন সকলে।' (নজরটান সংযোজিত) এই যে সেইকালে শ্রোতাগোষ্ঠী তাঁরা তা একালে সবাই পাঠক হয়ে উঠতে পারছেন না। শ্রোতাগোষ্ঠীর তুলনায় পাঠক সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। 'কয়েকজন কথকের দ্বারা ব্রাহ্মণ বাঙ্গাল প্রজ্ঞত হইয়াছিল.... তাঁহারা বক্তৃতা করিতেন, আবালবৃদ্ধ সকল শুনিত, সকলে সুখিত। ... সম্পাদকের সে উপায় নাই। ...' এককোটির স্থলে কেবল দশহাজার না হয় পঞ্চাশহাজার লোক শুনিয়া থাকে, পড়িয়া থাকে।' (নজরটান সংযোজিত) বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু এই পূর্ববর্তী শোনার যুগকে রবীন্দ্রনাথের মতো অবসরের সর্বমুখ্য, কাব্য আদ্যদানের উপযুক্ত কাল বলে মনে করছেন না। বরং সেবার কালই বঙ্গদেশে এই শ্রুতিপর্ব 'আমাদের পূর্বসূরী বাঙ্গালি' ব্যবহার, বিচার, চিন্তা, যুক্তি ও সামাজিকতায় কেমন ছিলেন। শ্রুতিপোষক সাহিত্যের ফল যে বাঙালি' সেই বাঙালির সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে মুদ্রণশ্রুতির সাহায্যে বাঙালি জাতির নবনির্মাণই বঙ্কিমের উদ্দেশ্য।

মুদ্রণ পুঁজি (Print Capital) ব্যবহার করে বাঙালিয়ানরা যে নতুন অবয়ব নির্মাণে বঙ্কিমচন্দ্র সচেষ্ট সেই অবয়বগঠনে গ্রন্থ, কিনে পড়ান বই, অন্যতম হাতিয়ার। গ্রন্থের ত্রুটি ও পাঠক জাতিসত্তার নির্মাণে কী ভূমিকা নিতে পারে, বা কেমন ভাবে সেই ভূমিকার প্রয়োগগুরুত্ব গড়ে তোলা যায় তারই গ্রন্থ-ছক তৈরি করে ফেলছেন, তৈরি করছেন অনেকে আগেই।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'A popular literature for Bengal' লেখাটি ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের ২৮ ফেব্রুয়ারি Bengal Social Science Association-এ প্রদত্ত। বঙ্গদর্শন পত্রিকা তখন ভবিষ্যৎকে। লেখার শেষে বঙ্কিম জানাচ্ছেন, 'I have to suggest only another topic in connection with the subject for discussion—the creation of some suitable agencies for the circulation of readable books in the mofussil.' (নজরটান সংযোজিত) 'suitable agencies' বলতে বঙ্কিম কী বোঝাচ্ছেন? বই বৈদেশিকাদানের ক্ষুধি সম্বন্ধে তিনি গ্যারিকবাল, এটাও জানেন, The Vernacular Literature Society has special agencies of its own at many places.' এছাড়া বঙ্কিম বই-সম্প্রচারের জন্য গড়ে তুলতে চান সাধারণ গ্রামীণ গ্রন্থাগার। 'A beginning may be made in every village where there is a Vernacular or Anglo-Vernacular School. One of the teachers of the school under the supervision of the school-Committee may keep charge of the books, and in the school-house room may be found for the bookshelves. Thus the village libraries may be formed at once without more cost than the price of the books and shelves.'

উনিবিংশ শতাব্দীতে মুদ্রণক্ষমতার কার্যকরিত্ব ও উপযোগিতা নিয়ে 'লিঙ্গলিপি' পত্রিকায় মোক্ষম লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। মুদ্রণশ্রুতির সমন্বয়ে উনিবিংশী-জ্ঞানসমগ্রীর বিস্তার, তারই একপট্রে বাঙালির নবজাগরণ ও জাতিসত্তার গঠন। বঙ্কিম এই মুদ্রণপুঁজিকে বঙ্গভক্তিতে প্রয়োগ করতে চাইছেন— তাঁর উপযোগবাদী ধ্যানধারণায় ছাপাখানা নিয়ে রবীন্দ্রকি আশেপাশে নেই মোটে। বরং বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হল যখন তখন পাঠকসমষ্টির গ্রন্থকুটি ও গ্রন্থচর্চাবিদ্যা নির্মাণের জন্য সমালোচনা প্রবন্ধের পাশাপাশি বইয়ের বিজ্ঞাপনও ছাপা হচ্ছে। মুদ্রণ-শ্রুতিপূর্ণ কালপত্র! অদুতসমান কাব্যকথাধি শোনার জন্য আমাদেরতার উৎসাহের অভাব ছিল না— কারণ শ্রবণের যুগে অনিবার্য পূণ্য। কাব্যকথার আসরে যোগদানের জন্য শ্রোতাগণের প্রত্যেককে ব্যক্তিগত পুঁজিও ব্যয় করতে হত না।<sup>১০</sup> প্রাক ইংরেজপর্বের আসর তো আর পেশাদার নাট্যমঞ্চ ছিল

না। মুদ্রিত গ্রন্থের সঙ্গে কিন্তু ব্যক্তিপুঁজির প্রত্যক বিনিময়-সম্পর্ক বর্তমান। বঙ্কিম-পরিচালিত সাধারণ গ্রামীণ গ্রন্থাগার পূর্ববর্তী যৌথ আসরেরই রূপান্তরিত বিকল্প, কিন্তু গ্রন্থ যে অনিবার্যকপে ক্রয়যোগ্য বস্তু এটা তো অস্বীকার করার উপায় নেই। প্রথম হল কেন মানুষ বই কিনেবে? এই কেন-উক্ত নির্যেই বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রবন্ধ ও সমালোচনানিবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে।<sup>১১</sup> আর গ্রন্থের রূপগুণ জ্ঞাপনের জন্য পাঠকের দরবারে পেশ করা হচ্ছে বিজ্ঞাপন। তাহলে কি মুদ্রণ বিষয়ে বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ বিবন্ধপন্থী?

পুনশ্চ কাব্যগ্রন্থের পত্র কবিতাটির পাশে রাখা যায় ছুটির আয়োজন কবিতাবানি। কবিতাটির গোড়াতেই জানিয়ে দেওয়া হল 'আকাশের কোণ কোণে/সাদা মেঘের আলস্য./ দেবে মন লাগে না কাজে।' (নজরটান সংযোজিত) গোটা কবিতাটিতেই কাজবিহীন আলস্যের নানা মর্নি ধরা পড়েছে। পত্র কবিতায় মুদ্রণশ্রুতিবিহীন যে কাব্যরসসিক্ত অবসুত মনের পরিচয় পাওয়া যায় সেই সেকারের অবসরপ্রসাদে একালেও ফিরে এল। মুদ্রণশ্রুতিক্রমে ব্যক্তিগত অবসরের মধ্যে টেনে এনে তার দৈত্যবাসী গুণও তাকে মুছে দিচ্ছেন গ্রন্থশ্রেয়ীরা।

কল্যাণের ইকনমিক্স-আসে

খাতায় ফর্দ নিচ্ছে টুকে

চশমা-চোখে মেডেল-পাওয়া ছাত্র—

হালের লেখা কোন্ উপন্যাস কিনতে হবে,

যারে মিশলে কোন্ দোকানে

'মনে রেখা' পাড়ের শাড়ি,

সোয়ায় জড়ানো শাখা,

দিল্লির-কাজ-করা লাল মখমলের চটি।

আর চাই রেশমে-বাঁধাই-করা

আয়িক কাগজে ছাপানো বই,

(নজরটান সংযোজিত)

এই যে ফর্দখানি এটি প্রাত্যহিকতায় শীর্ণ নয়। নিতান্ত পাঁচকিনে চুকিয়ে দিয়ে বিশ্ববনের দোকানে দায়িত্ব কালানের চোখা এতে নেই। বরং এমন বইবিক্রেতাও এসে গেছেন মিনি চশমা-চোখে মেডেল-পাওয়া ছাত্রকে ধরে বই দেন। আর কবিতার বইখানি অবকাশবিহীন খোঁজোখোঁজ (দ্র.পত্র) হ্রান নয়। বইয়ের বিজ্ঞাপন রেশমে বাঁধাই করা, আয়িক কাগজে ছাপা কবিতাগ্রন্থের জন্য পাঠককুটি তৈরি করতে সমর্থ হয়েছে। বিশ্ববনের দোকানের থেকে এই বই-কাব্যর যে আলো, বইপাশায় রবীন্দ্রনাথ তা জানে, মানে। বই নিয়ে এই ব্যক্তিগত সুখ, যাকে বলে গ্রন্থব্রতি, শুণু সেইটুকু রবীন্দ্রনাথের কাছে ধরা পড়েন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো সমবেত বঙ্গবাসীর গ্রন্থকুটি নির্মাণে



তীক্ষ্ণকোজ্ঞানাত্মিক আবেগাওয়া টেনে এনে গ্রন্থসামাজিকতার অশীলার করার জন্যেও তিনি সচেষ্ট হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ পরিকল্পিত বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ সেই চেষ্টারই প্রমাণ।

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহে গ্রন্থমালার বিজ্ঞাপনী ব্যয়ান পড়লেই টের পাওয়া যাবে সাধারণের গ্রন্থসামাজিকতার প্রতি রবীন্দ্রনাথ কতদূর সচেতন ছিলেন। আসলে বাংলা গ্রন্থের পাঠকতার ইতিহাসে বৃহত্তে গেলো মুদ্রণপূর্ব আর মুদ্রণসংলগ্ন পর্বের টানাপোড়েন আর বোঝাপড়াতুষ্টি ফেলেয় করতেই হবে। বঙ্কিমেন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ তাঁদের নিজস্ব পদ্ধতিতে এই দুই কালকে বৃহত্তে চাইলেন। মুদ্রণপ্রযুক্তিপূর্ণ কালপূর্বে গ্রন্থআবাদনের যে রূপ ও রীতি ছিল মুদ্রণপ্রযুক্তির ছোঁয়ায় তার নানা রদবদল হচ্ছে। গ্রন্থআবাদনের নতুন নতুন আনন্দকে গড়ে উঠছে। এই আবাদনের আংশিক ইতিবৃত্ত রচনা করাই এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য। কোনও ধারাবাহিক কোন অংশ এই মধ্যে নেই। বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের একটি গ্রন্থ-বিজ্ঞাপনের মূলে মুদ্রণপূর্ব ও মুদ্রণপর্বতী পরের আদ্যাত্য নিয়ে দু'এক কথা পেশ করাতেই নিবন্ধটি সীমাবদ্ধ থাকবে। বিদ্যাপতির পদাবলী, এই মুদ্রণপূর্বপূর্ব সাহিত্যকীর্তিটিকে গ্রন্থমধ্যে আকর্ষক ও গ্রন্থমধ্যে প্রচারিত করে পাঠের কোন কোন প্রভাবকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বসুমতীর বিজ্ঞাপনে তা স্পষ্ট। আর ভবদেবেই এই পাঠপ্রকল্পের বাল পড়তে যাচ্ছে পূর্ববর্তী পদ্ধতিতাত্ত্বিক আবাদনের বিবিধ উপাদান।

## ২. বই চাই গো বই চাই

‘শত্রুগ্রহ ও সাহিত্য-প্রচার-ব্রত’ উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ‘বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির’ হইতে, খ্রীস্টীয় শতাব্দী মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত ‘বৈষ্ণব সাহিত্য সিরিজ’-এর অন্যতম গ্রন্থ **কলিতামাধব**। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বইয়ের মনোভোগী কারাবাব। কারাবাব গুরু করেছিলেন উনিষৎ শতাব্দীর শোষণবিরি<sup>১</sup>, কলকাতার ছোটভার ছোট একটি দোকানে। কিঙ্গিদিন যেখানে না গেলেই বই ছাড়তে শুরু করলেণ। নাটক, যাত্রা, গল্প, ম্যাকিঙ্ক, সত্যনারায়ণ ব্রহ্মসংস্থা, সহজেই হেরেজি শিক্ষার বই—এসব কিছুই বিচিত্র মিশেলে তাঁর প্রকাশনারিপথি ভরপুর। বাজালি পাঠকদের বিবিধ কঠিনে পরিপুষ্ট করাই তাঁর উদ্দেশ্য—এই তাঁর সাহিত্য প্রচার ব্রত।

বঙ্কিমেন্দ্রের মতো কৃত্তিবাহু ও সাধারণকে মেলানের কোনও গুরুপাণ্ডার প্রকল্প যেখানে পাঠকদের, রবীন্দ্রনাথের মতো গ্রন্থের উসকে তোলা অবসরের ভজনা না করলেও, বসুমতীর শাস্ত্র ও সাহিত্যচক্র প্রত্যেক সন্তোষের বাজালিকে গ্রন্থরূপেপথে আগ্রহী করে তোলায় চেষ্টা ছিল। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই প্রচারঅতীশাকে বিশেষ কাঠামো দিচ্ছেন। ‘ললিতবাসবী’ গ্রন্থের

নিছনের মলাটে বিদ্যাপতির পদাবলীর যে বিজ্ঞাপন ছিল তা পাঠ করলে বসুমতীর গ্রন্থপ্রচার উদ্দেশ্যের নমনা পাওয়া যায়। বিজ্ঞাপনটি এরকম:

## বৈষ্ণব-সাহিত্যের অনুপম বাঁশরী!

ভক্তহৃদয়ে চিরধ্বনিত সেই মুবলী বিলাস!

মিথিলার বিশ্ববিমোহন কবি—মোহনভির সাক্ষ, সুপ্রেমিক, সুসঙ্গিক

ভক্তচূড়ামণি—শ্রীধারধরের প্রণয়লীলা কর্ণে  
আখ্যায়িকেরিত গ্রাম

## বিদ্যাপতির পদাবলী

বঙ্কিম-মুগের প্রথিতনামা সাহিত্যিক—বৈষ্ণবসাহিত্যে দুরদ্বার  
**শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সুসম্পাদিত**

মশগুণ আকারে পরিবর্তিত—নির্ভুল পাঠোদ্ধার সঙ্গলিত—  
বহু আয়ালের টীকা—ব্যাখ্যা সন্মুক্ত—অভিব্যবস্বেরণ!

শ্রীধাথকুমের প্রেম মাধুর্যের সন্তোষলীলা!

আসুন। সাহিত্য—রস—বসিক, আসুন। উপন্যাস—প্রেমিক,  
আসুন। বৈষ্ণব সাহিত্যের মৃগানলোলুপ ভক্তবৃন্দ,  
এ সৌন্দর্য প্রেম-ঐশ্বর্য—

সন্তোষ করিয়া আঘরাহা হউন—জীবনধন্য করুন।

পুলকের প্রবাহ লহরিত হইতেছে।

শ্রীধাথার ব্যঙ্গসঙ্গ—শ্রীধাথার পূর্ববর্ণ—শ্রীকুমের  
পূর্ববর্ণ—দুই সংবাদ—

সন্দর্শন—সখী-শিলা—অভিসার—মিলন-বসন্ত-বিহার—  
রঙ্গলাপ—মান—

মানান্তে মিলন—মোহনভির—বিহার—ভাবসাম্বলিন—  
প্রার্থনা—গঙ্গাগীতি—

প্রহেলিকা—হরগৌরী—বিবিধপ্রকাশিত পদাবলী প্রভৃতি—

যাবতীয় পদের অভাবনীয় সমাবেশ!

সঙ্গে সঙ্গে মিথিলা-গৌরব-কবি বিদ্যাপতির জীবনী লিখতে  
অর্থ-ভাবের ব্যাখ্যা।

এ্যাটিক কাগজে ছাপা, বাঁধাই

রাজসংস্করণ মূল্য ১।।০ টাকা

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির, ১৬৬নং বহুবাজার স্ট্রিট, কলিকাতা।

একটা পর্ব পর্যন্ত বসুমতী সাহিত্য-মন্দিরের অধিকাংশ গ্রন্থই প্রকাশকালের কোনও উল্লেখ থাকত না। ললিতবাসব গ্রন্থটির প্রকাশ তারিখের কোনও উল্লেখ নেই। কাহাজেই তাইয়ের সাক্ষে বলা সম্ভব নয়। বিদ্যাপতির পদাবলীর এই বিজ্ঞাপনটি কোন সময়ে প্রচারিত।

একটি মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত প্রসঙ্গ : বসুমতী সাহিত্য মন্দির/১২৮৭-১৩৭৭ গ্রন্থে যে নির্বাচিত গ্রন্থগুলি রয়েছে তার মধ্যে অন্য যাচ্ছে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত বৈষ্ণব মনুস্কর পদাবলী দ্বিতীয় খণ্ডটি বিদ্যা পতি পদাবলী। শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থ প্রস্তেও তথ্য এরকম : ‘বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী দ্বিতীয় খণ্ড। সম্পাদনা নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত/[বিদ্যা পতি পদাবলী] প্রকাশক সতীশচন্দ্র মুখো। ১২৮৭-১৩৩৫ ৩তম পৃ/২৭২৫২ ৪৩৮ ২০০০ মূল্য এক টাকা আট আনা<sup>১৭</sup> এই তথ্য থেকে সাল তারিখের একটা আনুমানিক বোঝ পাওয়া যায়। বিদ্যাপতির পদাবলীর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে ১৯৩৫-এ। সুতরাং পদাবলীর রাজসংস্করণের এই বিজ্ঞাপনটি ১৯৩৫-এর আগে পেরে কোনও এক সময়ের। এই বিজ্ঞাপনের ভাষা গ্রন্থটির গুণ ও রূপ বিষয়ে, পাঠকদের শ্রেণিগত নানান বিষয়ে যে সব তথ্য ও সূত্র জ্ঞাপন করছে তার পারস্পর্য বৃহত্তে গেলে বৈষ্ণব পদাবলী আবাদনের পদ্ধতি প্রকল্প যেখানে করতে হবে। এই কালপূর্বে মুদ্রণপ্রযুক্তিপূর্ণ ও মুদ্রণপ্রযুক্তি-পর্বতী পরের টানাপোড়েনে কাজ করে যাচ্ছে। বিজ্ঞাপনে আদ্যাদ্য বিষয়ের ও আদ্যদকের যে যে বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে এবং যে যে বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে না তার মধ্যে এই দুই পর্বের বোঝাপড়ার চাপ অব্যবহাভাবে নিহিত আছে।

## ৩. বিজ্ঞাপন থেকে ইতিহাস

বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের বইয়ের বিজ্ঞাপনগুলি যে পাঠকের চিত্তবল্য করণ অনেকটাই তা কল্প করছেন। এঁদের কল্পনামা প্রকৃতি মুখোপাধ্যায় সুব্যবহাভাবে বিন্যস্ত করেছেন তাঁর ‘সঙ্গঃ বসুমতী সাহিত্য মন্দির’ গ্রন্থের ভূমিকায়। শ্রীচন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণ গ্রন্থ ‘তরী থেকে তীর’-এ বসুমতীর গ্রন্থ বিজ্ঞাপনের প্রশংসা চোখে পড়ে : ‘সতীশচন্দ্র “মোকাবারু” নাম ছিল যার পরিচয়। যে আশ্রয় অতিক্রম্য বিজ্ঞাপন লিখতে, তার তুলনা যে ছিল না তা ভোটেই, কিন্তু তাঁরই মধ্যে সৃষ্টি হত বাংলা ভাষায় স্মৃতি-সাহিত্যকীর্তির বিবিধ নির্দলন বিষয়ে অনভিজ্ঞতা প্রজ্ঞা, সঙ্গজনে সেই সাহিত্যভাবের প্রসার সম্বন্ধে প্রণয় ভিজ্ঞাবের।’<sup>১৮</sup> (নবরতন সংযোজিত) ইতিহাসের পরে এই বিশ্লেষণ থেকে দুটি শব্দ আলাদা করে নির্বাচন করা যায়,

অতিক্রম্যতা ও সর্বজনে। বিজ্ঞাপনের ভাষা যে অতিক্রম্যতা তা বিদ্যাপতির পদাবলীর বিজ্ঞাপন পড়লেই টের পাওয়া যায়। এই বর্ণাঢ্যতা নির্মালে কিন্তু শুধু পরিকল্পনাবিহীন বিশ্লেষণ-বাঙ্ঘ্য প্রযুক্ত হানি, তার মধ্যে কালের এক সৃষ্টিত পর্বপাশ বর্তমান। আবার এক কালের মধ্যে অন্য কালের ভাবনপঙ্ক প্রবর্তি হচ্ছে।

বিজ্ঞাপনটির গোড়াতেই দুটি কালসংস্পর্ক ও দেশ সম্পৃক্ত ধারণাকে গুরুত্ব দেওয়া হল। বৈষ্ণব সাহিত্যের অনুপম বাঁশরী ভক্তহৃদয়ে চিরধ্বনিত—চিরকালের সেই কাব্য বিবরণমানে। দেশের মানুষকে মাত্র নয়, বিশ্বের মানুষকে বিদ্যাপতির পদাবলী মোহিত করতে পারে। বৈষ্ণব পদাবলীর ওপর এই চিত্রণ ও বিশ্বত আরোপ করার ঘটনা নতুন নয়—এর সঙ্গে জাতীয়তাবাদী উপলব্ধির যোগ আছে।

বঙ্গদর্শন পত্রিকায় পৌষ ১২৮০ সংখ্যায় মানসবিকাশ নামে বঙ্কিমচন্দ্র প্রণীত একটি সমালোচনানির্বন্ধ প্রকাশিত হয়। বিদ্যাপতির কবিতার সঙ্গে জয়দেবের কাব্যের তুলনামূলক আলোচনা সমালোচনামূলকভাবে চোখে পড়ে। ‘বঙ্কিম চন্দ্রনাথের লেখকদিগকে দুই দলে বিভক্ত করা মাইতে পারে। এক দল, প্রাকৃতিক শোভার মধ্যে মনুষ্যকে স্থাপিত করিয়া, তৎপ্রতি দৃষ্টি করেন, আর এক দল বাহ্য প্রকৃতিকে দূরে রাখিয়া কেবল মনুষ্য হৃদয়ের কেই দৃষ্ট করেন।... প্রথম শ্রেণী প্রাচীন জয়দেব, দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রধান বিদ্যাপতি।’<sup>১৯</sup> বঙ্কিম নির্মিত এই বিকিভাজন রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাপতি ও চন্দ্রীদাসের বিশ্লেষণে ভিচারে ব্যবহৃত হলেও বসুমতীর বিজ্ঞাপনে ‘কেবল মনুষ্যকে দৃষ্টি দানকারী বিদ্যাপতি পরিগৃহ্য।’ মনুষ্য হৃদয়ের কবি বিদ্যাপতির কাব্যে তো ‘ভক্তহৃদয়ে চিরধ্বনিত’ হবে। আর এই চিরধ্বনিত কাব্য নিয়েই তো বিশ্বের কাব্যধারার সঙ্গে বাঙালীরালায় উদ্ভূত জাতীয়তাবাদী বঙ্গবাসীর শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই। পাশ্চাত্য সাহিত্য প্রভাবিত উনিষৎ শতকের গীতিকর্তা, যা বাঙালিকে মুগ্ধিত কবিতা পাঠের সুযোগ করে তুলল তার সঙ্গে বসুমতীপূর্বপূর্ব এই পদাবলীর তুলনা চোখে পড়ে। বলা বাঙ্ঘ্য এই অমুগ্ধিত পদাবলীকে মুগ্ধিত আয়তনে টেনে এনে দুই ধারাকে সমান সমান গুরু দেওয়া হচ্ছে ইংরাজ পূর্ববর্তী বৈষ্ণবগানের রসে সম্বলই কম বেশি মজছেন। বঙ্গদর্শন গোষ্ঠীর লেখকগণ বৈষ্ণব সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করছেন,<sup>২০</sup> বৈষ্ণব পদাবলীর দেশোৎপ হাচি করছেন। বিদ্যাপতি প্রকৃতির কবিতার বিষয় সঙ্গীত, কিন্তু কবিত্ব প্রণয়; মধুসূদন বা হেমচন্দ্রের কবিতার বিষয় বিজ্ঞত, বা বর্জিত, কিন্তু কবিত্ব তদুপ প্রণয় নহে।<sup>২১</sup>—এমন সমালোচনা বিদ্যাপতির পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গি হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ শুধু বৈষ্ণবগান সংকলন<sup>২২</sup> হিসাবেই গ্রন্থকে গ্রহণ করছেন না, বৈষ্ণব কবিতা



কীভাবে পড়া হবে তার কাব্যাত্ত্বও নির্মাণ করছেন। মানসী কাব্যগ্রন্থের একালও সেকাল কবিতায় (২১ বৈশাখ ১৮৮৮) রবীন্দ্রনাথ যখন লেখেন “আজকে এমন দিনে শুধু পড়ে মনে/সেই দিবা-অভিসার/পাগলিনী রাগিকার/না জানি সে কবেকার বুঝ দ্বন্দ্ববনে।” তখন একালের মধ্যে সেকাল চিরকাল হয়ে ধরা দেয়। সেবার ভীম কাব্যগ্রন্থের বৈষ্ণব কবিতায় এই চিরকালীন প্রেম মানবধারায় সম্পৃক্ত। “সমুদ্রবাহিনী সেই প্রেমধারা হলে/কল্যাণ ভরিয়া ভার্য্য লয়ে যায় তীরে/বিচার না করি কিছু, আপন কৃতিপদে/সেপানায় তরে।” বৈষ্ণব পদাবলীকে রবীন্দ্রনাথ এভাবেই চিরকালীন প্রেমের কবিতা হিসাবে পড়তে চাইছেন। রবীন্দ্রনাথের এই আত্মদানপদ্ধতি কাব্যরসিকদের কাছে যথেষ্ট আদৃত। আর শুধু কবি রবীন্দ্রনাথই নয়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত<sup>১১</sup> আর দীনেশচন্দ্র সেনও বৈষ্ণব পদাবলীর চিরত্ব ও বিশুদ্ধ প্রতিপাদনে সচেষ্ট। হীরেন্দ্রনাথের তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের সূত্রে রাধার প্রেমোৎসবে বিশ্বের অন্যান্য দামনিক ও ধর্মীয় মন্দিরদের সঙ্গ এক করে দেওয়ার প্রচেষ্টায় নৌদ্বীপ বৈষ্ণবতত্ত্বের বিলিপ্ততা বর্ণন হলেও এই একতত্ত্বী প্রচেষ্টা কখনোই জন্মগ্রহণ লাভ করেনি। আর দীনেশচন্দ্র সেন বৈষ্ণব পদাবলীকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে চিরত্ব ও বিশ্বদেয় তকমায় ভূষিত করেছিলেন। বাংলা সাহিত্য বিশ্ববিদ্যালয়ী পাঠ-প্রক্রমের অন্তর্ভুক্ত আসতে পারে কি না আওতেষা মুম্বাঈশাখ্যের সৌভাগ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সচিবটো এ নিয়ে বিস্তারিত বক্তৃতি হয়েছিল।<sup>১২</sup> বাংলা সাহিত্য অন্তর্ভুক্তি প্রক্রমের বিরোধীদের মুখা জিজ্ঞাসা ছিল বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে এমন রচনানির্দশন বদভ্যাসের কী আছে? দীনেশচন্দ্র বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলীকে একই নিভিড়ে রান্নেছেন। পরবর্তীকালে বঙ্গভাষা ও সাহিত্য গ্রন্থ দীনেশচন্দ্রের আবেগপূর্ণ স্বীকারোক্তি, “এই অপরূপ ভক্তি ও প্রেমের উপলব্ধি দিয়ে আমিও রবীন্দ্রনাথের পদাবলীকে একই নিভিড়ে রান্নেছি।” (নবরচন সংযোজিত) বৈষ্ণব পদাবলী সম্পর্কে গণ পরিসরে ও বিশ্ববিদ্যালয় পরিসরে এইভাবে যে সর্বকালীন স্ট্রেটফের ধারণা তৈরি হয়ে উঠিল কসুমতীর বিজ্ঞাপনে তারই প্রতিফলন সর্বদান।

অন্যা শুধু বিবেচের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করলেই তো চলবে না—গ্রন্থরূপের বিশিষ্টতাও জ্ঞাপন করতে হবে। প্রাকমুদ্রণ পর্বের সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিষয়ই মুখ্য, গ্রন্থরূপ গুরুত্বপূর্ণ নয়। পৃথিতে যে অলংকার থাকত তা তো আর ব্যক্তিপুঞ্জিকে আকর্ষণ করার জন্য অস্তিত্ব হত না। আদর্শ পুথির ধারণাও তখন তৈরি হয়নি।

প্রাকমুদ্রণ পর্বের সাহিত্যকে মুদ্রণপর্বে গ্রন্থরূপ প্রদান করতে গেলো আদর্শ সম্পাদকদের প্রয়োজন। গ্রন্থরূপটির মধ্যেই যে প্রাচীন পৃথিবুত কাব্যটি অবিকৃত আসলরূপে বর্তমান—পাঠকের মনে এই বিশ্বাস তৈরি করা চাই। বিজ্ঞাপন যদি আসলেই প্রত্যয় তৈরি করতে না পারে তাহলে পর্যায়ে দিয়ে পাঠক বই কিনলেও

বসুমতীর বিজ্ঞাপনেও তাই বিষয়বস্তুকে বিশেষিত করার পরেই সম্পাদনাকৃত্যাকে গুরুত্ব দেওয়া হল। ‘বঙ্কিম-বংশের প্রব্রিহত্য’ নামক সাহিত্যিক—বৈষ্ণব সাহিত্য ধুরন্ধর/বঙ্কিমুজ নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত/দশগুন আকারে পরিবর্ধিত—নির্ভুল পাঠোদ্ধার সম্বলিত—/বং আয়াসের টীকা—ব্যাখ্যা সমৃদ্ধ—অভিনব সংস্করণ।<sup>১৩</sup> নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের যোগ্যতা সংক্ষেপে যে বিজ্ঞাপনী ভাষা এখানে প্রয়ুক্ত হল তা যে সমস্তকে মান্যতা লাভ করেছে তার পরোক্ষ প্রমাণ সেওয়া সম্ভব। ‘বিদ্যাপতি পদাবলী’র মিত্র-মহাদেশ্বর সংস্করণের উৎসর্গপত্রটি লক্ষ করা যেতে পারে। “মহামতি গ্রিয়ার্সন ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে/Indian Antiquary-র/চতুর্থ পৃষ্ঠা-বং/যাঁহার/বিদ্যাপতি পদাবলীর ভূমিকার ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়া/Vidyapati and His contemporaries/প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন/যিনি বিদ্যাপতি-পদাবলী রূপ ভাগীরথী-ধারার ভগীরথরূপ নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত/মহাদেশ্বর ডক্টরেটের প্রাচীন পুথি সংগ্রহ করিয়া দিয়া/বিদ্যাপতির পদ সংগ্রহ করিবার অপূর্ণ সুযোগ দিয়াছিলেন/ও ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে নিজে সমগ্র বায়ভার বহন করিয়া/বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দ্বারা/বিদ্যাপতি পদাবলীর প্রকাশ করান/কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি/সেই/প্রয়োজ্যক সাধারণ মিত্র/মহাদেশ্বর পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে (sic) এই গ্রন্থ সমর্পিত হইল।”<sup>১৪</sup> বিজ্ঞাপনে ও উৎসর্গপত্রের ভাষার মেজাজ ও মর্যাদা এক। দুটি ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত বিবরণে পরবর্তী শব্দের যুক্তিধারা সার্বভৌম। সারাদেশ্বর মিত্র কেন উৎসর্গযোগ্যতা লাভ করলেন উৎসর্গপত্রের ছকে-ছকে কল্যাণভাষায় তা জ্ঞাপন করা হয়েছে। কসুমতীর বিজ্ঞাপনেও বৈষ্ণবসাহিত্যে দুরূহ বিশেষণটিকে নির্ভুল পাঠোদ্ধার, টীকা, ব্যাখ্যা ইত্যাদির সৃষ্টি সঙ্গ করে নেওয়া হয়। বুরূদ্ধ শব্দটি এখানে মুখ্য বা প্রধান অর্থে ব্যবহৃত, এর মূল্য রয়েছে  $\sqrt{4}$ । নির্ভুল পাঠোদ্ধার, টীকা ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে মুদ্রণপূর্ব বৈষ্ণব পদাবলীকে, মুদ্রণপর্বের পাঠকের জন্য, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মুদ্রিত গ্রন্থরূপীয়ে ধারণ করেছেন।

বিজ্ঞাপনটির পরবর্তী পর্যায়ের রয়েছে পাঠক প্রসঙ্গ। কোন প্রেমির পাঠক এই গ্রন্থ পাঠ করবেন? যত বেশি সংখ্যক পাঠক

পদাবলী আদান করতে চাইলে গ্রন্থের বিক্রয়ও তত বৃদ্ধি পাবে। মুদ্রণপূর্ব সূত্রে পাঠকসংখ্যার বৃদ্ধি ইতিহাসিক ঘটনা। তাই ‘আসুন। সাহিত্য-রস-রসিক, আসুন। উপন্যাস-প্রেমিক, আসুন।/বৈষ্ণব সাহিত্যের মধুপানালোপু ভক্তবৃন্দ, এ সৌন্দর্য প্রেম-উদ্দেশ্য—/সজ্জোণ করিয়া আত্মহারা হউ—জীবন ধন্য করুন।’ বিজ্ঞাপনের এই অংশে অন্যান্য অংশের মতোই নানা মামের হরফ ব্যবহার করা হয়েছে। সাহিত্যরস-রসিক আর উপন্যাস-প্রেমিক শব্দদ্বয়টি বড় হরফে মুদ্রিত, ভক্তবৃন্দ শব্দটির জন্য অপেক্ষাকৃত ছোট হরফ বরাদ্দ হল। হরফের এই আকারত্ব তত-অত তৎকালীন প্রণয়তারই সাক্ষ্য বহন করছে। বৈষ্ণব সাহিত্যকে ভক্তদের নির্বাচিত দরবার থেকে সাহিত্যরসিকদের খোলা দরবারে টেনে আনার জন্যই তো সবাই সচেষ্ট।

বৈষ্ণব সাহিত্যকে ভক্তমণ্ডলীর আসরসীমা থেকে সাহিত্যরসিকদের পাদদরবারে টেনে আনার যে প্রক্রিয়া তাতে নানা সুর ও স্বর বর্তমান। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, দীনেশচন্দ্র এই বৈষ্ণব পদাবলীকে প্রেমময় রীতিবাক্য হিসাবে নানাভাবে ঘাচাই করতে চাইছেন। বিশেষ করে ভাসুসিংহের পরবর্তী প্রণেতা রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে স্রিয় ও সেবতার যে ইমান্ডন ঘটিয়েছেন তাতে পদাবলী তার শাস্ত্রীয় ও আধ্যাতিক পরামর্শ দ্বারা ছলে রোমান্টিক প্রেমের কবিতায় পরিণত হল। কসুমতীর বিজ্ঞাপনপ্রণেতা এই সম্প্রদায় কৃত্য আর একটি স্তর যোজন্য করছেন। উপন্যাস এই ভঙ্গিমে সাহিত্যরূপটি উনিশ-বিশ শতকে প্রাধান্য লাভ করল। এটি যে পাশ্চাত্যের হাত ঘেরতা বিশেষ সংকেত, বর্ণ এ বিষয়ে সমকালীন বাঙালি লেখক-পাঠক সমাজকে ছিলেন না। তবে উপন্যাস নিয়ে আরও দুটি সমাজবর্গের ভাবনা প্রস্রাবিত ছিল। প্রথমত, পাশ্চাত্য উপন্যাস ভাবনা বঙ্গদেশে ক্রমে ক্রমে প্রবল হতে শুরু করে। দ্বিতীয়ত, উপন্যাস রূপটি কি নিতাইই পাশ্চাত্যদেশ আগত নাকি এর কোনও ভারতীয়/বঙ্গজ রূপ ছিল।<sup>১৫</sup> বঙ্গজ পূর্বরূপের অনুসন্ধান জাতীয়তাবাদী অভিমত/প্রশ্নোদ্যে সজাত। ১৯২২ বঙ্গদেশে প্রকাশিত হয়েছিল কৈলাসচন্দ্র ঘোষের ‘বাংলা সাহিত্য’। কৈলাসচন্দ্র লিখেছেন, ‘যাহা হউক কবিকঙ্কণ বরকলা-কবিতা আখ্যায়িকার জন্মদাতা, এক্ষণে যে বঙ্গদেশ উপন্যাসমালায় আচ্ছন্ন হইয়াছে— বঙ্গভাষায় কবিকঙ্কণই সেই উপন্যাসের সৃষ্টিকর্তা।’ (নবরচন সংযোজিত) কৈলাসচন্দ্র উপন্যাসের বিশেষ একটি ধর্মকে গুরুত্ব দিয়ে নির্দিষ্টায় উপন্যাসের বঙ্গজ সৃষ্টিকর্তাকে চিহ্নিত করছেন। কবিকঙ্কণ কেন উপন্যাস লিখবেন, তাঁর আখ্যান ক্ষমতাই শেষে স্বতন্ত্রভাবে উপন্যাসের ধারার সঙ্গে

মেলানোর চেষ্টা করলে পরোক্ষ যে উপন্যাস নামক আখ্যান পদ্ধতির প্রাধান্যই স্বীকার করে নেওয়া হয় এসব প্রশ্ন কৈলাসচন্দ্র ও সমকালীদের মনে উত্থাপিত হয়নি। প্রাকমুদ্রণ পর্বের বাংলা সাহিত্যকে উপন্যাসের সঙ্গে কোনও ভাবে মেলাতে পারলেই যে বাংলা সাহিত্য পাশ্চাত্য সাহিত্যের তুল্যমূল্য হয়ে উঠবে এই যুক্তিবাদে নানাভাবে ক্রিয়ামূল। কসুমতীর বিজ্ঞাপনেও তাই উপন্যাস প্রেমিকদের আত্মন করা হয়েছে। সন্ধ্যা, উপন্যাস পড়ে যে শুখ, বৈষ্ণব পদাবলী পাঠেও সেই শুখ। ঘটনের ঝঞ্ঝা, আগমনের প্রতিজ্ঞার আনুরূপেই বৈষ্ণব পদাবলী উপন্যাস। বিজ্ঞাপনে বঙ্গও হরফের মাথ যদি কেউ খোঁজা করেন তাহলে তাঁর পোনে ‘উপন্যাস-প্রেমিক’ শব্দ বহুটি ‘ভক্তবৃন্দ’ শব্দের থেকে বড় হরফে মুদ্রিত।

এইভাবে কসুমতীর বিজ্ঞাপনে প্রাক উপনিবেশ পর্বের অনুদ্রিত বিদ্যাপতির পদাবলীকে মুদ্রণের যুক্তিতে নানাভাবে টেনে আনা হচ্ছে। বঙ্কিম নেমের ক্ষত্রপতিত্বের আখ্যায়িকার পাকতার বর্ণে টেনে আনতে চান, রবীন্দ্রনাথ যেমন মৃত্যুপীড়িতকে ব্যক্তি করে দিয়েও পুনরায় মুদ্রিত গ্রন্থপাঠের আখ্যানবহু পরিসর নির্মাণ করেন, তেমনই কসুমতী সাহিত্য মন্দিরের তুল্যমূল্য গ্রন্থ ইংরেজ পর্বের সাহিত্যগোত্রকে নানা বোকাপড়ার মাধ্যমে উপনিবেশ পর্বের পাঠকের চিত্তায় করে তুলতে চাইছে। এই বোকাপড়ায় অনেক কিছু অন্তর্ভুক্ত হলেও, বাদও পড়ল বই কিছু।

### বর্জনের রাজনীতি

কসুমতী সাহিত্য মন্দিরের বিজ্ঞাপনটি প্রাক উপনিবেশ পর্বের বৈষ্ণব কাব্য আদ্যাদনের কোন কোন বৈশিষ্ট্যকে বর্জন করে তা বৃদ্ধতে গেলো খোয়াল করা দরকার প্রাক উপনিবেশ পর্বের বৈষ্ণব পদাবলী আদ্যাদনের রীতি কী ছিল? বলা বাহুল্য যে প্রাক উপনিবেশ পর্বের বৈষ্ণব সাহিত্য আদ্যাদন পদ্ধতির কোনও গারাবাহিক ইতিহাস রচনা উপাদানপত্র ও তত্ত্বপত্রদ্বারা দিয়ে সম্ভব নয়। নানা সূত্র থেকে প্রাট-প্রবর্তার কতগুলি নির্দশন হাজির করা যেতে পারে।

বসময় দাসের শ্রীকৃষ্ণভক্তিবর্ষী গ্রন্থটি রূপগোহামীর ভক্তিরসামৃতসিদ্ধি গ্রন্থের ভাবানুসার। উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত এই গ্রন্থটির আনুমানিক রচনাকাল ১৫৪১ খ্রিষ্টাব্দ। গ্রন্থটিতে পাঠ্য ও পাঠকতা সংক্রান্ত নানা সুর বর্তমান। ক্রমাগত এই সুবাদি বিন্যস্ত করা যেতে পারে।<sup>১৬</sup>

### গ. গ্রন্থ

মোর প্রভু সনাতন নিউ জব্বারী











১০. গোপালী, রূপ, নির্দিষ্টব্যবস্থা, বঙ্গ, সত্যাবলম্বন (সমুদ্রিত) বৈশ্বকোষভিত্তিক  
নিবন্ধ, রত্নভূমি সাহিত্য ফিলিস, কলিকতা, আশাপাঠ্য বৈশ্বকোষের উত্তম  
সংস্করণ।
১১. সুনন্দাচরণ, প্রবন্ধ (সম্পাদিত) "রত্নভূমি সাহিত্য ফিলিসের কথা" প্রথম  
সংস্করণ, বঙ্গবন্ধু, বঙ্গবন্ধু, কলিকতা, ভারতীয় ১৯০৮, পৃ ৪
১২. সুনন্দাচরণ, প্রবন্ধ (সম্পাদিত) "রত্নভূমি সাহিত্য ফিলিসের প্রবন্ধিত  
প্রবন্ধ: একটি সমালোচনা" পৃ ১১৩
১৩. সুনন্দাচরণ, ইতিহাসপ্রবন্ধ, তীর্থ হস্ত তীর্থ, বঙ্গবন্ধু, বঙ্গবন্ধু ১৯৩৮, পৃ  
১৩
১৪. "মানসবর্তন", বঙ্গবন্ধু, পৌষ, ১৯৩৮, বঙ্গবন্ধু (বিশ্ববিদ্যালয়), বিজ্ঞান  
সংস্করণ, কলিকতা, বঙ্গ, ১৯৩৮, পৃ ৩০০
১৫. বঙ্গবন্ধু প্রবন্ধিত "বঙ্গবন্ধু বৈশ্বকোষভিত্তিক প্রবন্ধের বিবরণ"  
"বঙ্গবন্ধু", "বঙ্গবন্ধু প্রবন্ধিত", "বঙ্গবন্ধু", "বঙ্গবন্ধু" ইত্যাদি  
বঙ্গবন্ধু প্রবন্ধিত। (বঙ্গবন্ধু প্রবন্ধিত) বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু  
(১৯৩৮ বৈশ্বকোষ-১৯৩৮ বঙ্গবন্ধু) বঙ্গবন্ধু প্রবন্ধিত।

২০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীপাণ্ডব মজুমদারের সংকলিত পদ্যভাষ্যকী এখনও বাজারে সহজলভ্য, যেকোন পত্রাকারীর চাষিয়া আছে কবিতা হবে।
২১. দত্ত, হিরেন্দ্রনাথ, হিরেন্দ্রনাথের পদ্য ভাষ্যকী, প্রথম খণ্ড, প্রথমখণ্ড ও রাঙ্গালীয়া হিরেন্দ্রনাথের পদ্য অভিভূষণ, কলকাতা, প্রকাশকালের উল্লেখ নেই।
২২. ক. সেন, দীনেন্দ্রচন্দ্র, বিবিকিষায় প্রথম, আগুতোর দৃষ্টিকোণ, ইতিহাস-পাবলিশিং হাউস। কলিকতা, ১৯৩৮

২০. সেন, মীনেরভক্ত, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পরিষদ, কলকাতা, আদ্যষ্ট ২০০২, পৃ: ২৯০
২১. হাকিমুন্নব্বা শর্মে আলা, বাখা আলদা আলদা গ্রন্থে বৃত্ত, মুম্বাই-পর্ব সৌভাগ্যমণ্ডিক তেজ বিহে।
২২. মির, গল্পগ্রন্থ, মজুমদার, বিমানবিহারী (সম্পাদ) বিশ্বাশ্রিত পদ্যকবী, কলকাতা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, দশকপুর্নিমা, ১৩৫৪
২৩. উদ্যোগবাহু, শেখরপুর্নিমা, শেখর লেখাপাঠ উদ্বিগ্ন-বিশ্ব শব্দকে দুটিগোষ্ঠে

২৭. ঘোষ, কৈলাচচন্দ্র, *রাধাকান্ত সাহিত্য*, অর্য্যাবিশ্ব প্রেস, কলকাতা, ১৯৩২, পৃ. ৭৭
২৮. বহু পুথি বিহারী কাজেই শব্দ পাঠ্য অনুসরণ। আর ধারাবাহিকতা সরল কর্ণ-কারণ সূত্রের অনুসারী স্বতন্ত্র লেখকের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে।
২৯. বাসু, হুমসহ, *শ্রীকৃষ্ণভক্তিরসী*, অধ্যাপনাগার, দুর্গেশচন্দ্র (সম্পাদ), সাহিত্য প্রকাশিকা, দ্বিতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৃ. ২
৩০. *তদেব*

৩১. কবিদ্বিজ, কৃষ্ণদাস, ঠেডন্যচরিতামৃত, সেন, সুকুমার, মুম্বাণাথায়, তারানা (সম্পাদ), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা কৈশব ১৪০৮
৩২. মধ্যযুগ, অষ্টম পরিচ্ছেদ, পৃ: ১৮৪
৩৩. দাস, রসময়, পূর্বোক্ত, পৃ: ৩
৩৪. উদয়ব
৩৫. সিদ্ধান্তাবলম শেখ-কাল বিদ্যুৎ—জ্যোতিষিক দৃষ্টাবলম থেকে পৃথক বৈজ্ঞানিকের কাছ সিদ্ধান্তাবলমই পরসঙ্গত।
৩৬. কবিদ্বিজ, কৃষ্ণদাস, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৮৩

৩৬. বাহাদুর, আলীকৃষ্ণ, সাক্ষিত সন্নিধ্যাকর্ষী, শোভাবাজার থ্রেস, বলকবতা, ১৮৮  
পূঃ বাংলা (১১৬) ইংরাজি (১১৫)

দৃষ্টিগোচর হয়। আগ্রহী পাঠক রিয়েল্টে প্রকাশিত পুনর্মুদ্রিত বঙ্গবর্ধনের দ্বিতীয়খণ্ড (১৯৮০ বৈশাখ—১৯৮০ চৈত্র) দেখতে পারেন।

નૃ: વાણા (૧૧૭) દેશરાજી (૧૧૯)

মণিভূষণ ভট্টাচার্য

আকাশে নিলাম, টুকরো টুকরো চাঁদনিমাংস ভাসে  
 দু'চার খণ্ড আঠা দিয়ে সাঁটা তামাসার ইতিহাসে  
 আরণ্যকের জিভের উপরে অকাল বৃষ্টিকণা  
 গর্ত যদিও পরিসরহীন, আজ কিছু বলব না,

কুড়ি কুড়ি করে ধ্রুবতারা খেয়ে চাঁদ খাওয়া শেষ হলে  
প্রান্তর জুড়ে কিন্নর মাথা শুধু ঝুঁড়ে পড়ে থাকে,  
জাহাজ ডুবলে আরেক জাহাজে ভাসব দুর্গা বলে  
মেহগিনি রাতে কাঁচা নদী এসে ভাঙছে ভয়াল বাঁকে...  
৩০.৬.২০০৫

## প্রেমেন্দ্র মিত্র স্মরণে

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

মানুষের মন এক রহস্য-গুহা—

মুখের পেছনে নেমে গেছে ধাপে ধাপে

নীচের পাতালে, যেন কোন দেশ মহা

জ্বলছে নিম্নত নিরালোক উত্তাপে।

সে মহাদেশের ভূগোল প্রকৃতি সীমা

মরু পর্বত প্রাণী ও বাসিন্দার

অদ্ভুত যত চেহারা কি ভঙ্গিমা

মানুষকে মুঢ় করেছে বারংবার।

আত্মকে জানো বলেছেন মুনিস্বয়ি

তবুও মানুষ আপনার আচরণে

ব্যাখ্যা হারিয়ে নিজেই নিজেকে দুমি

আলো খুঁজে মনের ভয়াল বনে।

অজানার প্রতি অসীম কৌতুহলে

নির্ভয়ে যিনি মনের অন্ধকারে

নেমেছেন একা দুর্গম স্থলে জলে

তাকে মনে করি এ ভীক পদ্যাকারে।।

## একজন নটরাজের বিকেলবেলা

অমিতাভ গুপ্ত

ওর পায়ে অস্তিম আলতাটি একে সেবে বলে

ত্রিভুবন রাঙিয়ে উঠেছে। পার্বতীর ছোট্টো সর্বনামা স্তোত্রের

বুক চিরে

কাঁপছে মেঘ। বাঘছাল জড়িয়ে ধরছে নদীচরের পৌরুষদপ্ত অসকে

কাছে দূরে প্রত্যেকটি গোপন কথাই হয়ে উঠেছে পান

হঠাৎ বেজে উঠল ডমরু

ঈশানের বাতাস থেকে ছুটে এল মহাকালের ক্রিপ্রতা দিয়ে গড়া

একটি সাপ। জড়াল ওর গলায়। শিউরে উঠল কণ্ঠের

নীল বিষ



## ঘোড়া বিষয়ক মুহম্মদ মতিউল্লাহ

গৃহপালিত পশু হিসেবে এসেছে তেমন ঘোড়ার চলন নেই  
এই বৃষ্টি আর কৃষিকর্মের দেশে জোড়া বলসের লাঙল কথা বলে  
রাজ্য চুরপুনি বিশ্বের কোশিগ্রাম এইসব গ্রাম জুড়ে কৃষিকাজ  
ত্যান রিকশায় যাতায়াত, রাস্তা খাপছাড়া

একটি কেবল একটিই ঘোড়া হেঁটে যায় সেই পথে  
কখনও একা একা সবুজ ঘাসে ঘাসে হেঁটে চলা তার  
কখনও দু'চাকর মাঝখানে  
তার সোনালি গা বেয়ে সভ্যতার যাবতীয় দ্রুত কখন  
তার পায়ের শব্দে কৃষিভিত্তিক গ্রামদেশের অব্যবহার বিদ্যুৎ

একটিই সোনালি ঘোড়া আমি রাস্তায় রোজ দেখি  
পশাবহনের পশারি সেজে দ্রুত সে যোরাফেরা করে  
মানুষের ঘরবাড়ি, সমাজসংসার জুড়ে তার যাতায়াত।

## মামাবাড়ি সুদীপ দে সরকার

নস্টালজিয়া আমার হাত খুব শক্ত করে ধরে আছে  
আমি ওর হাত ছেড়ে পালাতে পারি না  
ছেলেবেলাকার মুখ মনে পড়ে: আমি যেন 'পেলে'  
মামাবাড়ির খুব চেনা অপরূপ উঠানে  
রবারের বল নিয়ে খেলছি, সঙ্গে ভাই  
পাড়ারও কয়েকটি বাচ্চা যোগ দিল আমাদের দলে  
পরীক্ষার পর কিংবা পূজোর সময়  
কিংবা গরমের ছুটি হাতে পেলে সোজা মামাবাড়ি  
মনে পড়ে মনে পড়ে মনে পড়ে...

আমি  
সেই সমস্ত দিনে আজও ভুব দিয়ে আছি  
আমি চাই না

এখনকার এই তিন টুকরো হয়ে যাওয়া বাড়ি  
যেখানে আমার সেই উঠানের

'র'-এর ফটকটুকু নেই  
কিন্তু এসব আমি কাকে বলব, আমি  
এখনও ওর শক্ত হাত দুটো ছেড়ে পালাতে পারিনি

তিন খণ্ড মামাবাড়ি নিয়ে আমি ভীষণ লজ্জিত  
আমার কাছে মুখ দেখাতে পারছি না ঠিকমতো।

## জন্মদুখিনীর গল্প

মেঘ মুখোপাধ্যায়

একটা গল্পের মধ্যে আরও একটা গল্প অনসহায়  
জন্মদুখিনীর—আখ্যানের ভিতরে আখ্যান;  
খুঁজে খুঁজে পৌঁছে যাই মূলে .  
এ গল্প এবার শেষ ফিরে আর শুনতে হবে না  
কারও ঘরে ট্রেনে বাসে মেসে বা দপ্তরে লিকনিংকে  
যেই না ভেবেছি আমি দেখি পা ঠেকে গিয়েছে  
নতুন চৌকাঠে, আর খুলে গেল আরেকটা দরোজা  
নতুন শুমরানি শোনা যায়  
আরেকটি বৃকের ধ্বংসক  
জন্মদুখিনীর গল্প ফুরিয়েও ফুরোতে চায় না  
বয়ে চলে নতুন শতকে, এ মহাভারতে।

## অস্থির সময়ের প্রশ্ন

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

আমার শিশুকে আমি এতটুকু নিশ্চয়তা দিতে পারছি না;  
সে আজ সম্পূর্ণ অরক্ষিত!  
তাকে ঘিরে সপ্তরথী, সৈন্যদের নিশ্চিহ্ন গ্রহণা;  
তাকে ঘিরে দুর্ভেদ্য প্রাচীর।

অস্থির সময়। শিশু বালক যুবক যুবতীর  
চোখের ভাষায় যেন বিজ্ঞাপন দিনের সমোহন।  
প'ড়ে নিতে চাই, কিন্তু অক্ষর অস্পষ্ট হয়ে আসে।

একদিন যে শরীর ছায়া হত, সর্বশাস্ত্র মানুষের পাশে  
নিঃশর্তে, প্রত্যাশাহীন দীড়ায়ত;  
যে কোনও অস্পষ্টতা  
না রেখেই দৃষ্টিতে, জানাত  
অভ্যর্থনা, সেই  
কোন কেন এত উদাসীন?

কি এমন ঘটে গেছে পৃথিবীতে? কেন স্বপ্ন এত অর্থহীন  
মনে হয়? অবিশ্বাস গড়েছে সঙ্গ্রাসকবলিত  
আর এক পৃথিবী; একে অপরের মুখ থেকে গ্রাস  
কেড়ে নিতে এত যে তৎপর  
কেন হল, প্রশ্ন করি কাকে?

আগ্রাসী তিমির মতো বিশ্বাসন গিলে খাচ্ছে জাতীয় সত্তাকে;  
মানুষ হারাচ্ছে তার 'ভূমিপুত্র' আত্মপরিচয়  
হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটছে সাতসমুদ্র  
পার হয়ে নীলরক্ত-ঈশ্বরের দেশে।

মেঘা ও তরলসোনা ছদ্মবেশী বান্ধবের বেশে  
নৃষ্ঠনের আয়োজন। কুণ্ডলপুত্রে করে জড়ো;  
তাবৎ লুপ্তিত রক্ত; প্রয়োজনে বাধায় সজ্জাত;  
মৃত্যু করে হানাদারি। বিশ্ববৃত্তে তার আখ্যানাল।

পঙ্কপাণ্ডবের পাঁচটি গ্রামও দেবে না দুর্বোধ্যন;  
বিনামূল্যে সে দেবে না সূচ্যগ্র মেদিনী;  
দেশে দেশে কুকক্ষেত্র গড়ে তোলে আত্মপ্রয়োজনে।

বিরেক, বিশ্রোহ, শুদ্ধ মানবতা আজ শবাসনে  
বসে আছে। এ রকম ছিল কোনও দিন?

অস্থির সময়ে বসে প্রশ্ন করি যাটোখর্ষ প্রবীণ।



## দু'টি কবিতা

কালীকৃষ্ণ গুহ

### পূর্ণ

পূর্ণ এই, পূর্ণ ওই স্থান  
দিনের শেষ রাত্রির উত্থান

পূর্ণ থেকে পূর্ণ উপচে পড়ে  
অবাক মানুষ শহরের বন্দরে

পূর্ণ থেকে পূর্ণ যায় যদি  
পূর্ণ থাকে, কীর্তিনাশা নদী

পূর্ণ এই ক্ষণ পূর্ণ সাল  
চারদিকে সেই আকাশ মহাকাল

### অপূর্ণ

অপূর্ণ রাশি পূর্ণের পাশাপাশি  
জন্ম জরা ও মৃত্যুকে ভালবাসি

যারা দূরে যায় বুঝ থাকে থাকে তারা  
আবহমানের পথে বৃষ্টির ধারা

সাঁপের পায় হয়ে ঘিরেছি অন্ধকারে  
সেই স্মৃতিটুকু ঘিরে আসে বারেকারে

মধুময় এই আকাশ পৃথিবী হাওয়া  
ব্রতচ্যাবাদিনে বাধা পার হয়ে যাওয়া

অপূর্ণ থাকে জন্মের মাঝখানে—  
এ জীবন কাটো মৃত্যুর অভিমানে

ধারাবাহিক স্মৃতিচারণ

## আমার সময়ের কথা

ননীমাধব চৌধুরী  
সম্পাদনা ও টীকা—সুমিতা চক্রবর্তী

লেখক ননীমাধব চৌধুরী (১৮৯৫-১৯৭৪) পরিচিতি

বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত পাবনা জেলার হরিপুর গ্রাম বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে বনামধন্য। এই গ্রামেরই জন্মিলার ছিলেন চৌধুরী পরিবার—যে পরিবারের সন্তান আওতেশ চৌধুরী যোগেশ চৌধুরী মুন্সুনাথ চৌধুরী প্রমথ চৌধুরী—সকলেই বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির বিবর্তনে রেখে গেছেন নিজেদের নামের স্বাক্ষর। আওতেশ চৌধুরীর দিলি প্রসন্নময়ী এবং ভাগিনেরী ক্রিয়াকলাপ দেবী ও নিজেদের স্বাক্ষরের ও সাহিত্য-প্রতিভার শক্তিতেই বাংলার সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে অর্জন করেছেন নিজেদের স্থান।

হরিপুরের চৌধুরী পরিবারের প্রতিভা বাণেশের অম্যান্য শাখাতেও বিস্তৃত হয়েছিল। অজ্ঞত একজন বিশিষ্ট সাহিত্যসৈন্যী তাঁর সারা জীবনের মনন-চর্চায় নিজেই এবং আমাদের সমুদ্র করে গেছেন। বিশ শতকের মধ্যভাগে উপন্যাসিক ও গল্পকার রূপে তাঁর কিছুটা পরিচিতি ছিল। কিন্তু মনন-সাহিত্যের চর্চায় তিনি ছিলেন সুপরিচিত। প্রবন্ধ-গ্রন্থের জন্য রবীন্দ্র-পুরস্কার পেয়েছিলেন ১৯৭০ সালে। কিন্তু তাঁকে, যেকোনও কারণে হোক আজ আমরা কিছুটা বিস্মৃত হয়েছি।

ননীমাধব চৌধুরীর পিতা বৈষ্ণীমাধব চৌধুরী ছিলেন আওতেশ চৌধুরী, প্রমথ চৌধুরীসের জ্যেষ্ঠভাই। চৌধুরী পরিবারের জন্মিলার শরিকদের একজন। ননীমাধবের জন্ম হয়েছিল ১৮৯৫ সালে। পাবনা ইনস্টিটিউশন থেকে ১৯১৪ সালে ম্যাট্রিকুলেশন এবং পাবনার এডওয়ার্ড স্কুল থেকে আই. এ. পাস করেছিলেন ১৯১৬ সালে। তারপর সাম্মানিক ইংরেজিসহ রিপন কলেজে পড়তে শুরু করেন। থাকতেন কলকাতার একটি মেস-এ। সেই সময়ে প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজপত্র' (১৯১৪-১৯২১) পত্রিকার উজ্জ্বল আবির্ভাবে বাংলা সাহিত্যে বিতণ্ড মননচর্চার পরিমতল ঘনীভূত হয়েছে।

প্রমথ চৌধুরী ছিলেন সম্পর্কে তাঁর কাকা। ননীমাধব চৌধুরী যাত্রায়াত শুরু করেন প্রমথ চৌধুরীর ট্রাইট্রি বাজিতে 'সবুজপত্র'-এর আদরে। নিতান্ত তরুণ ননীমাধব বিশেষ মুখ ফুটতেন না তখন। কিন্তু স্বীকারে তিনি শোষণ করে নিয়েছিলেন সেই বৈদিক আলোবাহনে—তার ঐশ্বর্য্য প্রকাশ ঘটছিল তাঁর জীবনে ও তাঁর লেখায়। যে-চিত্তাবিদগণ পাঠক-সংখ্যা, জনপ্রিয়তা আর গ্রন্থপ্রকাশের

সুযোগসম্মানের দিকে না তাকিয়ে জ্ঞান, মনন ও গভীর উপলব্ধির চর্চা করে থাকেন সারাজীবন—তিনি তাঁদেরই একজন।

মনোযোগী ও মেধাধী ছাত্র ছিলেন। কৃতিত্বের সঙ্গে যথাসময়ে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন বি. এ. (১৯১৮) ও ইংরেজি সাহিত্যে এম. এ. পরীক্ষায় (১৯২০)। প্রথম কর্মনিমুক্তি সরকারের অনুদানবিভাগ। 'সবুজপত্র'-এর আসরে আনাগোনা অব্যাহত। সে-আসরে তখন উঠে এসেছে যে ফেয়ার রোডের বাড়িতে। প্রমথ চৌধুরী আর ইন্দিরা দেবীর কাছে আকোশের অকুপ মেহ পেয়েছিলেন ননীমাধব। জগতি-আখ্যায়িকা ছাপিয়ে তা হয়ে উঠেছিল আদিক বন্ধন। ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী ১৯৫১ সালে তাঁকে যে-পর লিখেছিলেন তা উদ্ধৃত হল। এই সম্পর্ক কখনও ছিন্ন হয়নি তাঁদের জীবনকালে।

কল্যাণীয়েশ্বর  
শ্যামলী, শ্যাম নিঃ ৩/৯/৫১  
কাল কাগজে ওর সখস্বে তোমার স্মৃতিলেখা বড় খুশি হলুম।  
তবু একজনও তাঁকে মনে করেছে।

আমাদের যেমন ছেলেপিলে সেই, তেমনি তোমারই তাঁর বংশরক্ষা স্মৃতিরক্ষা দুই করবে। বিশেষ তোমার তাঁর লেখা পুস্তকাদির দিকে আকর্ষণিক বোঁক আছে, যা ছেলেদের মধ্যে আর কারও বড় দেখা যায় না।

আজ পাঁচ বৎসর হয়ে গেল, তাঁর প্রবন্ধসংগ্রহ এখনও বেরল না বলে বড় অনুতাপ হয়। অতুলবাবু অনেকদিন হল গোটা পঞ্চাশের প্রবন্ধ বেছে দিয়েছেন জান হয়াত; এখন তার একটা ভূমিকা লিখে দিলেই তাঁর কাজ হয়ে যায়। কিন্তু বিশ্বভারতী গ্রন্থনিবন্ধাণ নিজেদের কাজ নিয়ে এত ব্যস্ত যে এতদিনেও এদিকে যথেষ্ট মনোযোগ দিতে পারেনি। অর্থাৎ এত বড় করে ক্রম সেবেতন দেয় যে আর কারো হাতে দিতেও ইচ্ছে করে না। এতদিনে আশ্রয় আশ্রয়কটা হয়েছে। ছাপা থেকে ছাপা হলেও বুঝ সাবধাননে ফন্দ না দেখলে ভুল থেকে যায়। তারপর তাঁর আশ্রয়কথার একাধি বৃদ্ধমেথকে ছাপতে দিয়ে পাণ্ডুলিপি আর ঘিরে পেলুম না। যদিও তিনি বলেন ফেরৎ দিয়েছেন। তাই সেটাও কান্না হয়ে রইল। বড় অফশোস হয়। তাঁর স্মৃতির জন্য কিছুই করতে পারলুম না। আমারই দোষ। এক দুর্ভাগ্য।







বাস করতেন সুপরিবারে। সে বাড়িতে ছোট ছেলেমেয়ে ছিল। স্বভাবতই আমার আজ্ঞা হল সে বাড়িতে। ডাক্তারবারুর গৃহিণী মুক্তি বাওঘাতে আমাকে, তাঁর ছেলেমেয়েরাও শেত। ওনেছিলাম তার দেশ বীরভূমে। কী করে জানি না বীরভূমবাসীর সাথে মুক্তিযাত্রার একটা যোগসূত্র গ্রহিত হয়ে রইল আমার মনে সেই থেকে। সেই বাড়িতে পাড়ার বাঙালি ছেলেদের সাথে আলাপ পরিচয় হল ক্রমশঃ। গণতন্ত্রী নদী ও মজফরপুরের নিচুর সাথে পরিচয় হল।

আমার মজফরপুরবাসীও বেশিদিনের নয়। তার শ্রুতিও বুঝ ফিকে হয়ে গিয়েছে, মনে দুটি ঘটনার স্মৃতি ছাড়া।

একটা ঘটনার ফলে আমার মজফরপুর ছাড়বার ইচ্ছা পাকা হয়ে গেল। আমি জেলা স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম। হিমি ও পূর্নো শড়ানো হত বলে অসুবিধা ছিল। অল্প পড়াবার কালে উর্দুভাষী মুসলমান মাস্টারটি এই অসুবিধার কথা আপনাকে না এনে তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছিলাম না বলে এক চড়ু করে দিলেন। রোগে বৈধব্রাতা নিয়ে ক্লাস থেকে চলে এলাম। আমার পিতৃব্য অনেক বুঝিয়েসুঝিয়ে আর স্কুলে পাঠাতে পারলেন না। বাড়িতে চিঠি লেখালেবির পরে হির হল আমি ফিরে যাব। পাবনা শহরে কবে তাই হবে।

দ্বিতীয় ঘটনার কথা দেশের সকলে জানেন। ১৯০৮, এপ্রিল বোমার শেখ। সারা শহর শুনে চমকিত হল ঘোড়ার গাড়িতে বোমা ফেলে কারা মিসেস ও মিস কেনেডিকে হত্যা করে পারিয়েছে। এ কথাও রাষ্ট্র হল যে বোমার আসল লক্ষ্য ছিল মজফরপুরের তখনকার ভক্ত কিসেফোর্ড সাহেব। কিসেফোর্ডের ওপর ক্রোধের কারণে ব্যঙ্গ বাঙালি ছেলেদের মধ্যে আলোচনায় শোনা গেল। সেদিন ছোট-বড় সব বাঙালি ছেলেদের মধ্যে উত্তেজনা কণা, ব্যঙ্গ বাঙালিদের মধ্যে স্বতন্ত্র ভাবের কণা মনে পড়ে। এই বোমা ফাটার ফলে বাঙালি ছেলেরা যেন চিহ্নিত হয়ে গেল বিদ্যার ছেলেদের কাছে, পুলিশের কাছে। হত্যাকাণ্ডীরা যে বাঙালি সম্রাটবানী এ কথা রাষ্ট্র হয়েছিল।

ফুসিগ্রামের ধরা পড়বার সংবাদ রাষ্ট্র হল। কাল পেল তাঁকে নিয়ে আসা হচ্ছে মজফরপুরে। ফুসিগ্রামের ধরা পড়বার সংবাদে আমাদের মধ্যে একদিকে দুঃখবোধ, অন্যদিকে তাকে একবার চাক্ষুষ দেখবার জন্য দুর্নিম আগ্রহ। এই আগ্রহ সর্বজনীন বলে মনে হয়েছিল।

দুপুরের পরে পিতৃব্যকে না জানিয়ে কয়েকজন ছেলের সাথে গিয়ে স্টেশনে গেলাম। স্টেশনের বাইরে, প্রকাণ্ড হাতের মাথো, প্রায়ফুটে ভজাতা। ভিতরের মধ্যে ঢুকলে কিছু দেখতে পাব না তাই আমার সঙ্গীদের মধ্যে পারদর্শন হল কিছুকণ। তার থেকে

স্টেশনে প্রবেশের পথ বড় ফটকের মধ্যে দিয়ে, ফটকের দু'দিকে সীমানা বরাবর নিচু পাঁচিল, পাঁচিলের ওপরে উঠে লোহার রেলিং। রেলিংয়ের ওপরে উঠে ফটকের ইটের খামের মাথায় চড়ে বসলাম।

গাড়ি এসে দাঁড়াল। কোথা থেকে দলে দলে লাল পাশভিঙালা জনতার মধ্যে ঢুকে পড়ে গাভা মেরে বোঁদা চালিয়ে লোক সরবার চেষ্টা করতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে দেখলাম চামড়ার দাঁড়ি বাঁধা মোটা বেত হাতে দু'জন সাহেব ভিত্তের মধ্যে ঢুকে এলোপাখাড়ি বেত ঢালাতে লাগল। সাহেবের বেত ও পুলিশের বটনের দাপটে ভিড় পাতলা হয়ে এল। একখানা ফিটন গাড়ি যীরে যীরে এগোতে লাগল ফটকের দিকে। দেখলাম পেছনের সিটে দু'জন রিজলভারধারী সাহেবের মধ্যে বসে সাদা জামা গায়ে রোগা, শ্যামবর্ণ একটি ছেলে পৌঁছের রেখাঝাড় উঠেছে। মাথায় বক বক চুল, তার দু'হাতে হাতকড়ি, পায়ের লোহার বেঁটি, কোমরে দড়ি। সামনের সিটে উপবিষ্ট একজন সাহেবের হাতে দড়ির প্রান্ত।

ফটক পার হয়ে গাড়ি এগিয়ে গেল। স্টেশনের সীমানার বাইরে রাস্তার দু'পাশে ভিড় জমেছিল। বোধহয় সেই ভিড়ের মধ্যে থেকে কে চেঁচিয়ে উঠল 'বন্দেমাতরম'। রিজলভারধারী সাহেবদের একজন কেউ নড়িয়ে কী একটা গালাগাল করল ভিতর দিকে তাকিয়ে। বকে ও বটনের আশ্রয়ন থেকে এলে শুকনুখাও থেকে নেমে আমরা বাড়ির রাস্তা ধরলাম।

এর বোধহয় দু'দিন পরে প্রফুল চাক্ষুসী আয়তহার্যর সংবাদ নতুন উত্তেজনার সৃষ্টি করল। বাঙালি ছেলেরা নিজেদের মাঝে লবালি করতে লাগল। ফুসিগ্রাম কেনে ধরা পড়ল। প্রফুল কী কর্মের কাজ দেখিয়ে চলে গেল।

মানিকচন্দ্র বাবান্নে বোমার কারখানা ও অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কারের এবং দু'ডজন বাঙালি যুবকের প্রেস্ত্রাণের সংবাদ এই সময়ের কাগজে বেরিয়ে বাঙালি মহলে বিম্বয় ও ভয়-নিমিত্ত উত্তেজনার সঞ্চার করল। ছেলেরা দিনের পর দিন সেজে রইল এসব সংবাদের আলোচনায়। বড়দের আড়ালে এবং নিজেদের মধ্যে এ আলোচনা চলত।

মজফরপুর থেকে বাড়িতে ফিরে আসার পরে সর্ববিধে পরিপ্তার ফুসিগ্রামকে দেখবার কামিনী ভাই-বোমারের মধ্যে গল্প করিছি। কারও করও একথা এমনও মনে আছে। বাংলায় বিদ্রোহী আন্দোলনের অভ্যুদয় তখন বাংলায় ঘরঘরে বিম্বয়, প্রশংসা ও আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে।

মজফরপুরের কয়েক মাসের প্রবাসের কথা শেষ করবার আগে প্রথম কাশী দর্শনের কথা একটু বলছি।

## কাশী

বোধহয় অল্প কয়েক দিনের ছুটি পেয়ে পিতৃব্য আমাকে নিয়ে কাশীযাত্রা করলাম। তাঁরও কাশীদর্শন হয়নি আগে কলকাতা থেকে ওঠবার জায়গা ছিল আমাদের এক আখীরের বাড়ি। কাশী স্টেশনে নেমে কাশীর বিখ্যাত একমাত্র সোয়ারি হয়ে সোনারপুরায় এক গলির মধ্যে খুঁজে খুঁজে সে বাড়ি আবিষ্কার করে। লোকবার পথ একেবারে অন্ধকার, সেই অন্ধকারের মধ্য দিয়ে মোতলায় ওঠবার সিঁড়ি।

কাশীর বাঙালি-টোলার গলিযুক্তির মধ্যে ছোট বাড়ি যে কী বস্তু তার প্রথম অভিজ্ঞতা হল। দেশের অর্থবিত্ত সংসারের গলিযুক্ত বয়স্ক বিধবার মাসিক পাঁচ টাকা বৃত্তি সম্বল করে কীভাবে কাশীবাস করেন, অথবা সংসারজাল্যায় দহ হয়ে কিমানাথের পরের তল্যায় আশ্রয় নেন তার অভিজ্ঞতা হল।

বাড়িটি আমার আখীরায়, মাতুলপরিবারের সম্পর্কে আখীরায়। কালো নানা চণ্ডা চোরাগার, অনেক কয়ল হলেও শেখ শেখ ছোলেদায় দুটি ঘর, একটি ঘরে থাকতেন তিনি, অপরটিতে ছ'সাতজন প্রাণ্য বিধবা ভাড়টে। একতল্যায় দু'খানা ঘরে থাকত বোধহয় তিন বারো ব্রাহ্মণের শ্রেণির বিধবা। একটা অন্ধকার ঘুরপিরও ছিল একতল্যায়, লোকানো শেষ প্রতিষ্ঠিত ছিল। বাড়ি ভাড়া মাসিক আট আনা ও চার আনা।

কাশীবাসিনীদের নৈমিত্তিক জীবনযাত্রার ছক ছিল এক রকমের। সকালে উঠে আঁচলে কয়েকটি পয়সা বেঁচে কাড় গামছা ও পিতলের সাজ নিয়ে সকলে বেরিয়ে যেতেন। দশাশ্রমযে ঘাটে রান করত, বিশ্বনাথের মাথায় গঙ্গাভ্রম লেগেপাড়া চড়িয়ে সামান্য তরকারিপাতি কিনে বাড়ি ফিরতেন। কেউ কেউ দুখনিয়া বাথিয়ে করতেন কার্যমায়ে, এই এমন ঘাটে পড়ে গিয়ে পাজা, হাফের ওতো খাওয়া ইত্যাদি। দুপুরে রান্না ও আহারের পর ভাঙাঘর দুখ মনে হলে বসে পড়ে কাটতেন ও গর গাছ করতেন। বিকালের দিকে কেউ ঘাটে পাঠ ওনতে যেতেন, কেউ আরতি দেখতে যেতেন, কেউ বাড়িতে থেকে ভোপে করতেন।

দু'জন অতিথি পেয়ে আখীরায় ভাড়াটে বিধবাদের নতুন কাজ মিলে গেল। কার সাথে কার আখীরাতার কী সুস্বপ্ন বন্ধন আছে মহাভিকারে আবিষ্কার করতে লেগে গেলেন।

বিশ্বনাথ-অঙ্গুর্ণা দর্শন, গঙ্গাস্নান ইত্যাদি তীর্থযাত্রীর যে সকল কর্তব্য আছে সে সকল কর্তব্য নিচয় পালন করত। কিন্তু বিশ্বনাথদর্শনের সময় দাধাবাতির কথা ছাড়া আর কিছু মনে নাই। প্রথম কাশীদর্শনের সখস্ব যা মনে আছে তা হচ্ছে

বাঙালি-টোলার জেকবার পথে মিষ্টির সোকানের চমৎকার রাবড়ি, কালকুন্ড, বানসের প্রাচুর্য, উৎপাত। বাঙালি বিশ্বনাথের সন্ধ্যা, সবারক খাদ্যবস্তুর নামের সুলভতা। আর গলির মধ্যে বাড়িগুলো নিচুতলার বিখ্যাত অন্ধকার।

পরে কাশীতে গিয়ে আরও দু'বার আমি সোনারপুরের আখীরায় বাড়িতে উঠিছি। তার কথা পরে বলব।

কাশী থেকে মজফরপুরে ফিরে গরমের বণ্ডে বাড়ি এলাম। তারপর পাবনা শহরে আমাদের নিজেস্ব বাড়িতে চলে গেলাম। এই বাড়ি ভাড়া দেওয়া ছিল। ভাড়া উঠিয়ে দিয়ে আমার আর এক পিতৃব্য ওই বাড়িতে থেকে ওকালতির ব্যবসা শুরু করেছিলেন ক'মাস আগে।

## পাবনা

পাবনাতে স্কুল জীবনের ছয় বছর এবং কলেজ জীবনের দু'বছর এই আট বছর কেটেছে। অর্থাৎ বালা-কেশোর পার হয়েছি। পাবনা ত্যাগ করি ১৯১৬-তে।

পাবনায় স্কুল জীবন শুরু হল পাবনা ইনস্টিটিউশনে। পরবর্তীকালে এই স্কুলের নাম বদলে প্রতিষ্ঠাতার নামানুসারে গোপালচন্দ্র ইনস্টিটিউশন হয়েছে। স্কুলে ভর্তি হলাম সেভেছ ক্লাসে, অর্থাৎ এখনকার class IV-এ। শহরের সিঁড়িতে শোলা মাঠের মধ্যে ইছামতী নদীর কাছে স্কুলবাড়ি। আমাদের বাড়ি থেকে প্রায় এক মাইল রাস্তা হেঁটে স্কুলে যেতে হত। এই স্কুল থেকে মাস্ট্রিকুলেশন পাশ করেছি ১৯১৪-তে। তারপর আর এ. প্রোসে ভর্তি হলাম পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে এই বছরে।

স্কুলের নিচু ক্লাসের শিক্ষকদের মধ্যে শত্রুচন্দ্র চৌধুরীর কথা মনে আছে। এর কথা পরে বলব। উচ্চ ক্লাসের কাছে পড়েছি তাঁদের মধ্যে প্রধানশিক্ষক অধরচন্দ্র মল্লিক ও সহকারী প্রধান শিক্ষক রাখাবিনোদ বসাকের কথা ভাল করে মনে আছে। স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা গোপালচন্দ্র লালজি বোধহয় সুপারিনটেন্ডেন্ট ছিলেন। সেক্টরভাণ্ড ও ফস্ট ক্লাসে ইংরাজি পড়াতেন। রাশভাষী গণ্ডীর মানুষ ছিলেন লাহিড়ীমশায়, সকলে ভয় করত তাঁকে। ছেলেদের যেনমান শাসন করতেন। তবমই ভালওবাসতেন তিনি। অপরদিক ও রাখাবিনোদবাবু যুব ভালবাসতেন আমাদের। এই ভালবাসা লেখাপড়ায় ভালকলের প্রতি শিক্ষকের নৈর্ব্যক্তিক ভালবাসা না। কারণ লেখাপড়ায় আমি তাঁদের সখস্ব করতে পারিনি। অপরদিক অল্প কবিতায় আর যতদূর মনে পড়ে অন্ধের প্রভেচকটি পরীক্ষায় আমি পাশ নশ্বর তুলতে পারিনি। শেষের বছর অধিযশের তাঁর টেলিগের পাশে টাঙা বসিয়ে আমাকে অল্প শেখাতেন তিনি। নির্দিষ্ট সংকল অল্প বেশি না হলে বাড়িতে যেতে দিতেন না ছুটির পরেও। রাখাবিনোদবাবু তাঁর বাড়িতে



নিয়ে প্রায়ই বাওয়াতেন, নানা গল্প করতেন, ইতিহাস ও ইংরেজি পড়াবার সাহায্য করতেন। সেকালে শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে সম্পর্কের আশেপাশে কথা উঠলে এসের দু'জনের কথা আগে মনে পড়ত। হেডমাস্টারের কাছ থেকে একটা গল্প মনে পড়ত। তখন first Class (Class X)-এ পড়ছি। ইংরেজি, বাংলা গল্প উপন্যাস পড়ায় আগ্রহ হয়েছিল। ফুলের লাইব্রেরি ছিল একটা বড় হাথরে, সেই বইয়ের কবোলায় হেডমাস্টারমশায় বসতেন। Test পরীক্ষার পরে একদিন লাইব্রেরিয়ানের কাছে মেরি সোররোর 'Sorrows of Satan' বইখানা চাইলাম চুপি চুপি। নিম্নস্থরে বইখানার নাম বললেও তাঁর কানে গিয়েছিল, গভীরভাবে আমাকে ডাকলেন। টেবিলের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে মাথা না-তুলে বললেন 'আগে নিজের বইয়ের কথা ভাব পরে Satan-এর Sorrows এর কথা তোষো।' বাজা পেন্সিল নিয়ে বসে এখানে 'I' সম্ভা পর্যন্ত অঙ্ক কবলেন সেদিন। অঙ্ক সম্বন্ধে ভয় স্থূল জীবনের শেষপার্থ ছিল। কীভাবে মনে পড়ে যা সাহিত্য ও ইতিহাসের প্রতি আকর্ষণ এই সময়ে মনে জন্মে যায়।

পাবনার আট বছরের জীবনের কথা স্মরণ করতে গিয়ে মনে পড়ছে সেই যুগের হাওয়ার কথা। বিভিন্ন রকমের হাওয়া মনে গিয়েছিল সে যুগে শহরের ওপর দিলে। আর সে হাওয়া দেশের সব জায়গায় মাটি ছুঁয়ে গিয়েছিল।

প্রথম হাওয়া হচ্ছে ধর্মভাবের হাওয়া।

স্কুলে ও গণের ক্লাসে যখন পড়ি তখন এই হাওয়ার মধ্যে পড়ে যাই।

এই ধর্মভাবের হাওয়ার দুটি দিক ছিল। একটা দিক চরিত্রগঠন, ব্রহ্মচার্য পালন, সং গ্রন্থ পাঠ ও সং আলোচনা। চরিত্র গঠনের সহায়ক হিসাবে নিয়মিত ব্যায়াম করে শরীরকে সুস্থ ও বলকর রাখা গৃহীত হয়েছিল। সং-গ্রন্থের পাঠ—তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল অশ্বিনী দত্তের বই, বিবেকানন্দের কয়েকখানা বই, রামস্বয়ং কব্জাত Sruas এর Self-help এবং duty, শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর স্বামী-শিষ্য বন্দ্যাদ প্রভৃতি। এ বিষয়ে আমাদের উপদেষ্টা বা গুরু ছিলেন কয়েকজন 'দাদা'। দাদাদের মধ্যে ছিলেন আমাদের ফুলের শিক্ষক শরৎচন্দ্র চৌধুরী এবং কৃষ্ণাঙ্গি বাকটি ও নাপানাল ফুলের মতীয় নার। যতীনা ছিলেন আদর্শচরিত্রের দেশকর্মী, পরে উত্তরবঙ্গের 'গণমঙ্গল' প্রতিষ্ঠানের নেতারাংগে খাতিলাভ করেছিলেন। তাঁদের কেন্দ্রে করে একজন কর্মী গড়ে উঠেছিল পাবনা শহরে। আরেকজন ছিলেন আমাদের ফুলের প্রায়োগিক জিতেন রায়। জিতুরাণ মতো দীর্ঘ সুগঠিত কপালালী দেখেখারী যুবক জোমে পড়ে না। আর স্বভাবে জিতুপা ছিলেন অতি সরল, অতি প্রেমশীল।

এদের কথা পরে আরও বলব। জিতুরাণ এক ভাই দিল্লিশালার সাথে পরে পরিচয় হয়েছিল। আরেকের ভাইয়ের নাম ছিল সত্যরঞ্জন রায়। ইনি বাইরের কোনও কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর কথা মনে আছে সাহিত্যিক বলে, আর খুব সুদর্শন পুরুষ বলে। তাঁর একখান বই মধ্যযুগের বাংলায় বায়ো ভুইঞাদের একজন পাবনা জেলার জাতকের রাজা সেবাদাসের কাহিনি নিয়ে লেখা ঐতিহাসিক উপন্যাস। দাদাদের মধ্যে খাঁয়ের নাম কলকাম চরিত্র ও আদর্শনিষ্ঠার জন্য গুরু মনে করতাম তাঁদের। তাঁদের উপদেশ মনে চলবার চেষ্টা করতাম।

ধর্মভাবের হাওয়ার দ্বিতীয় দিকটায় কথা বলছি এখানে। এটা হল ধর্মভাবের ভাবপ্রবণতার দিক এবং অনুষ্ঠানের দিক।

কোন প্রভাবে কীভাবে সক্রিয় হয়ে উঠল বলে পারি না, আমি অতিমামুলায় আহায়ে নিষ্ঠারী। এবং পুষা জপ থানা ধারার অনুরাগী হয়ে উঠলাম। আজ সে সময়কার বাড়াবাড়ির কথা মনে করে হাসি পায় কিন্তু তখন চারদিক ধর্মের হাওয়া এত প্রবল ছিল বাড়ির লোক ছাড়া বিহরের অনেকের কাছে আমি ভক্তপ্রসঙ্গ হয়ে উঠেছিলাম।

মাছ মাংস ডিম পোয়াজ প্রভৃতি আহার্য-তালিকা থেকে বর্জিত হল। পান পর্যন্ত খেতাম না। গলায় ও বাহুতে রক্তাক্ত মালা হল জপ করবার জন্য। ১০৮ নাম, ১০৮ কন্যাসে মালা হল। ধূপধুনে ছেলে গভীর রাত পর্যন্ত তত্ত্বাবধায় এবং ঘান্না করা হত পেগেয়া স্থাপ পরে এবং হরিণচর্মের আসনে উপবিষ্ট হয়ে। আহায়ে নিষ্ঠার তার ওত্র হয়ে উঠেছিল যে এই সময়ে ব্যারিস্টার কুমুদনাথ চৌধুরীমশাই মোকদ্দমা উপলক্ষে আমাদের বাড়িতে এসে যে কদিন ছিলেন সে কদিন ধর্মমহিমা বোধ করবার জন্য ফলমূল ও দুধ খেয়ে কাটিয়ে দিলাম।

ভক্তপ্রসঙ্গের তুলনা কেন দিলাম বলছি। শহরে সাধুসন্ন্যাসী আসবার বার পেয়ে সেখানে ছুটতাম। মনে পড়ছে একবার এক সন্ন্যাসী এসে উঠেছিলেন ব্রহ্মনাগর্য চৌধুরীমশায়ের গৃহে। তিনি তখন শ্রৌত, সরকারি উকিল। রায়বাহাদুর নেতাবাহারী বিন্দা আইনজ্ঞ বলে খ্যাত, বিদ্যালীকী এবং প্রতিপক্ষালী ব্যক্তি। সকাল সন্ধ্যা তাঁর গৃহে হাজির দিগন্ত এবং প্রবীণদের মধ্যে গভীরভাবে বসে উপদেশ, কীর্তনগান শুনতাম। চৌধুরীমশাই এই বর্ণনামূলক ভক্তটিকে বিশেষ মেহ করতেন।

পাবনা জেলা স্কুলে একজন শিক্ষক ছিলেন। সিদ্ধতাগ্রিক বলে তাঁর খ্যাতি রটেছিল। আমার বয়সের এক আমার চাইতে বড় কয়েকজন ছেলের যাতায়াত ছিল তাঁর কাছে। তাদের দু'একজনের মূখে নানা রকমের কথা শুনে আমিও যেতে আরম্ভ করলাম। ধর্মকথা, গীতা, চরীতর কথায় সেসে হঠেযো

প্রণায়াম, সিদ্ধিলাভ ইত্যাদির কথাও বলতেন। বছরখানেক যাতায়াতের পরে তিনি আনুষ্ঠানিক তান্ত্রিক দীক্ষা দিলেন আমাকে ও ভ্রাতা একটি ছেলেকে। এই ভঙ্গলোকের কাছে যারা যেতেন তাদের মধ্যে একটি মুসলমান ছেলেও ছিল। স্থানীয় এক মোক্তারের ছেলে সে, আমার চাইতে বড়। বি. এ. ক্লাসের ছাত্র। এই ছেলেরা বাড়িতে আমাদের একটা আড্ডা ছিল।

সাধুসন্ন্যাসী এবং যার কথা এই মাত্র বললাম তাঁর মতো গুরু ছাড়া ধর্মভাবের হাওয়া আর দুটো সুখ ধরে আমাদের মনে পৌঁছাত। একটি সুখ হচ্ছে বেলেড়ু মঠ। বেলেড়ু মঠের খ্যাতি তখন বাংলার মফস্বল অঞ্চলেও প্রসারিত হতে আরম্ভ করেছে এবং রামকৃষ্ণ পরমহংসের ছবি আনুষ্ঠানিক পূজার বস্তু হয়েছে গৃহস্থঘরে। দ্বিতীয় সুখ জ্ঞানানন্দ অবধুতের শিখা ছিলেন। এদের প্রভাবে আমার কয়েকটি সহপাঠীবন্ধু মহানির্ণণ মঠে যাতায়াত করতে আরম্ভ করেছিলেন। ম্যাট্রিকুলেশন পূর্ণ করবার পরে এই বন্ধুদের মধ্যে চারজন গৃহযাত্রা করে মঠে চলে যায়। তারা কেউ সন্ন্যাসে দীক্ষা নিয়েছিল কি না জানি না। তবে পেগেয়া নিজে ঊর্ধ্বমণ্ডলে বেরিয়েছিল। এদের একজনের নাম মহেন্দ্র চৌধুরী। সে ভাল গান করতে পারত। দু'এক বছর বাসে একজন ছাড়া এই নবীন সন্ন্যাসীরা গৃহে ফিরে এসে আবার পড়াশোনা করতে আরম্ভ করে।

মহানির্ণণ মঠে আমি একবার এসেছিলাম (১৯১২ কিংবা ১৯১৩) এক শিক্ষকবন্ধুর সাথে। মঠ তখন কয়েকখানা চালা ঘর, অনেকটা জমি এবং অনেকগুলো ডোবাঘর নিয়ে। সাধু সন্ন্যাসীরা আরা। ভক্তমণ্ডলীর দানে মঠ চলত, কৃষ্ণসান্নাং দে ফিলি। তিনি দিন মঠের জমিতে উৎসব মূল্যের শাক, মুলোর খাঁট এবং মুলোর চাটনি খাবার পরে আর পরে উঠলান। সে শ্রুটি আমার ছোটামির বাড়িতে চলে গেলাম।

মঠে জ্ঞানানন্দ অবধুতের ছবি পুজো আরতি ভোগ হত। নামগান কীর্তন ধর্মসালাকা মানে অবধুতজির উপদেশ ইত্যাদি শব্দকে আলোচনা হত। গৃহযাত্রকের আসনেও অনেক, বাইরের লোকের সমাগন বুঝে শিষ্ট হত না। প্রচার তখনও খুব বেশি হয়নি, সন্ন্যাসীভক্তেরা বলতেন।

আমার সহপাঠীবন্ধুরা মঠে এসে পেগেয়া নিয়েছিল এরপর। আমার শিক্ষক-বন্ধুরের মধ্যে শরৎচন্দ্রা, জিতুদা, তার ভাই সন্ন্যাস নিয়েছিলেন। মঠে সে সময় যে সন্ন্যাসীদের দেখা পেয়েছিলাম তাঁদের মধ্যে একজনের কথা মনে পড়ছে। গৃহস্থজীবনে ইনি ফুলের শিক্ষক ছিলেন। মঠে আমার মতো একটি ছোট্ট ছেলেকে আমার সঙ্গে নিয়ে তাঁর পড়া ধরবার পূর্বস্বত্বাস আমার দেখা দিল। নানা রকম পড়ার প্রশ্ন করে আমাকে সন্তুষ্ট করে তুললেন। একটি

প্রশ্নের কথা মনে আছে। এ মঠই বস্ট অন দি লেজ অব এ কন্টি-এর বাংলা কী হবে? বলতে পারলাম না। তিনি ব্যাখ্যা করে দিলেন বস্ট হচ্ছে বসার past tense আর সে ভক্তি বাংলা ভাষার লেজ। অর্থাৎ গরুর লেজের ওপরে একটি মাছি বসিয়াছিল।

আমার সহপাঠীবন্ধুরের একজন ছাত্র। আর কারও বন্ধ-ম্যোস সন্ন্যাস-কীবনের কথা কিছু জানি না। এই একজনের নাম মহেন্দ্র চৌধুরী। মহেন্দ্রের বাড়ি ছিল পাবনা শহরের উপকণ্ঠে হিমাইটপুরে। ভাল গান করতে পারত সে।

গুনমিছে পেগেয়া নেওয়ার কিছুকাল পরে মঠ থেকে বেরিয়ে হেঁটে গ্রামভ্রমক রোড ধরে চলেতে বর্মদানে পৌঁছায়। শহর থেকে মহারাজার বিরামভজন গোলাপগাছ হাওয়ার পথের পাশে এক জায়গায় প্রাচীরঘেরা বাগানের মধ্যে ছোট ছোট মন্দির ও বৌদ্ধ চৈতোর্য আদর্শে তৈরি দেউল দেখেছি একসময়। এই প্রাচীরে যেন স্থানটির নাম ছিল 'বিজ্ঞানানন্দ বিহার'। বিজ্ঞানানন্দ বিহার মানে মহারাজাবিরাজ বিজ্ঞানচাঁদ মহাত্মাবের উপাসনার গান। এই বিহারের কাছে রাষ্ট্রায় গাছের তলায় বসে মহেন্দ্র গান করত। সেই সময় মহারাজা সেখানে উপস্থিত হন এবং মহেন্দ্রের গান শুনে আকৃষ্ট হন। এইভাবে যে আলাপের সূত্রপাত হয় এবং তার পরিস্রব ঘটন এক বিদ্যাকর যন্ত্রুত।

মহারাজাবিরাজ বিজ্ঞানচাঁদ মহাত্মাবের সাথে আমার পরিচয় পাবনা। তাঁর পাশালা সাহিত্যে অনুপ্রাণ, তাঁর পার্বলিক লাইফ, বিলাস-বাসস ইত্যাদি শব্দকে আমাদের সময়কালর অনেক কিছু কিছু জানেন। কিন্তু মহেন্দ্রের প্রতি শ্রীতি তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্রের এক অসামান্য দিক উন্মোচিত করে বলে আমি দু'একটা কথা বলছি এ সম্বন্ধে।

পেগেয়া ত্যাগ করে মহেন্দ্র গৃহে ফিরে এসে আবার পড়তে আরম্ভ করে মহারাজার অর্পনকুলে এবং আই এসসি. ও এম.বি. পাশ করে। ছাত্রাবস্থায় তাঁর আহ্বানে সে প্রায়ই বর্মদানে যেত এবং সন্ধানীয় অতিথির মতো বাস করত রাজকোষানা। বর্মদান থেকে ফেরার সময় রাজকোষির দেওয়া সীতাভাণ্ডাৎও মিহিনা আদ্য, অনেকবার তার ডাকা পেয়েছি আমার। মহারাজার লিখিত একমিক বাংলা বই ছিল। "বিজ্ঞানানন্দ"। যাকর করে সে বইগুলো মহেন্দ্রকে উপহার দিয়েছিলেন। এই যাকরের লেখা তাঁর অনেক চিঠি মহেন্দ্রের কাছে দেখেছি। কলকাতার ছুটির সময় প্রয়োজনাবিক অর্থ দিয়ে তাকে যাকরর হায়ে বা তীর্থভ্রমণ পাঠানো। মহানির্ণণ মঠেও চালাখয়ের জায়গা এমন যে সুশৃঙ্খল, পাকা সন্ন্যাসীমন্দির দাঁড়িয়ে আছে তা নির্মাণের জন্য মোটা অর্থসাহায্য করেছিলেন মহারাজা, মহেন্দ্রের চেষ্টায়। মহেন্দ্রের বন্ধু আরও দুটি ছেলে মহারাজার অনুগ্রহ লাভ করে সার্থক



হয়। এদের একজনের কাছে মহারাজের লেখা বই ও চিঠিপত্র দেখেছি, কারণ সে আমার সহপাঠী ছিল। সম্বন্ধেই রম্ভা সে-ও মহারাজার স্নেহভাজন হয়েছিল। অন্য ছেলেরা নোয়াখালির, তাকে চিনতাম মাত্র। মহারাজার অর্থসাহায্যে বি.এ.পাশ করে কলকাতায় পুলিশে চাকুরি সংগ্রহ করে তাঁর সুপারিশে। পরবর্তীকালে পুলিশকর্মচারি এর সম্বন্ধে যা শুনতে পেয়েছিলাম তা ভাল নয়।

তখনকার দ্বিতীয় হাওয়া ছিল বিপ্লববাদের হাওয়া।

অতি বাল্যকাল থেকে, যদুশি আন্দোলনের সময় থেকে এই হাওয়া আমাদের গায়ে লেগেছে। মজফরপুরের বোমার ঘটনার পরে হাওয়া জোর পেল। আমার একটি প্রবন্ধে লিখেছি The Swadeshi Movement was the first declaration of Revolt against British rule by the Middle classes in India। আর সে ব্রহ্মোৎসব বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণি প্রথম যোগ্য করেছিল।

যদুশি আন্দোলন অনেক জিনিস দিয়েছে আমাদের, যথা চরিত্রগঠনের আদর্শ, সংস্কার সেবার আদর্শ, সহিষ্ণু দেশপ্রেমের আদর্শ, ভাগ্যের আদর্শ, ধর্মাত্মক বিপ্লববাদের আদর্শ। প্রথম যুগের বিপ্লবীদের অনেকে আদর্শচরিত্র, ধর্মপ্রাণ, ত্যাগী ও সেবারতী ছিলেন।

যদুশি আন্দোলন বহু সমিতি ও আশ্রমের সৃষ্টি করেছিল। আদর্শচরিত্র ও আদর্শশূন্যসংস্কারের প্রতিষ্ঠান হিসাবে। বোমোয়াইলের প্রথম অল ধরা পড়বার পরে পুলিশের শেনি দুটি পড়ো এই সমল প্রতিষ্ঠানের পরে। আমার কথা এই যে বাংলার বিপ্লবধারা ছিল একটা মস্ত বড় গঠনমূলক আন্দোলন, অনেকগুলো ধারা এসে মিলেছিল এর মধ্যে। একে ও শু terrorism বলে করণি বা বিচার করতে চাইলে ভুল হবে। সেদের বিভিন্ন জাগরণ বিপ্লববাদের আদর্শের প্রেরণার যারা ছোট বড় দল গড়ে তুলেছিল সেই আদর্শের মধ্যে নিহিত বিভিন্ন ধারা বহু পড়ে গেছে বিভিন্ন পথে যাত্রা করে তাদের বেঁচে নেউ।

জিতুদা ছিলেন বিপ্লবী। বিপ্লবের আদর্শ প্রচার করবার জন্য বাল্যে শিক্ষার শিক্ষক হয়ে স্কুল যোগ দেন। অনেক ছেলেকে দলে নিয়ে গঠন করেন। বিপ্লববাদের পথ হেঁচু যখন ধর্মসাধনার পথ ধরেন এদের মধ্যে কয়েকজন তাঁকে অনুসরণ করে মহানির্ণাণ মঠে যোগ দিল। বর্তীদা (হতীদা রায়) ন্যাশানাল স্কুলের শিক্ষক, আদর্শে চরিত্রে ব্যবহারের অধারে বেশে সাত্ত্বিক প্রকৃতির মানুষ। বানিকী অন্তরঙ্গতার পরে সাত্ত্বিক কোমলতা অবলম্বনের মধ্য দিয়ে তাঁর চরিত্রের বন্ধকতার দূত্বের পরিচয় পাওয়া যেত। ন্যাশানাল স্কুলের কাজ উপলব্ধ করে তাঁর পাশে জড় হয়েছিল কয়েকজন ছাত্র। এরা হয়েছিল বিপ্লবীদলের বিশিষ্ট কর্মী। এদের

কয়েকজনের কথা মনে আছে। বহুর কুড়ি বয়স। ব্যাঘ্রমের ফলে সেই হয়েছিল ই-পাঠের মতো, সেই ভেতের অলঙ্কার ছিল শিশুর মতো সরল হিমসিমা একখানি কচিমুখ। তাকে ভাকতাম রাখালদা বলে। কারা-প্রাচীরের অন্তরালে রাখালদার জীবন শেষ হয়েছিল শুনেছিলাম।

স্কুল-জীবনের শেষের দিকে ও কলেজ-জীবনের প্রথম দু'বছর আরও কয়েকজন বিপ্লবীর সাথে পরিচয় হয়েছি প্রধানত যতীন্দ্রনাথ আত্মায়। বহিরের অনেক বিপ্লবীকর্মীর যাতায়াত ছিল সেখানে। তারা আসত, দু'চার দিন থেকে চলে যেত।

পাবনায় বাড়ি, কর্মক্ষেত্রে যাদের অন্যত্র এমন কয়েকজন বিপ্লবীকর্মীর সাথে আলাপের সুযোগ ঘটেছিল। এদের মধ্যে একজনের কথা ভাল করে মনে আছে। তার বাড়ি পাবনার হিমাইলপুরে পথার ধারে। অন্তরঙ্গতা জন্মেছিল তার সাথে। তার বাড়ি আমাদের অন্যতম আড্ডা ছিল যখন সে বাড়িতে থাকত। সুন্দর চেহারা, উজ্জ্বল বর্ণ, ছিপিছপি সুঠাম গঠন, মুখে সবসময় হাসি, সাদাসিধে পোশাকে ও কার্তিকের মতো বাবুগোছে মনে হত। কিন্তু আদর্শ শক্তি রাখত দেখে। আর অভূত কর্মবিপ্লবী ছিল এই কার্তিকচন্দ্র প্রথম। প্রথমবার সে ধরা পড়ো রজা কো-পানির (Rhoda & Co.) বিখ্যাত পিস্তল চুরির ব্যাপার সম্পর্কে। জাহাজ থেকে সেখানে আনবার পথে পিস্তল (Mausser Pistol) ভর্তি দুটি প্যাকিং বাগ উঠাও হয়ে যায়। এই পত্র বাংলার বিপ্লবীকর্মীদের মধ্যে বিতরণ হয়। আর একবার ধরা পড়ো তিব্বতে পালাবার পথে। এর নাম ছিল আত রায়। আমরা ডাক্তারম বাবুপুরাদা। এই নামের ইতিহাস জানি না। সত্য ও কল্পনা মিশিয়ে একটা গল্প লিখেছিলাম 'বাবুপুরাদা' নাম দিয়ে। শনিবারের চিঠিতে ছাপা হয়েছিল এ গল্প।

বিপ্লববাদের আদর্শ এবং বিপ্লবীকর্মীদের প্রসঙ্গে বিপ্লবী সাহিত্যের কথা কিছু বলতে হয়। বিপ্লবী সাহিত্য মানে যে সব বই থেকে বিপ্লবীরা প্রেরণা লাভ করতেন এবং যে সব বই তারা পড়তেন বলতেন আমাদের।

প্রথমেই গীতা ও চণ্ডীর উল্লেখ করতে হয়। এই দু'খানা বই তাঁরা মধ্যতরম কর্মযোগের প্রেরণা লাভ করবার জন্য। 'ভবানী মন্দির' আমাদের হাত পর্যন্ত পৌঁছায়নি, 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরীদাস' পড়তাম আমরা। বিবেকানন্দের কয়েকখানা বই, রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী', সাধারাম গণেশ দেউস্করের 'দেশের কথা', 'গুণ্ডার', 'বদমাতেম' ও 'সন্ধ্যা পত্রিকা'। যোগেন্দ্র বিদ্যাত্মকের 'প্যারিকব্দীর জীবনী', রজনী গুপ্তের 'সিপাহী ব্রহ্মোৎসব ইতিহাস'। ম্যাসিনের Duties of Man পাতা তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সব কনলে উডের Annals

of Rajasthan, রমেশদত্তের দু'খানা বই, 'রাজপুত জীবন' ও 'মহাশূত্র জীবন প্রভাত'-এর নাম করতে হয়।

ইউরোপ হতে প্রেরিত নিষিদ্ধ পুস্তিকা 'তলোয়ার', 'বদমাতেম' আমাদের হাতে পৌঁছায়নি, তবে সাভারকর, শ্যামজি কৃষ্ণবর্মা, হরদয়াকর নাম আমরা জানতাম। যেমন জানতাম তিলক, চাটপকর-ভাত্তাচর্য, মানিকতলার বোমার মামলার আসামিদের নাম।

স্কুলজীবন শেষ হয়ে কলেজজীবন আরম্ভ হওয়ার বছরে ইউরোপের প্রথম মহামুগ্ধ বাঘল, বিপ্লববাদীদের দমন করবার জন্য Defence of India Act হল, বঙ্গোপসাগরের কয়েকটা দ্বীপে Concentration camp হল। বাংলার গ্রামে গ্রামে Internec-সের আবির্ভাব হল, টিকটিকির উৎপাতে ও পুলিশের উৎপীড়নে সকলে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। ছেলেদের সামলাবার জন্য জীত অবিভাবকরণ ব্যাকুল হলেন।

এই সময়কার সেনের ভিন্ন আমার দু'খনি উল্লেখ্য 'স্বপ্নদ্বীপ' ও 'অভিযাত্রী'-এ যথাস্থান সঠিকভাবে দেওয়ার চেষ্টা করছি।

স্কুলজীবনের মাঝামাঝি পারিবারিক ব্যবসায় খানিকটা পরিবর্তন ঘটেছিল আমার মাতার অকালমৃত্যুর ফলে। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃত্বীয়কে মজফরপুরে পাঠানো হয়েছিল আমার পিতৃব্য ও সূচিদামের কাছে। কিছুদিন পরে তিনি জেলা স্কুলের শিক্ষক হয়ে রংপুরে চলে গেলেন সপরিবারে আমার মধ্যমভ্রাতাকে নিয়ে। বহর দুই পরে তিনি পাবনা জেলাস্কুলে বকলি হয়ে এলেন। নিজদেশের বাড়িতে স্থানান্তরিত হওয়ায় আমার ছোট পিতৃব্যের শওর পাবনার বিখ্যাত ডাক্তার জগৎচন্দ্র রায়ের বড় ভিল বাড়ি ভাড়া নেওয়া হল। ডা. রায় সে সময় কলিকাতার বিভিন্ন রো-র বাড়ি ভাড়া নিয়ে প্রাকটিক করতে আরম্ভ করেছিলেন। আমার পাবনায় বাসের আট বছরের বেশির ভাগ সময় এই বাড়িতে কেটেছে। পিতা হরিপুরে থাকতেন পাচক ভৃত্য গোমস্তার মাঝে। মাঝে মাঝে শহরে এসে কিছুদিন থাকতেন। আমার মতো ছাত্র আমরা জোতা ভাঙার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল বগুড়া জেলায়। তাঁকে আনবার জন্য এবং পোর্টে দেওয়ার জন্য কয়েকবার বগুড়া যেতে হয়েছিল আমাদের।

পাবনার যে কলেজে দু'বছর পড়েছিলাম বিশেষ কিছু ব্যবহার নাই সে কলেজের সম্বন্ধে। আমি যাবার ভর্তি হলাম কোমরপরের রাহিকা বা, ত্রিদিপাল হয়ে এলেন। কলেজে চাকরিকালে ইনি রায়বাহাদুর হন এবং প্রতিপত্তি লাভ করেন। এই পড়বার স্টাইল ছিল। সাক্ষ্যের অধাপক হেগেন্সের রায় পাবনা শহরের অধিবাসী। সুপ্তিত বলে খ্যাত ছিল এই।

সংস্কৃত নিয়েছিলাম বটে কিন্তু পড়তাম না। সে জন্য এই কোড ছিল এবং আমাদের বাড়িতে অভিযোগ করতেন নমীমাধব ইংরাজি, বাংলা, ইতিহাসে খুব নম্বর করতেন। তবু প্রযোজ্য কর্মনি দ্বিতীয় কাকে বলে জানে না। হেমবাবু, ইতিহাসের অধ্যাপক বনোয়রিবারুর সঙ্গে ভাল পরিচয় হয়েছিল। একবছর পরে ডা. জগৎ রায়ের বড় ছেলে সুব্রহ্মনাথ রায় ইংরাজির অধ্যাপক হয়ে এলেন। স্কুলের সহপাঠীদের দু'একজন কলেজে আমার সাথে পড়ত। নতুন মাত্র দু-জন-দুই সহপাঠীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল।

কলেজজীবনের মাত্র একটা ঘটনার কথা মনে আছে। ঘটনটা যুদ্ধের চাঁদা আদায়ের ব্যাপার নিয়ে। আমি বললাম যুদ্ধ হচ্ছে ইউরোপ, জার্মানি ও ইংরেজদের মধ্যে, আমরা কেন চাঁদা দেব? খ্রিস্টপাল খুব ধর্মকালে ও ভয় দেখালেন। তারপর বাড়িতে রিপোর্ট পাঠালেন। তারপর চাপা পড়ে গেল এ ব্যাপার। আমার অনুমান বাড়ি থেকে নির্ধারিত চাঁদা কলেজে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

স্কুলের জীবন শেষ হওয়ার আগে আমার ধর্মের নামে কেটে গিয়েছিল উপবাস পূজা জপ প্রণামাদি যখন এদের প্রতি আসক্তি নিয়েছিল শেষ হয়েছিল। তরু সন্ন্যাসী সাধুর আকর্ষণও শেষ হয়েছিল। কীভাবে বালকমনে এই ধর্মের দোশা এসেছিল তা বলছি কিন্তু কেনো সত্য অত্যন্ত শীঘ্র চলে গেল, কোনও চিহ্ন পর্যন্ত মনের মধ্যে রেখে গেল না তা বলতে পারব না। আজ শুধু ওমু এইটুকু মনে করতে পারছি যে জগৎপন্থে আকর্ষণ না পাওয়াতে মনে যে জাগরণ খালি হয়েছিল বিপ্লববাদের আদর্শ সে জাগরণ দখল করে গেল। আরও একটা আদর্শ আকর্ষণও দেখা দিল সত্যি হলে সাহিত্যের আদর্শ।

মেরি কেরলির 'Sorrow of Satan' বইখানির কথা বলছি। মেরি কেরলির তখন নাম হয়েছে। কলেজের লাইব্রেরিতে বই বিশেষ না। স্কুলের লাইব্রেরি, পাবনা শহরের অম্মা গোপিক বাপলিগ লাইব্রেরি থেকে ইংরাজি, বাংলা গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণ কাহিনি যা পেওয়া এনে পড়তাম। মনে পড়ছে যেন ছেঁটনের ভ্রমণকাহিনি, রুশের 'Confession' এই সময় পড়েছিলাম। বর্জিতমন্ত্র, রমেশদত্ত, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস, মাইকেল, রসলাল, নবীন সেনের কাব্য, দীনমুগ্ধ মিত্র, স্কীয়ারপ্রদাদ, ডি এল রায়ের নাটকের সঙ্গে সঙ্গে পাঁচকটি-দেয়ে ডিটেকটিভ উপন্যাস। দীনেন্দ্রকুমার রায়ের জাগরণেরও কিছু বই পড়েছি। দামোদর মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসগুলিও তখন চলত। ভ্রমণকাহিনির মধ্যে জলধর সেনের হিমালয় ভ্রমণ, ইন্দুমাধব মল্লিকের টান ভ্রমণের কথা মনে আছে। ইংরাজি ভিক্টোর, ব্যাকার, স্ট, ফিশিংয়ের



বই পড়ছি। এইসব বইয়ের সাথে বিপ্লববাদের আদর্শে অনুরক্ত শিক্ষক-কর্মীদের পরামর্শে যে সব বই পড়তে হত এবং যেগুলোর নাম কয়েকটি সেগুলোও ধরতে হবে।

এখানে কোনো ভাবগম্ভীর মু'জান লেখক ও তাঁদের বইয়ের উল্লেখ করছি। এখনকার পাঠ্যকলাপ এঁদের কথা একেবারে ভুলে ফেলেছে। এঁদের নাম যতীন্দ্রসাহন সিং এবং অনিন্দ্য দাস (১)। যতীন্দ্রাবাবুর ধ্রুংগারা এবং উড়িষ্যার চিত্র ব্রূ পল্লবার হয়েছিল। অনিন্দ্যাবাবুর পলাশবাবু উপন্যাসের সুমিষ্ট গ্রাম ও গ্রামে এতদিনেও ভুলতে পারিনি।

হিউবানী এবং কুমুমতী প্রকাশকগণের প্রকাশিত অনেক গ্রন্থাবলি এবং আরও অনেক ইংরেজি ও বাংলা বই কিনে একটা ছোটখাট লাইব্রেরি গড়ে তুলেছিলাম। শেঞ্জাপিরে, পেঙ্গাপর, মিওনি, বায়েন, ওয়াড্ডেয়ার্থ, শেনি, ক্রিটস, বার্নসের সমগ্র রচনাবলি ১৯৪৮-তে কিনেছিলাম। বাংলা গ্রন্থাবলিগুলোর মধ্যে ভাস্করচন্দ্র, মুক্তদাম, কৃত্তিবাস, কান্দীয়ার দাস, চৌধুরী, কান্দীয়ার দাস, ওয়াড্ডেয়ার্থ ছিল। কালিদাসের সব বই (মূল ও অনুবাদ), কাদম্বরীর অনুবাদও ছিল, সংগ্রহ করেছিলাম। আমার মাতার নামানুসারে লাইব্রেরির নাম দিয়েছিলাম কুমুম লাইব্রেরি। সাধারণত গ্রন্থাগারে লাইব্রেরিগুলোর যে অবস্থা ঘটে কুমুম লাইব্রেরির ভাগ্যেও তা ঘটেছিল। ইংরেজ কবিরের ক'জনার গ্রন্থাবলি ছাড়া সব বই হারিয়ে গেছে। হারানো বইগুলোর মধ্যে দীনেশ সেনের বঙ্গমহিষাতের ইতিহাসও ছিল।

আমি পানবায় থাকবার সময় একবার পোলিটিকাল কম্যুনিস্টদের অধিবেশন হয়েছিল পানবায় মনে পড়ছে। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ, আততাব্য চৌধুরী, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, বোমকমল চক্রবর্তী প্রভৃতি নেতারা এসেছিলেন। তারা শিতলাই-এর জমিদার ঘোষনে মন্ত্রেরে বাড়িতে ছিলেন। কী উপলক্ষে জানি না বোমকমল চক্রবর্তীমশায়কে নিমন্ত্রণ করে যাওয়াটা হয়েছিল আমাদের বাড়িতে। তাঁর চমৎকার চেহারাও মনে আছে। আর একবার কী সভা উপলক্ষে পানবায় এসে আততাব্য চৌধুরী মশায় আমাদের বাড়িতে দু'দিন ছিলেন। ছোট তাঁবু খাটিয়ে সানাগার তৈরি করা হয়েছিল তাঁর জন্য।

পানবা-জীবনের দুটো ঘটনার কথা বলা হয়নি। এ দুটো ঘটনার সম্পর্ক আছে সে সময়কার (১৯১৪-১৬) দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির সাথে।

১৯১৪-তে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার গোড়ায় বিপ্লবী প্রচেষ্টার বিঘ্নে অশায়া আরম্ভ হয় দেশে। বিপ্লবী প্রচেষ্টার পরিধি অনেক ছোট হয়েছিল ইতিমধ্যে। বিপ্লবী আন্দোলন বন্ধ করবার জন্য গভর্নমেন্টের উগ্র দমননীতি উগ্রত হত। কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প,

সমবেহমাত্র অন্তরীণ, অনির্দিষ্ট কালের জন্য কারাবন্দ প্রভৃতির কথা, দেশময় টিকাকিরি উপব্রবের কথা বলেছি। এই উপব্রব ছেলেনদের অভিভাবকদের অভিভাব্যায় সম্ভবত করেছিল একথাও বলেছি। কাদের সাথে আমি মেলামনা করি সে সব আমার অভিভাবকগণ কিছু কিছু রাখতেন। সমবেহভাজন ছেলেনদের বাড়ি তখন প্রায়ই ইচ্ছা হত। ছেলেনের কুটির আখড়া, দ্রাব সমিতি, আশ্রম আখড়ার ওপর গোপনে দুটি রাত্রত পুলিশ। যত-ওড়া ছেলেনের প্রায়ই আটক করা হত। আমার পুত্রক-সংগ্রহে অভিভাবকদের চোখে এবং পুলিশের চোখে আশঙ্কিত কিছু হইত ছিল। একবার ছুটিতে হরিপুরে গিয়েছিলাম। ছুটি অর্থে ফিরে এসে দেখলাম আমার অর্ধেক বই, বই চেষ্টায় সংগৃহীত যুগান্তর ইত্যাদির পুরনো কপি এবং কতকগুলি ছবি বিবেকানন্দ, তিলক লাজপত রায় কুন্দিরাম প্রভৃতি কামকমল বিপ্লবীর ছবি ছিল তার মধ্যে, অতুর্জন করেছি। ছোট ভাইবোনরা গোপনে জানাল ওগুলো পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। বিবেকানন্দের বই ও ছবিও যে রাজসংরক্ষের বলে বিবেচিত হতে পারে তা কল্পনায় আসেনি। গীতা ও অশ্বিনী দত্তের ভক্তিযোগও ছিল ভস্মীভূত বইগুলোর মধ্যে।

সে সময়কার রাজনৈতিক আবহাওয়া ফেল্ম ছিল এখনকার মাম্বা তা কল্পনাত আনতে পারবো না। বড় বড় কয়েকটা যুগ্মব্রবের মোকদ্দমা চলছিল এই সময়। ঢাকা বড় বড়ব্রবের মোকদ্দমায় পুলিশ ঢাকায় অনুশীলন সমিতির পঞ্চাশজন আনামিগে চালান গিয়েছিল। সরকার পক্ষের কৌশলি তাঁর উদ্যোগী বক্তৃতায় শক্তিপূজা ও শক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যে বিপ্লবনরসী কীভাবে বাংলায় বিপ্লবেরের সৃষ্টি করেছে হাতা করলেন। বহিষ্কৃতদের 'দেবী চৌধুরানী', 'আনন্দমঠ' ও 'সীতারতা' উপন্যাসসালি বিদ্রোহ করে ওগুলির প্রিপাল্য বিব্রেরে যে নতুন ব্রহ্মবিক বাখ্যা আদালতকে শোনানো দেশের লোক চমকৃত হলে কাগজে তা পড়ে। বিবেকানন্দ বেঁচে থাকতে Militant Sannyasi বলে তাঁর খ্যাতি বা খ্যাতিপ্টি প্রকটিত। যুদ্ধার পরে তাঁর প্রভাব দেশে অনেক বেড়ে গিয়েছিল। বেলেড মঠের সফারীসীদের অনেকের ওপর পুলিশের দুটি ছিল পুলিশের confidential report থেকে তা জানা যায়। পরবর্তীকালে এই রিপোর্ট সেবারাখ সুযোগ হয়েছিল।

দ্বিতীয় ঘটনার কথা বলছি। সম্ভবত ১৯১৬-র ঘটনা।

পরীক্ষা দেওয়া হয়েছে। খবর বেরোতে দেরি আছে। কয়েক বন্ধু মিলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়বার পরামর্শ হল। প্রথম গরবান্দন হল আমাদের এক কুম্ভারবাসী কলেজের সহপাঠী বন্ধুর বাড়ি। গ্রামের নার মনে নেই। মেহের কালিবাড়ি স্টেশনে মনে যেতে হয়। বন্ধুরা নাগ রায় উপাধিধারী, গ্রামের জমিদার।

যাকি দু'জন বন্ধুর মধ্যে একজন পানবার লোক। দ্বিতীয়জনের বাড়ি মনে হচ্ছে ছোট্রামের কোনও একগ্রামে।

খোলাখুলি বেড়াতে যাওয়ার অনুমতি চাইলে অনুমতি মিলে না জানাতাম। তাই গোপনে পিতৃব্যের ড্রয়ারে সুলে পাখেই সংগ্রহ করে একে বড়পিত্তের সন্ধ্যায় পানবার সিটার স্টেশন বাড়িপুর ঘাটে সিটারে চাপা দেল তিন বন্ধুতে। কুটিয়া থেকে গোয়ালন্দ, সিটারে গোয়ালন্দ থেকে চাঁদপুর, চাঁদপুর থেকে আসাম-বেঙ্গল রেঞ্জের গাড়িতে কালিবাড়ি স্টেশন। তিনটি সন্দেহভাজন রাসের হেঁসারা দেখে লাকসাম জংশনে পুলিশ নানারকমের প্রশ্ন করল। মেহের কালিবাড়ি স্টেশনে নামতে আবার পুলিশের সম্মুখীন হতে হল। তিনদিন বন্ধুর গৃহে জামাইআদরে কাটিয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে আবার সিটারে ট্রেনে চাপলাম। পথে নেমে বাববকুত, সীতাকুত, চন্দ্রনাথ-নিরুপাক পাহাড়, সহরধারা প্রভৃতি দেখতে দিনিয়ে গেল। সীতাকুতে পাওয়ার বাড়িতে বিশ্রাম করবার সময় পুলিশেরে অবিরতি হাও এবং প্রকোত্তর চলল। তারপর চট্টগ্রাম।

দু'দিন চট্টগ্রাম শহর দেখতে গেল। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে, ভৌগোলিক বালোর সমলভূমিতে ওকম শহর দ্বিতীয়টাই নাই। শহরের বুরের ওপর ছোট ছোট টিলা, টিলা ওপরে বাংলা ঘাড়ি, টিলায় গায়ে বুরের বাগান। শহরের এককি সুপ্রশস্ত কর্ণপুলি নদী, নদীর তীর ধরে প্রশস্ত পথ স্ট্রায়া। গলি, মিথি নোংরা অঞ্চলও আছে শহরে, সব শহরে থাকে, কিন্তু সৌন্দর্য যা আছে তা সীতাকুতে। চট্টগ্রাম থেকে সিটারে যাত্রা করা হল আদিনা দ্বীপে।

বঙ্গোপসাগরের মধ্যে চট্টগ্রাম গা ঘেঁষে দ্বীপালা, আদিনাথ, কুতুবুদ্দিন তারপর খানিকটা বাখানে কলকবাজার। হিমালয়ের যে পূর্বদ্বীপী শাখা লুসাই ও চাকমাদের দেশ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে পিকিশমুখে নেমেছে তারই একটা শিরা সাগরের মধ্যে ডুকরাটার দিগে আদিনা দ্বীপে পৌঁছে মাথা তুলেছে। পাহাড় বা টিলায় চূড়ায় আদিনাথ শিবের মন্দির। তাঁর নাম হতে দ্বীপের নাম হয়েছে আদিনাথ। ছোট মন্দির, যাত্রীদের জন্য একানা বড়ের ঘর। পাওয়ার জন্য বানাই ঘর টিলায় মাঝায়। মন্দিরের সম্মুখে খোলা চত্বরে দাঁড়িয়ে বাড়ির নীল জলের পেতে পাহাড়ের পাদমূলে আঘাত করছে দেখা যায়।

চট্টগ্রাম থেকে যে সিটারে আদিনাথ পৌঁছানো দেখলাম সে সিটারারি একটু নটন রকমের, অর্থাৎ দুই পাশে পুর সোহার পুর দিয়ে খানিকটা পর্যন্ত আটকানো। তনলা সমুদ্রের হাউ আটকানবার জন্য এই ব্যবস্থা। ঘন্টা দেড়েক মাত্র সময় সিটারে বঙ্গোপসাগরের মধ্য দিয়ে গেলছি। বাকি পথ বাড়ির মা দিগে। এই দেড় ঘন্টা সময় দু'দু'দু'র pitching-এর জন্য মাথা খোরা

ও বমির ভাব ছিল। দ্বীপের কাছে এসে সিটার থেকে নেমে সিটারে ডুডতে হল। সাম্পানে ছিল বটকিমাংস বহু, পুর্ন্থে নাপিত্তি উলটে যাওয়ার জোগাড়া। সাম্পান থেকে ভাঙায় নামতে দেখলাম পুলিশ এক বেস্টনী রচনা করেছে আমাদের চার বন্ধুকে ঘিরে। বলল থানায় যেতে হবে। চললাম সর্বকলে থানায়। থানায় যাওয়ার পথের পাশে দেখলাম এক বসেছে, মেলা মগ স্ত্রী-পুত্রকু জড্ডো হয়েছে। পুলিশ বেঁটিত হয়ে আমাদের যেতে দেখে রই গেল স্বদেশিবাধু। আদিনাথ যে একটা বড় Concentration camp আমরা জানাতাম না। মগদের ভিড়ের মধ্যে দু'চার জন বাঙালি যুবককে দেখা গেল। তাদের এসে কৌতুহলী দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন তাঁরা। একজনের সাথে চোখাচোখি হতে তিনি দু'হাত তুলে আড়াআড়ি রাখলেন। যুগ্মতে দেরি হল না। তিনি বিশপালার অন্যতম অধিবাসী। মগ আমাদের চোখে কৌতুহলের সঙ্গে কেশা ও সহানুভূতি লব করলাম। বোঝা গেছে স্বদেশিবাধুদের প্রতি এদের মানডাবা ভাচ্ছি।

থানার অফিসার সম্ভবত নোয়াখালির হিন্দু, বয়স কম। ঘন্টা থানকে আমাদের রেয়া করলেন নাভিভাবে। আমরা আদিনাথ দর্শনের জন্য এসেছি, আর কেনও আড়চোখ নাই তখন কত অল্প বয়সে ধর্মবাত জেগেছে বলে বিদ্রূপ করলেন। বেশ খানিকটা তর্কতর্কি হল আমার সঙ্গে। ছাড়া পেয়ে আমাদের সাহায্যে উঠে যাঁহাদের জন্য নিরীষ্ট ঘর দখল করে পাওয়ার পাহাড়ে রায়ার ব্যবস্থা হল। মান কয়েক সেবদর্শন সেয়ে যেতে যেতে সন্ধ্যা হয়ে এল। কোনও হলেরে রাষ্ট্রী কেটে গেছে। সকালে উঠে হাত মূগে ঘোবার আগেই থানা থেকে তলব এল। সকালে থিুর কলসাম হুনভাণের সুযোগ, আজই কেটে পড়তে হবে। থানায় গিয়ে অফিসারের মুখে শোনে গেল আমরা তাঁকে বন্ধু মিত্তি দিয়েছি। আমাদের কোনও বিশপ-আপ না হই খেবার জন্য দারাতত পুলিশের পাহারা ছিল পাহাড়ের ওপরে, তিনি যয়ং একবার হুগে সেয়ে গিয়েছিলেন সব ঠিক আছে কিনা। তখন এক বন্ধু ছেলে বললেন আর ক'বে সে না আনাকো, আজ চল মাচ্ছি আমরা। ডব্রলোক বুঝ বুধি হলেন আমাদের কথা শুনে মনে হল। সকালে ডেকে পাঠিয়েছেন এ জন্য ক্ষমাার্থনা করে চা-বিস্ট খাওয়ালেন। কী করবেন পেটের দায়ে এই চাকরি করতে হয়। এই রকমের দু'চারটে কথাও শোনালেন।

যে যুগের কথা বলছি, সে যুগের দেশের আবহাওয়ার কথা মনে করছি এবং সে যুগের পুলিশ কর্মচারীদের কীটিকাল্পের কথা মনে করলে এই ডব্রলোকের ব্যবহার একটুও ব্যাপক বলা যায় না।

তিনি চট্টগ্রামের পুলিশের কাছে শবর পাঠিয়েছিলেন কিনা জানি না, তবে দেখলাম চট্টগ্রামে ফেরবার পর থেকে যেখানে



গিয়েছি টিকটিকি আমাদের অনুসরণ করেছে। চট্টগ্রাম কলেজ কম্পাউন্ডের মধ্যে একটা বড় টাণ্ডা ফুলের গাছ ছিল। সেই গাছে উঠে যখন টাণ্ডা ফুল পাড়ছি তখনও দেবি কিছুদূরে বাস্তায় বাহন ধরে দাঁড়িয়ে আমাদের কার্যকলাপ দেখছিল টিকটিকি। বাবারের দোকানে বেতে গিয়ে সেখি সে টিকি হাজির হয়েছে। যে বাড়িতে আমরা উঠেছিলাম আমাদের অনুপস্থিতিতে সে বাড়িতে বারবার গিয়ে পুলিশ আমাদের সন্ধ্যা প্রশ্ন করেছে। ব্যাপার দেখে বাড়ির কর্তা ভয় পেয়ে গেলেন। আমরা তাঁর এক দূর-সম্পর্কীয় ছোকরা আত্মীয়ের বন্ধুভ্রাতা, আমাদের সন্ধ্যা কিছুই জানেন না, ভয় পাত্তা স্বাভাবিক। অতএব তাঁর আশ্রয় এবং চট্টগ্রাম ছাড়া হল।

আমার চতুর্থ উপন্যাস 'অভিযাত্রী'তে ডেটিনু-বুগের Concentration campগুলির কথা বিস্তারিতভাবে বলেছি।

### কলিকাতা

কলকাতায় পড়তে এসেছিলাম ১৯১৬ সনে। ১৯২০ সনের বোধহয় আগস্ট মাসে এম.এ. পরীক্ষা দিয়ে হরিপুরে চলে গেছি।

### গ্রাহকদের প্রতি আবেদন

বার্ষিক গ্রাহক টাঙ্গা এখনও যারা নেননি, যথাস্থীয় সম্ভব তাঁদের তা নিমিত্ত দেওয়ার অনুরোধ জানানো হচ্ছে। ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেককে এ বিষয়ে চিঠি দেওয়া সম্ভব নয়, তাই গ্রাহকদের কাছে স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতার আবেদন। প্রতি সংখ্যার মূল্য ২০ টাকা হিসাবে কমপক্ষে তিনটি এবং অধিক পক্ষে ছয়টি সংখ্যার মূল্য জমা দিয়ে নতুন গ্রাহক হওয়া যায়।

বিশেষবাসী গ্রাহকদের টাঙ্গা বার্ষিক US \$ 12 "CHATURANGA" নামে স্থানীয় গ্রাহকরা চেক/ব্যাঙ্ক ড্রাফট পাঠাতে পারেন। বৎসরের যে কোনও সময় গ্রাহক হওয়া যায়। কলকাতার বাইরের গ্রাহকরা ব্যাঙ্কের কালেকশন চার্জের মূল্যায়ণ করে গ্রাহকট্যাঙ্গা পাঠাবেন।

তারপর ১৯২২-এর শেষের দিকে আমরা কলকাতা চলে আসি এবং সেই থেকে কলকাতাবাসী। হরিপুরে বাস করবার সময়ের বার দুই কাজ উপলক্ষে কলকাতায় আসতে হয়েছিল।

সেরি হয়ে যাওয়ার জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজে ও স্কটিশ জায়াগা না পেয়ে রিপন কলেজে ভর্তি হলো বি.এ. পড়বার জন্য। তখন রিপন কলেজের বেশ নাম ডাক ছিল। অধ্যক্ষ ছিলেন খ্যাতনামা পণ্ডিত ও লেখক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। উজ্জ্বল বর্ণ, সুন্দর, সৌমা মহাদেবের মতো চেহারা। ইংরাজির অধ্যাপকদের মধ্যে ছিলেন সেকালের জনপ্রিয় জানকীনাথ ভট্টাচার্য। ইতিহাসের অধ্যাপকদের মধ্যে ছিলেন লেখক বিনোববিহারী গুপ্ত। অঙ্গের অধ্যাপকপণের মধ্যে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল ছাত্র বেসব্রহ্মা ঘোষ। ইংরাজির অন্যতম যুবক অধ্যাপক ছিলেন বরিশালের অশ্বিনী দত্ত মহাপাত্রের ভাইপো সুকুমার দত্ত। আনন্দমোহন সিংহ ইংরাজির অধ্যাপক ছিলেন।

(ক্রমশঃ)

### ধারাবাহিক স্মৃতিচারণ

## ভাঙা পথের রাঙা ধূলায়

### সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

শৈলেনবাবু একটানা প্রায় ১৩/১৪ বছর ঢাকায় ছিলেন। আমি এই ঘটনাটির উল্লেখ করলাম এক কারণে যে আক্রাম খাঁসাহেব রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে ভয়ানক হিন্দুবিরোধী ছিলেন। তাঁর ওই ভূমিকার জন্য তিনি অবিস্তৃত বাংলার রাজনীতিতে 'আক্রাম খাঁ' বলে চিহ্নিত ছিলেন। কিন্তু ব্যক্তি-জীবনে ও সংবাদপত্রের পরিচালক হিসাবে তিনি এক স্বতন্ত্র সত্তার পরিচয় দিয়েছেন। আমার প্রায়ই মনে হয়েছে, এটা কী করে সম্ভব হলে? তবে কি যেহেতু তিনি মাত্র দুই পুরুষ আগে হিন্দু গ্রাম্য ছিলেন তাই এটা কি তাঁর সূত্র হিন্দুদের বিরুদ্ধে কিংবা তৎকালীন দ্বিজাতিতত্ত্বের নীতিতে বিশ্বাসী শিক্ষিত মুসলিম বাঙালি সমাজে যে উদারতাবোধ ছিল ওটা তারই স্বরূপ?

'জনসেবক' পত্রিকায় আমার সহকর্মীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সাহিত্যিক জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে পরবর্তী পঁচিশ বছরের বাংলা সাহিত্যের তিনি ছিলেন এক অন্যতম প্রকৃতিশালী লেখক। মানুষ হিসাবে তাঁকে আমার খুব ভাল লাগত। সেই সময় বাংলায় কবি সাহিত্যিক লেখক সাংবাদিকরা কমিউনিস্ট হওয়ার জন্য উন্মাদ। জ্যোতিরিন্দ্রা ছিলেন এর এক প্রচণ্ড ব্যতিক্রম। তাঁর বিশ্বাস ছিল জীবন কোনও রাজনৈতিক তত্ত্ব নয়। ওই সময়টা তিনি বাণমাটির বস্তিতে থাকতেন। ১৯৫৫ থেকে '৫৭ এই সময়ের মধ্যে তাঁর সাদা জাগানো উপন্যাস 'বারোঘর'ক'উঠান' প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত হয়েছে 'মীরার দুপুর'। গল্পের নায়িকাদের নামকরণ ও বিষয়বস্তু নিয়ে তিনি প্রায়ই আমার সঙ্গে কথা বলতেন। 'দেশ' পত্রিকার তিনি নিয়মিত লেখক। তাঁকে দাবি দিয়ে সে আমলে 'দেশ' ও 'আনন্দবাজার'-এর পূজাসংখ্যা হয়ে পারত না। বিমল কর ও দিব্যানু পালিত প্রায়শই জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সঙ্গে দেখা করতে 'জনসেবক' অফিসে আসতেন। তাঁরা তখন বাংলা কথাসাহিত্যে পদার্পণ করেছেন। তাঁর প্রভু অনুমায়ী পরিবেশ ও চরিত্র বাছতে জ্যোতিরিন্দ্রদের সঙ্গে কয়েকবার সন্ধ্যার পর কলকাতার রাস্তায় অভিযানে বেরিয়েছি সব অভিযানের কথা বলা যাবে না। একটি অভিযানের কথা বলছি। '৫৬ কিংবা '৫৭ সাল হবে, 'আনন্দবাজার' কর্তৃপক্ষ

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীকে অনুরোধ করেছে শারদীয় সংখ্যার জন্য এক ভিন্ন স্বাদেরও জীবনবোধের গল্প লিখতে। জ্যোতিরিন্দ্রাকে কিছু ঢাকাও তাঁরা অগ্রিম দিয়েছেন। ওই সময় তাঁর শরীটটাও ভাল ছিল না। তিনি দু-তিন বছর অন্তর প্রায় যন্ত্রাঙ্গে ভুগতেন। এই অবস্থায় আমাকে তিনি বললেন, 'কী করা যায় বল তো?' আমি জানতে চাইলাম প্রট ডেবেছেন কি না। জ্যোতিরিন্দ্রা বললেন, 'আমি এরকম ভাবছি: মাড়ুরের কামনায় উশুখ নারী, কিন্তু তাঁর সুন্দরী স্বামীর দাম্পত্যজীবনে অক্ষমতা। সেই নারী সংসার থেকে নিরুদ্দেশ হল। কিন্তু তাঁর স্নেহময় খবরও তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন সারা শহর ছুড়ে। অবশেষে এক পতিতালয়ে তিনি তার বউমাকে দেখতে পেলেন। কি, তোমার পছন্দ হল না বুঝি?' আমি বললাম, 'প্রটো নতুনও আছে বৈকি! কিন্তু আপনার সাংখ্য্য নির্ভর করবে আপন নায়িকাকে কোন পরিণতিতে নিয়ে যাবেন।' জ্যোতিরিন্দ্রা চাইছেন, ট্র্যাডিশন আছে এমন কোনও পতিতালয়ে তাঁর সঙ্গে আমাকে যেতে হবে। সেখানে তিনি অন্তত তিন-চারটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ করবেন। আমি লালবাড়ীর 'ব্রথল সেকশন'-এর বড়বাবুর শরণাপন্ন হলাম। পরিপোটার হিসাবেই তিনি আমাকে চিনতেন। তাঁরা অনেকাই জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর লেখা পড়েছেন। তিনি আমাকে বসিয়ে রেখে বড়তলা খানায় কোন কোন একজন লোকের নাম করে তাঁকে একাই লালবাড়ীর তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিতেন বললেন। আদ্যক্ষটার মধ্যে একটি লোক এসে বড়বাবুকে সেলাম করে দাঁড়াল। বড়বাবু সেই লোকটিকে আমাকে দেখিয়ে বললেন, এই রিপোর্টারবাবুর চটপট কথা বলতে পারে এমন তিন-চারটে মেয়ের দরকার। দেখতে গুনতে ভাল হওয়া চাই। ওদের ঘরে বসে কথা বলবেন, বাইরে যেতে হবে না। ঠিকঠাক ব্যবস্থা করে দিতে হবে। ওই পুলিশের 'ওয়চার' লোকটির সঙ্গে দিন ঠিক করে জ্যোতিরিন্দ্রা ও আমি ওই লোকটির সঙ্গে দেখা করলাম। তাঁর পর আমাকে লোকটি আমাদের একটা পুরনো বড় বাড়িতে নিয়ে গিয়ে এক বয়স্ক মহিলার নাম ধরে ডাকল। সেই মহিলা খুব সজ্ঞতাভাব ও সজ্ঞতা নিয়ে আমাদের জানালেন, তিনি চারজনকে ঠিক করে রেখেছেন। কিন্তু ওরা



একসঙ্গে বসে কথা বলতে রাজি নয়। ওদের যার যার ঘরে আমাদের যেতে হবে। জ্যোতিব্রজ্রা তাতেই রাজি। একজন রিপোর্টার এক গণিত্যর কাছ থেকে খবর বের করার জন্য যে ধরনের প্রস্তাব করে, জ্যোতিব্রজ্রা কিন্তু সেভাবে ওদের সম্মুখীন করেন না। তিনি সমাজ, জীবন, যৌবন—এসব নিয়ে ভাল ভাল কথা মধ্য দিয়ে একটি চিরন্তন নারীকে বুজু পাওয়ার চেষ্টা করলেন। সব ক্যাট মেয়েই সুখী এবং তাদের বয়স পঁচিশ বছরের মধ্যে। সবলেই নিজস্ব কয়েকটি রিফিউজি কলোনি থেকে তিন-চার বছর হল এখানে এসেছে। আমাদের প্রাপ্ত এক ষষ্ঠী সময় লাগল। ফেব্রার সময় জ্যোতিব্রজ্রা ওদের এক ঘণ্টার মধ্যে দশ টাকা করে দিলেন। কারণ আমাদের জন্য ওদের জীবিকার সময় নষ্ট হয়েছে। ওয়াটারটর হাতেও একটি দশটাকার নোট গুঁজে দিলেন তিনি। আমরা বিস্ময় করে ফিরছি। দু'দশের নিচে। বিস্ময় ভিন্ন স্ট্রিট পড়তেই তিনি আমাদের বললেন, 'তুমি যেন উন্মনা হয়ে গিয়েছ?' আমি জবাব দিলাম, 'ভালবিলম্ব যিবে দেশোভাগ না হত, তা হলে এই মেয়েও তোমরা, মেমনা, মলমলী, আড়িয়াল খাঁ, কীটনাশা, মধুমতী, ঠৈরব, রূপসা বা অন্য কোনও নদীর পাড়ের কোনও গৃহপ্রাসঙ্গ এই সময় তুলসীজালায় সম্মানীয় ছেলে পরিবারের কল্যাণ কামনা করত।' জ্যোতিব্রজ্রা আমার একটা হাত তাঁর শরৎ হাতের মুঠোয় ধরে রাখলেন। গল্পটার নাম আজ ভুলে গিয়েছি। কিন্তু উন্মনায়েসমতাই হউ ওই গল্পটা সে সময় যুবসাব্দা জগিয়েছিল। সম্ভবত এই সময় কিংবা এর কিছু আগে একটি ঘটনায় 'দেশ' প্রকাশ্যে জ্যোতিব্রজ্রা নদীর গর্জ ছাপা বন্ধ করে দেওয়া হয়। ঘটনাক্রমে ঘটনাক্রমে তাঁর একটি বিখ্যাত গল্প 'ট্যান্ডিওয়ালা' প্রকাশের পর। একটি অত্যাচারিতা সুন্দরী গৃহবধূর দুরন্ত যৌবন নিয়ে। যুবতী গৃহবধূ ট্যান্ডিওয়ালাকে তাঁর অত্যাচারের কথা বলতে বলতে যাচ্ছিল। ট্যান্ডিওয়ালাও নিবিত্ত মনে তার দুঃখের কথা শুনিছিল। প্রায় মাঝরাতে ট্যান্ডিওয়ে ওঠা। তাঁর স্বামী তার জন্মের উপরিভাগে এমন আঘাত করেছিল যে তখনও তার রক্তস্রাব হ'লি। উত্তেজিত হয়ে মেয়েটি শাড়ির অনেকটা তুলে জন্মের কটচিহ্ন ট্যান্ডিওয়ালাকে দেখাচ্ছিল। ওই সময় লেখক ট্যান্ডি ভূইভারসিচিহ্নের বিক্রিয়া ও মেয়েটির অনুভূতিতে প্রচ্ছন্ন যৌবন-আবেগ এসে দিয়েছিলেন। গল্পটির অলঙ্কার হয়েছিল সাংঘাতিক জীবন্ত। অলঙ্কার করেছিলেন তাঁর হেট বাই শব্দর নন্দী। তিনি উচিত উদ্দেশ্যের প্রচ্ছন্নশিল্পী ছিলেন। গাট 'দেশ' প্রতিক্রিয়া প্রকাশের পর অনান্দবাজার প্রতিক্রিয়াগোষ্ঠীর সেই সময়কার কবী নির্দেয়ী শরৎকর (শেখারকরার সরকারের মাড়ুদেবী) নির্দেশ দিলেন যে জ্যোতিব্রজ্রা নদীর লেখা যেন 'দেশ' প্রতিক্রিয়া ছাপা না হয়। কারণ তাঁর লেখায় 'যৌবনানুভূতি' ছড়িয়ে থাকে। এরপর

থেকে তিনি আমৃত্যু 'দেশ' প্রতিক্রিয়া লেখা করেন। কয়েক বছর পর 'দেশ' কর্তৃপক্ষ জ্যোতিব্রজ্রাব্যবস্থার কাছে কমা চেয়েছিলেন ও তাঁকে 'দেশ' প্রতিক্রিয়া লেখার জন্য পুরস্কার আনুগত্য করেছিলেন। কিন্তু আশ্রয়ার্থীর স্বার্থে তিনি ওই অনুরোধ অগ্রাহ্য করেছিলেন। তবে 'আনন্দবাজার' পূজাসভা ও রবিবাসরীয়েতে তিনি লিখতেন। (জ্যোতিব্রজ্রা নন্দী অনেকদিন পরগণে চলে গিয়েছেন। বাংলা কথাসাহিত্যে তাঁর স্থান নিরাপত্তা করবেন বোঝা সাংলােককার। খাতিমাদি স্মৃতিভক্তি হলে ও তাঁকে কখনও অহম্মারী বা দান্তিক হতে দেখিনি। তিনি প্রায় সারা জীবনই কঠোর দারিদ্রের মধ্যে কাটিয়েছেন। দারিদ্রকে তিনি ধর্ম্যও করতেন না, ভালও বাসতেন না। দারিদ্র ছিল তাঁর কাছে অকুণ্ঠিত ও শীতের দিনের কুশ্যারণ মতো।

ডা. বিশ্বনাচন্দ্র রায় তাঁর সুখানুভূতকালে সাধারণত খবরের কাগজের রিপোর্টারদের কাছ থেকে নিজেদের রসে রাখতেন। তাঁর যদি কোনও সংবাদ 'অসত্য' কিংবা 'অসংগত' মনে হত, তা হলে তিনি কখনওই রিপোর্টারদের কিছুই বলতেন না। তিনি সম্মিলিত খবরের কাগজের মালিককে ফোন করে বলে দিতেন। মালিকেরাও এই সুযোগ গ্রহণ করে ডা. রায়ের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন ও সেই সঙ্গে কোনও বিতর্ক জন একটা তদ্বির বা কিছু একটা সুবিধা আদায় করে নিতেন। তখন ডা. রায় ওই 'ভুল সংবাদের' বিষয়টি একবারেই ভুলে যেতেন। রিপোর্টার হিসাবে বিশ্বনাচন্দ্র জন্মসভা ও রাষ্ট্রসংগ বিশিষ্টে ডা. রায়ের বক্তৃতা ও কথাবার্তা অসংখ্যবার রিপোর্ট করেছি। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কাছে যাত্র একবার গিয়েছিলাম। ঘটনাক্রমে ঘটনাক্রমে ১৯৬৩ সালের সম্ভবত আগস্ট মাসে। ওই সময়ই কোরিয়ার যুদ্ধ বন্ধের জন্য রাষ্ট্রসংঘে ভারতের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছিল। যুদ্ধবিরতির তদারকি, উত্তর (কমিউনিস্ট) কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে যুদ্ধবিরি বিনিময় ও ৩৮° অক্ষরেখাকে (38° Parallel) নিরপেক্ষ বলায় হিসাবে সুনিশ্চিত করার দায়িত্ব রাষ্ট্রসংঘে ভারতের ওপর ন্যস্ত করেছিল। ভারত কোরিয়া যুদ্ধবিরতি কমিশনের (Armistice Commission) চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। ভারত সরকার এই কাজের জন্য ভারতের প্রদাপ্রতিম সামরিক বিশেষজ্ঞ লেঃ জেনারেল কে এম থিমায়াকে নিযুক্ত করলেন ওই কমিশনের চেয়ারম্যান হিসাবে। ওই সময় আমরা সম্পাদক ও প্রকাশক কয়েক সভাপতি অতুল্য ঘোষ দ্বিমিত্তে ছিলেন। জওহরলাল নেহরু তখন কংগ্রেস সভাপতিও বটে। তিনি অতুল্য ঘোষকে সাংগঠনিক কোনও ব্যাপারে কথা বলার জন্য ডেকে পাঠিয়েছিলেন তাঁর বাড়িতে। অতুল্যবাবুর সামনেই নেহরু কয়েকজন উচ্চপদস্থ অফিসারের সঙ্গে কথা বলা শেষ করলেন। তারপর অতুল্যবাবুর সঙ্গে কাছের কাছ শেষ করে খানিকটা

হালকাভাবেই শুরু করলেন, 'তোমার জাতি কোনও রিপোর্টার কোরিয়া যেতে রাজি থাকলে আমাকে জানিও...'। দ্বিমিত্ত থেকে ফিরে অতুল্যবাবু একদিন রাস্তার দিকে 'জনসেবক' প্রতিক্রিয়া অফিসে এলেন। আমি তখন কোরিয়া যুদ্ধবিরতি সংক্রান্ত 'রয়টার' সংস্থাদের পাঠোনা খবরের বার্তা লিখতে করতে বাধ্য। তিনি আমাকে লক্ষ করে বললেন, 'কি যে কোরিয়া যাবে নাকি?' আমি জবাব দিলাম, 'যদি পাঠোতে পারেন তাহলে অংশই যেতে রাজি।' তিনি সহাস্যে বললেন, 'আমার কথায় হবে না। তবে ডা. রায় বললেই হবে।' এর দু'একদিন পরে, আমি অতুল্যবাবুর জোর দিয়ে বললাম, 'তাহলে কোরিয়া যাওয়ার ঝী হল?' অতুল্যবাবু আমার কথা শুনে বললেন, 'তুমি বুঝি সিরিয়ায় দেখছি।' তিনি আমাকে বলিয়ে রেখে মুখামুখি ডা. বিশ্বনাচন্দ্র রায়কে একটি চিঠি লিখলেন। তারপর ডা. রায়ের বাড়িতে যোগেন তাঁর পি-এস এসে কয়েকক বেল দিলেন যে তাঁর চিঠি নিয়ে আমি ডা. রায়ের সঙ্গে দেখা করব। অতুল্যবাবু চিঠি নিয়ে আমি পরের দিন সকাল সাড়ে সাতটায় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ডা. রায়ের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম। যাত্রা হলে অতুল্যবাবুর চিঠিটি দিলাম, তিনি হলে সরোজ চক্রবর্তী ডা. রায়ের বিশ্বাস পি-এ ও স্টোনাগ্রাফার। পরবর্তীকালে সরোজবাবুর সঙ্গে আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। সরোজবাবু ওই চিঠিটি পড়ে আমাকে বললেন, 'রোগী দেখা শেষ হয়ে গেলে তারপর বসে থাকতে হবে অনেকক্ষণ।' বেগ সাড়ে আটটা নাগাদ ডা. রায়ের রোগী দেখা শেষ। আমি দেখা আছি, এর মধ্যে ডা. রায় রোগী দেখার শেষ থেকে অন্য এক দরজা দিয়ে বেরিয়ে লিফট করে সেতলায় উঠে গেলেন। সরোজবাবু আমায় বললেন, 'খবার নৈকে এসেই তোমাকে ডাকলেন।' দ্বিমিত্ত লেখক পর ডা. রায় পোশাক পাশে নীচে এসে ঘরে ঢুকলেন। ঘরে ঢুকেই হাঁক দিলেন, 'ওই যে অতুল্যের ছেলেকাটো পাঠিয়ে যাও।' সরোজবাবু আমাকে হুঁকিত করতেই আমি সুইংডোর খোলে ঢুক দেখলাম ডা. রায় দ্বিমিত্তে একটা কালোডোর পরেছেন। পায়ের শব্দে তিনি ঘুরে দাঁড়াতেই আমি পায়ে হাত দিয়ে প্রশ্ন করলাম। তিনি ভুলেপন না করেই আমাকে বললেন, 'তুমি কেমন রিপোর্টার যে, কিছু খবর রাখ না। কোরিয়ায় লোকজন পাঠোনার বিষয় ঠিক হয়ে গিয়েছে। মেনেরের চেলা একজন মাদ্রাজি খবরের কাগজের লোক যাচ্ছে। জওহরের টোপা শান্তিনিকেতন থেকে যাবে। থিমায়াকে আমায় সঙ্গে দেখা করিয়ে আসবে। ওর সঙ্গে আমার কয়েক আই এ এস অফিসার কোরিয়া আসবে। এই তো হয়ে গেল।' আমাকে এটুকু খবর ডা. রায় রাষ্ট্রসংগমাণ্ডর জন্য পেন্সনের দরজার দিক প বাড়ালেন। পরে কাগজে পেরোখিমাস ডা. রায় কৃষ্ণমেনেরের চেলা বলে যে মাদ্রাজি সাংবাদিকের কথা বলেছিলেন, তিনি হলেন বিশ্ব

পার্শ্বসারথি (G. Partha Sarathi), মাদ্রাজের 'দি হিন্দু' প্রতিক্রিয়া আনিস্ট্যাট এডিটর। তাঁর পিতা যাত্রা পোশালখমী আয়েসার নেহরু মন্ত্রীসভার রেলমন্ত্রী ছিলেন এবং তিনিই ১৯৫০ সালে রেলওয়ের শতবর্ষে ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলের ও বেসল নাপপুর রেলের সনদ দপ্তর দুটি কলকাতা থেকে সরিয়ে গোরক্ষপুরে ও রীতিতে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। জি পার্শ্বসারথি কোরিয়া যুদ্ধবিরতি কমিশনে ভারতীয় দলের পি আর ও-পক্ষে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর সহকারী হয়েছিলেন শান্তিনিকেতনের শিক্ষাবোর্ডের অধ্যাপক কিতীশী রায়। কিতীশীরায়ও বরীজবাবুর আমল থেকেই নেহরুর ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন। পার্শ্বসারথি সেই ১৯৫০ সালে খবরের কাগজের দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে আর কখনওই খবরের কাগজে ফেরেননি। কমিউনিস্টদের দরগায় সিঁদিয়ে গিয়ে কৃষ্ণমেনেরের অনুরোধে ভারতের পররাষ্ট্র দপ্তরে জায়গা করে দিলেন। বিভিন্ন দেশে ও রাষ্ট্রসংঘে ভারতের বিভিন্ন কূটনৈতিক পরে কাজ করে ১৯৭০ সালে ফেরেন তিনি। ইন্দিরা গান্ধীর অন্যতম বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিতে পরিণত হলেন। কেবল তাই নয়, পি এন হাসকার, পি পি দলের সঙ্গে এই পার্শ্বসারথি দীর্ঘ নয় পনের বছর ভারতের ডিপ্লোম্যাটিক ও প্রতিরক্ষামূলক নিয়ন্ত্রিত করেছেন প্রবল পরাক্রমে।

কোরিয়া যুদ্ধবিরতি কমিশনে ভারতীয় প্রতিনিধিদের মধ্যে দৃশ্যপটের অন্তরালে এক বিতর্কের সূচনা করেছিলেন আই সি এস অফিসার বি এন চক্রবর্তী। কমিশনের চেয়ারম্যান লে. জেনারেল কে এস থিমায়ার সঙ্গে বি এন চক্রবর্তীকে সহানুভূতি চেয়েছিলেন নিযুক্ত করা হয়েছিল। বি এন চক্রবর্তী একজন আই সি এস অফিসার হয়ে একজন সামরিক অফিসারের আসন থেকে সরিয়ে তাঁর মর্যাদার পরিপন্থী মনে করলেন। তিনি কোরিয়া যুদ্ধবিরতি কমিশনের সদর দপ্তর পানমানজুন (Panmanjun) গিয়ে কাজে যোগ দিলেন। তারপর 'অসুস্থতার কারণে' দীর্ঘ দুই মাসে দেশে ফিরে এলেন। তখন লে. জেনারেল থিমায়াকে কমিশনের সেক্রেটারি পদবিম্বাংলার আই এ এস অফিসার আইভন সুরিগোকে (Ivan Surita) দিয়ে কাজ চলিয়ে দিলেন। কমিশনের চেয়ারম্যান হিমাব লে. জেনারেল কে এস থিমায়াকে দুই কোরিয়ার সীমানা নির্ধারণ, ৩৮° অক্ষরেখাকে অসমরীকীকরণ এবং উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে বন্দি বিনিময় ও আহত সৈনিকের চিকিৎসা ও ঘরে ফেরার সুব্যবস্থা করে আন্তর্জাতিক ব্যাতি অর্জন করেছিলেন। প্রায় বছর তেড়ে কয়েক যুদ্ধবিরতি কমিশনের কাজ সম্পন্ন করে লে. জেনারেল কে এস থিমায়াকে উচিত ফেরার পথে কলকাতায় এলেন মুখামুখি ডা. রায়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য। ডা. রায় যুদ্ধবিরতি কমিশনের কাজের সাফল্যের জন্য লে. জেনারেল থিমায়াকে বিশ্বনাচন্দ্র অবসর লগ্নে এক সর্ববর্ধনা দিলেন।



জেনারেল বিমারা ডা. রায়ের কাছে পশ্চিমবঙ্গের অফিসার, আইনমন সুপ্রিম কর্তৃকতার তুমসী প্রশাসন করলেও আইনমন্ডে ডা. রায়ের কাছে দাঁড় করিয়ে বললেন, 'স্যার, আপনার অফিসার আপনাকে ঘিরিয়ে দিলাম।'

এখানে জেনারেল বিমারা সম্পর্কে আরও একটু বলা দরকার। ১৯৫৭ সালের শেষে কিংবা ১৯৫৮ সালের গোড়োতেই জেনারেল বিমারা ভারতীয় সামরিক বাহিনীর প্রধান নিযুক্ত হলে। ১৯৫৮ সালের অক্টোবরে জেনারেল আয়ুব খান পাকিস্তানের কর্মতা দখল করে নেয়ারে এক 'মৃত্যু গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন। ১৯৬০ সালের জানুয়ারিতে জেনারেল আয়ুব একদল ভারতীয় সাংবাদিক সঙ্গে নিয়ে পূর্ব-পাকিস্তান (পূর্ববঙ্গ) সফর আরম্ভ করেন। তাঁর এই সফরের নাম ছিল 'পাক জামুরিয়াত' (Jamuriyat) অর্থাৎ 'পাক গণতন্ত্র'। জেনারেল আয়ুব তাঁর সফরের শেষ পর্ধ্যায় চট্টগ্রামে ভারতীয় সাংবাদিকদের সঙ্গে এক ফোরালি আলোচনা করেন। ভারতীয় সাংবাদিকরা জেনারেল আয়ুব খানের কাছে জানতে চেয়েছিলেন যে তিনি ভারতে সামরিক অভ্যুত্থানের সম্ভাবনা দেখছেন কি না। জেনারেল আয়ুব সরাসরি জবাব না দিয়ে, হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'যদি তা কখনও হয় তাহলে আমি চাইব, তা যেন 'টি. নি-র কার্যকালের মধ্যে হয়। সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানো যেতে পারে, কিন্তু তার আগে বেশি জরুরি হল তার পরবর্তী রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পরিস্থিতিতে নেতৃত্ব দেওয়া, যেটা আমার মতে ভারতে একদিক 'টি মি'-র আছে। তাঁর মতো সামরিক ও প্রশাসনিক প্রতিভা আমাদের মধ্যে বিরল।' 'টিমি' হল সামরিক বাহিনীতে জেনারেল বিমারার ডাকনাম। আয়ুব ও বিমারা অভিজ্ঞ ভারতবর্ষের সামরিক বাহিনীতে দীর্ঘদিন একসঙ্গে কাজ করেছেন এবং দেশবিদেশের বহিরাগত পণ্ডিতদের বিদ্যামন দিওন্তিতে ব্রিটিশ সেনাপতির নেতৃত্বে 'জয়েন্ট পঞ্জাব বাউন্ডারি ফোর্স' (Joint Punjab Boundary Force) তাঁরা উভয়েই প্রিগ্রেসিভার হিসাবে কাজ করেছেন।

ভারতের সেনাপ্রধান হিসাবে জেনারেল বিমারা এক ইতিহাস সৃষ্টি করে দিয়েছেন ভারতের রাজনীতিতে। ১৯৫৯ সালের মাঘমাঘি মাসে প্রচুরকাল দপ্তরের ব্যস্ত ব্যস্ত দিনের প্রতিরক্ষামূলী কৃষ্ণমন্ডের সঙ্গে জেনারেল বিমারার মতবিরোধ দেখা দিয়ে। মতবিরোধ চরমে উঠল যখন কৃষ্ণমন্ডে আসেন পলিনে। সে এক থেকে সরকারের অস্ত্র উৎপাদন কারখানায় অর্থাৎ অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরিতে ভোগ্যপণ্যই বেশি পরিমাণে উৎপাদন করা হবে। জেনারেল বিমারা লিখিতভাবে এই সিদ্ধান্তে অস্বীকার করেছিলেন। কৃষ্ণমন্ডে এক প্রকারে নিষিদ্ধ জবাবে এক কথা বললেন যে অস্ত্র উৎপাদনে অপরায় না করে প্রতিরক্ষাসম্ভার

হিসাবে তাঁর বক্তৃতার টেপেরকর্ড বাড়িয়ে শোনালে মীমাংসা ভারতীয় সৈন্যের মনোবল অনেক বৃদ্ধি পাবে। জেনারেল বিমারা তাঁর পদত্যাগ ঘোষণা করলেন। ভারতবর্ষ তোলপাড়, ভারতীয় সংসদ উজল হয়ে উঠল। পশ্চিমবঙ্গের ডা. বিমানচন্দ্র রায়, বিহারের ড. শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, ওড়িশার ড. হরেকৃষ্ণ মহাপাত্র, মধ্যপ্রদেশের ধারকপ্রসাদ মিশ্র, মহারাষ্ট্রের যশবন্তরায় চন্দন প্রভৃতি মুখ্যমন্ত্রীর বিরোধের ভ্রুত মীমাংসার জন্য নৈরবেক তখনই হস্তক্ষেপ করতে বললেন। জয়প্রকাশ নারায়ণ ডা. রায়মন্ডের নেতৃত্বে হোয়াইয়াসব সকল বিরোধী নেতা (কেন্দ্রবাস কনিউনিটিস্টা বাসে) কৃষ্ণমন্ডে ও বিমারার লেখা কাগজপত্র লোকসভায় পেশ করার দাবি জানালেন। নৈরবেক লোকসভায় বিতর্কে রাজি হলেন। কিন্তু বিতর্কের দিন সকালে নৈরবেক জেনারেল বিমারার বাড়ি গিয়ে তাঁকে পদত্যাগ প্রস্তাবেরে রাজি করেছিলেন। পরে লোকসভায় ওভহরলাল নৈরবের সেই বিখ্যাত উক্তি...In India the Civil Authority is supreme...। কৃষ্ণমন্ডে ও জেনারেল বিমারার বিরোধ নিয়ে নৈরবেক দার্শনিকসুলভ ভঙ্গি নিয়ে বললেন, 'দুজনের মানসিক কাঠামো বিপরীত ঘর্মী বলেই এই সম্ভবত। ওটা কোনও বক্রিগণ্ড বিরোধ নয়।' জেনারেল বিমারা পরবর্তীকালে তাঁর আত্মজীবনীতে এই বিষয়ে অনেক কিছু বলেছেন। কোরিয়া যুদ্ধবিরতি কিশনের চেয়ারম্যান হিসাবে জেনারেল বিমারা যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তার স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি যথাক্রমে ও সাইপ্রাসে রাষ্ট্রপঞ্জ শান্তিচুক্তি বাহিনীর অধিনায়ক হিসাবে আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালন করেছেন। এই কাজের মধ্যেই জেনারেল বিমারা ১৯৬৭/৬৮ সালের সাইপ্রাসে মারা যায়।

বিখ্যাবিদ্যায়ের রিপোর্ট করার দিনওগিয়ে যে তিনজন মরগীয়া ব্যক্তিত্বের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলেন মরণে তা ডা. ভিন্সেন্ট প্রসাদ নিয়োগী (জে প্রি নিয়োগী) ও অধ্যাপক সন্তোভান্য বসুর কথা আমি আগেই বলেছি। ব্যক্তি করিয়ে অধ্যাপক সন্তোভান্য যোগ। সতীশবাণুর যথাপ্রকার কাজ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন স্বপ্নকর্ত ১৯৬০ সাল নাগাদ। তারপর থেকেই তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তাদের একজন। সব সময়েই বিদ্যে ও গভীর মন করে থাকতেন। সাধারণত কথা বেশি বলতেন না। কিন্তু যখনই মৃৎ শুল্কতেন তখনই দাপটের সঙ্গে কলকাতা। গাভীরের আড়ালে ছিলেন প্রুণ্ড রসিক, ব্যাকচুর্মেত অলিভে ও উদারতার অধীশ্বর। যে রিপোর্টারদের তিনি পছন্দ করতেন, তাঁরা তাঁর টেবিলের সামনে নিয়ে দাঁড়ালে তিনি চোখ বুজে ফেলতেন। তারপর চোখ বুজেই বলতে আরম্ভ করতেন দুর্গমেন্দ্রসিনী-র প্রথম পরিচ্ছেদের শেষ...স্বাধারের দিকের অপরাধে এক অখারোয়ী যুবা পুরুষ গড় মাঝারনের পথে

যাইতেছিল।' কখনওবা কপালকুণ্ডলাকে নবকুমারের স্রোয়াসক্ত দেখে কৃষ্ণ ভবনসনার সুরে "অমি কপালকুণ্ডলে..." বলে খমিয়ার, আবার কখনওবা "আমদমঠ" থেকে ওহামতো মন্ত্রেচ্চে নিয়ে খাণ্ডির প্রবেশের পর মাতৃমৃত্যুর সামনে মহেচ্চে দাঁড় করিয়ে "...মা কি ছিলেন..." মা কি ইয়ায়েছেন..." সেই বহু নির্ঘেচ্চকতা আমানের বানিকসকল শোনেন। তারপর অর্ধনিদ্রাভিত চক্রে বলতেন, "বলিয়ে আজ্ঞা হোক।" এরপর সতীশবাণুর কাজ থেকে বরক আদায় করতে হত। আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে রিপোর্ট করছি তখন অধ্যাপক সতীশচন্দ্র যোগ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার। সকাল সাড়ে দশটা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতেন, বেরিয়ে যেতেন রাত দশটা পর। ১৯৪৯ সালে যে তিনজন ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষার বাতায় নব্বয় বাড়িয়ে দেওয়ার ঘটনায় ভাইস-চ্যান্সেলার প্রদমন্যথ পেশাপাধ্যাকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল, তার জেরে প্রথমটাই ভাইস চ্যান্সেলার চারভক্ত বিশ্বাস একটা তদন্ত কমিটি গঠন করেছিলেন। ওই তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন কিরাপোর্ট সারার ব্রজলাল মিত্র (বি এল মিত্র)। কিরাপোর্ট মিত্র তাঁর তদন্ত রিপোর্ট ভলো দেওয়ার পর রিপোর্টে আট কখনও প্রকাশিত হয়নি। সম্ভবত ১৯৫০ সালের শেষে কিংবা ১৯৫১ সালের গোড়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের একতলার রেকর্ডরুমের অন্তর্গত ছিল। ওই অণ্ডনে বি এল মিত্র কমিটির তদন্ত রিপোর্টটি সার বি এল মিত্র সতীশ যোগের বিরুদ্ধে অনেক কিছু লিখেছিলেন।

বি এল মিত্র নাকি একমু লিখেছিলেন যে, "...অধ্যাপক সতীশ যোগ সন্ধ্যা সাড়টা থেকে দশটা পর্যন্ত তাঁর অফিসরয় বসে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিটি সান্নিধ্যে এসেছিলেন মশাপান করে থাকতেন..." এই অসমু অধ্যাপক সতীশচন্দ্র যোগের নিজের জবাব দিলে: "...আমি সতীশ যোগ রোজ সন্ধ্যা সাড়টা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত অফিসে বসে মন বাই, তা এটা আমোদ করার জন্য বি এল মিত্রেরের মতো একজন লোককে পরাস দিয়ে তদন্ত কার্যনারে প্রয়োজন ছিল কি? হোয়ার ফুলের পেছনের দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের গেট আমি অফিসে থাকা পর্যন্ত যোগা বসে রোজ। আমি মন বাই কিনা তা দেখতে ছাত্রকাজা বিশিষ্টয়ের সোতলায় তররররর কাজ উঠে আসা যায়। তার জন্য বি এল মিত্রেরের দরদার হল না।"

সতীশবাণু আসামার বাকপটুতায় তাঁর কৈশোর ও যৌবনের দুটি ঘটনার কথা বলেছিলেন। প্রথমটা হল একপ্রাণ-স সতীশবাণু যখন ফের-ফাইরেবের ছাত্র, তখন তাঁর লেখা-মামলাসর চাইইল থেকে কলকাতায় চলে এলেন। এসে হোয়ার ফুলে (হিন্দু

ফুলও হতে পারে) ভর্তি হলেন। একেবারেই কাগজলাল, কলকাতার উচ্চপত্র থাওতে তাঁর অনেক বরস মস। কেউছিল। ফুলের সহপাঠীরা তাঁকে তাঁর উচ্চারণের জন্য 'বাঙাল' বলে সমসায় পেপাত। ছেলেরের মধ্যে একজন তাঁকে খুব বেশিরকম উভাক্ত করত। সতীশবাণু ঠিক করলেন এর একটা ছাত্রী বিবিত্ত করতে হবে। পরের দিন ফুলে আসার আগে পেনসিলটিকে এমনভাবে কেটে দিয়ে যে প্রায় আধ ইঞ্চি শির বেরিয়ে থাকল। শিরাটিকেই তিনি বেশে নিযুণ্ডভাবে ছুঁতলা করেছেন। ফুলের 'লেজার' পিরিয়েছে যথারীতি তাঁকে 'বাঙাল' বলে খেপোনো আরম্ভ হল। সেই উভাক্ত করা ছেলটিকে সতীশবাণু খমিয়ার দিলেন, 'তবে কেউ নিতেই পারে তবু একদিক ঠাি আমার একদিন...'। ছেলটো এই খমিয়ারির পরোয়া না করে ভায়েতনি শুধু করতেই সতীশবাণু পকেট থেকে পেনসিলটা বের করে জেরেরে ওর কঁজিতে আঁতান করেন, দিনকি দিয়ে রক্ত বের হতেই ছেলটো যথাক্রা অর্ধমৃত করে উঠল। মাস্টারমশাইও ছুটে এলেন। আহত ছেলটিকে মেডিকেল কলেজে নিয়ে গিয়ে রক্ত শুদ্ধ করে দেবে হয়। পরের দিন ছেলটোমশাইও সব ছাত্রদের ডেকে নিলেন, দিলেন, উচ্চারণের ব্যাপারে পূর্ববঙ্গের ছেলদের অনুভূতিতে আঘাত দেওয়া চলেন না। সতীশবাণুকে ভর্তন্যনা করে সতীশবাণুকে আর কখনওই 'বাঙাল' বলে সহপাঠীদের গল্পনা সহ্য করতে হয়নি।

তিয়াটী হল সারার আবেগেরের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ। ঘটনাটি এরকম: ১৯৫৬-১৬ সাল। অক্ষরাণ্ডে এসে এক পরীক্ষা দিয়েছেন সতীশবাণু। কলকাতার ফুলবেরের মাঠে তখন তাঁর উদ্ভাস। একটা ইউরোপিয়ান ক্লাবের সঙ্গে মোহনবাগানের খেলা। সতীশবাণু জলার মতো দেখতে গিয়েছিলেন। মোহনবাগান জিতল। চৌরাঙ্গি ও ধর্মজলার সঙ্গে সী উজ্জলেন। মোহনর দল তড়াগের কাছে এসে উত্তমুমুী একটা ট্রামের জন্য অপেক্ষা করতেন তিনি। এমন সময় দেখতে পেলেন তাঁরই খনি কয়েকজন যুবক একসঙ্গে আনোয়া হিঁচকো হিঁচকো ঘিরে লাগাফো ও লুকে, 'সাহেবরা হেরেছে, সাহেবরা হেরেছে।' সাহেবও ওদেকে তাঁকে ঘিরে লাগাফাফি করতে নিষেধ করছেন। কিন্তু ওরা ওনুনে না। সতীশবাণু জলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। সাহেবরা তখন ভাঙর রেগে গিয়েছেন। হঠাৎ তিনি রিভলবার বের করে ফেললেন। সতীশবাণু খুব ভক্তিশাণী হলো, তিনি অতি ক্ষিত্রতার সঙ্গে সাহেবটী সাহেবের গিল চোপে ধরতেই রিভলবার আনোয়া সতীশবাণুর হাতে চলে এল। উৎসাহী লোকগুলির উদ্দাম তখন আরও বেড়ে গেল। কিন্তু সতীশবাণু বুকলেন, আইনের দিক দিয়ে তিনি গণ্ডি কাজ করে ফেলছেন। সাহেবটী বিকস্কর্তবিরমু হতে চাইলে। মুহূর্তের মধ্যে সতীশ যোগ রিভলবারটি পকেটে







কিছু একটা বলেছিলেন। তাঁরা সদলে কংগ্রেস মিউনিসিপাল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অতুল খেখেকায়ে নালিশ করলেন। অতুলবাবু ঘটনাক্রমে মুখামতী ডা. রায়কে জানান। ডা. রায় সতীশবাবুকে রাইটস বিভাগে ডেকে পাঠালেন। সতীশবাবুকে ডা. রায় বলেছিলেন, 'সতীশ কবস হয়েছে। মাথাটা ঠিক রেখে।' সতীশবাবুর ভাব ছিল, 'সারার মাথা নিয়ে আমার কোনও সমস্যা নেই। আমার সমস্যা অন্য জায়গায়।' 'সেটা কী?' ডা. রায় জানতে চাইলেন। সতীশবাবু ভাবছিলেন, 'My problem is with my tongue....' তারপর দু'জনেই খুব হাসলেন।

১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত ছয় বছরে ভারত-পাকিস্তান উপমহাদেশে এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এমন কতগুলি ঘটনা ঘটে যা এই উপমহাদেশের মানুষের জীবনে ও রাজনীতিতে ভাবধারণা অনেক উত্থানপতন ঘটিয়ে বোঝে যে। যার ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিশ্লেষণ আমাদের দেশের পণ্ডিতেরা এখনও পর্যন্ত করে উঠতে পারেননি। ১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পূর্ববঙ্গের (পূর্ব পাকিস্তান) সাধারণ নির্বাচনে ফজলুল হক সাহেবের কুবক প্রজাপতি এবং শাহিদ সুরবরি ও মৌলানা ভাসানির আওয়ামী লিগের যুক্তফ্রন্ট মুসলিম লিগকে ধরারাজী করে। প্রাদেশিক আইনসভায় দুই তৃতীয়াংশের বেশ আসন জিতে নিল। এই ভোটার ফলাফলের যাবাবিক পরিসংখ্যতে বঙ্গ রাজনীতির প্রবাদপুরুষ আবুল কাশেম ফজলুল হক পূর্ববঙ্গের মুখামতী হলেন। ওই সময় পূর্ববঙ্গের (পূর্ব পাকিস্তান) গভর্নর ছিলেন সার ফিরোজ খাঁ নুন। তিনি দাবীকরা ফলাফলের ওপর এক বিবৃতি দিয়ে বললেন, 'পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু বাকস্বামী ও শিল্পপতিদের টাকায় কুবক প্রজাপতি ও আওয়ামী লিগ এই নির্বাচনে জিতেছে।' ফিরোজ খাঁ নুনকেই বর্জ্য বিবৃতিতে নির্দিষ্টভাবে ভাড়াপুকুরে তামাদের পারসীরা রাজা ভানসীনাথ রায়ের বংশের নাম করলেন। ওই সময় থেকে পালাটা আখ্যাত ছিলেন ফিরোজ খাঁ নুনকে। তিনি এই বিবৃতি দিয়ে মোহনা করলেন যে এরকম এক ভয়ানক পক্ষপাতপূর্ণ গভর্নরের কাছে তিনি মুখামতী হিসাবে শপথ নেননি। মুখামতীরা খোশে কবল গেলেন। সতীশবাবুকে সন্তুষ্ট এড়াতে পাকিস্তানের বাহ্যিক প্রতিনিধিত্ব বড়ভার মহৎমান আলি হক সাহেবের ব্যক্তিগত বন্ধু ও উপমহাদেশের প্রাক্তন রাজনীতিবিদ চৌধুরী বালিকুজ্ঞানকে পূর্ববঙ্গের গভর্নর বরখাস্ত। গভর্নর বালিকুজ্ঞান সাহেবের কাছে মুখামতী হিসাবে হক সাহেবের শপথ নিলেন। মুখামতীর পক্ষে শপথ নিয়ে হক সাহেব গভর্নরের 'ওয়ায়েট বুক'-এ বাংলায় স্বাক্ষর দিলেন— 'আবুল কাশেম ফজলুল হক'। পরদিন তাঁর ও কলকাতার বাংলা খবরের কাগজগুলিতে হক সাহেবের স্বাক্ষরের ফটোশট ছাপা হল। ইতিমধ্যে পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক পরিবর্তন

ও ফজলুল হক সাহেবের রাজনৈতিক উত্থান নিয়ে ভারতীয় পার্লামেন্ট উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। দোকসভাস ও রাজসভায় হরকালীন বিতর্কে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল হক সাহেবের অভিমতন জানিয়ে বলেছিলেন, 'হক সাহেব আমার পিতার ব্যক্তিগত ও আমাদের পরিবারের দীর্ঘদিনের বন্ধু।' কেবল পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি রাজনৈতিক নেতারা নন, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মুখামতী, রাজাপাল ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা হক সাহেবকে অভিনন্দন জানিয়ে ঢাকায় টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন। তবে বাঙালিরা কখনো সূখ বেশিদিন নয় না। গত ৮০/৮৫ বছরের রাজনৈতিক ইতিহাসে এই কথা প্রমাণিত হয়েছে। ১৯৫৪ সালেও তার ব্যতিক্রম ঘটল না। ১৯৫৪ সালের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে হক সাহেব কলকাতায় এলেন। কলকাতায় পৌঁছে তিনি তার পুরনো সাংবাদিক বন্ধুদের বলেছিলেন, 'দাদা ডুইবা গিয়া বুড়িগদায় ভাইয়া উঠছি।' সপ্তক ৫ মে তিনি রাইটস বিভাগে মুখামতী ডা. বিধানমন্ত্র রায়ের সঙ্গে দেখা করলেন। তারপর তিনি বিধানসভায় গেলেন। হক সাহেবকে বিধানসভায় দেখার আমার খুব ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আমার বার্তা-সম্পাদক শান্তি মিত্র আমাকে হক সাহেবের অন্য অনুষ্ঠানের ডিউটি দেওয়ায় আমার সেই ইচ্ছা পূরণ হয়নি। তবে আমার অন্য সহকর্মীদের কাছ থেকে যা শুনেছি তাতে ওই দিনটির বিধানসভা ছিল অবিস্মরণীয়। পিন্ধাকারের ও বিশিষ্ট অতিথিদের গ্যালারি ছিল কনায় কনায় পূর্ণ। হাইকোর্টের অনেক ক্যাবরপতি, বার কাউন্সিল ও বার অ্যাসোসিয়েশনের বিশিষ্ট সদস্যেরা উপস্থিত ছিলেন। ফজলুল হক সাহেব পিন্ধাকারের গ্যালারিতে এসে বসামাত্র বিধানসভার কবল সদস্য উঠে দাঁড়িয়ে হর্থকনিতে লিগে অভিনন্দন জানান। সদস্যেরা সমবেত কণ্ঠে পিন্ধাকারকে অনুদান করলেন যে পরিষদীয় রীতিতে ব্যতিক্রম ঘটয়ে 'বহিরাগত' (outsider) ফজলুল হক সাহেবকে 'হাউসের ভেতরে' আসতে দেওয়া হোক। পিন্ধাকার শেলকবুর মুখার্জি সম্মতি দিলে বিধানসভার সেক্রেটারি অফিসারজন মুখার্জি গ্যালারি থেকে তাঁকে বিধানসভার ভেতরে নিয়ে এলেন। এই অভ্যন্তরীণনয়ন্য অবিকল্পবদের শেষ বিধানসভার ডেপুটি সেক্রেটারি ছিলেন। বিধানসভায় সেই মুহূর্তটি ছিল যেন বাঙালির পুনর্নির্মাণ। হাউস চুকে তিনি অনেক পুরনো সদস্যের নাম ধরে ডাকাকলিকারলেন। প্রত্যেক তিনি বিচ্ছিন্ন মুখামতী বিধান রায়ের পাশে পেলেন। ১৯৫৭ থেকে ১৯৪৩ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত বাংলায় প্রথম 'প্রিমিয়ার' বা মুখামতী হিসাবে তিনি বিধানসভাতে যে জয়গাটিতে বসলেন, সেখানে এসে বসলেন।

(ক্রমশঃ)

## বাক-সংস্কৃতি নির্মাণে ডিরোজিওর অবদান

শক্তিসানন্দ মুখোপাধ্যায়

শিক্ষানের প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতিতে থাকে বাণ্য প্রায়ক্রম, নির্দিষ্ট কটিন, নির্ধারিত প্রসঙ্গ। কী পড়ানো হবে? কতক্ষণ পড়ানো হবে? কোথায় পড়ানো হবে? সুনির্দিষ্ট পাঠ্যবিষয় নিয়ে নির্ধারিত পাঠদানকে শিক্ষক সমন্বয়টি মেনে শিক্ষাদান করবেন। ছাত্ররা তা গ্রহণ করবে অগ্রকাশিত কবিতার সঙ্গে। আধুনিক ধরনের সাহেবি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এই হচ্ছে নিয়ম। হিন্দু কলেজের এক চতুর্থ শিক্ষক পুরো ব্যবস্থার উল্টো-পাল্টা করে দিলেন। নতুন বিন্যাসে তিনি গাংলেনে গুরুশিষ্য সম্পর্কের মালা। মাস্টার বলবেন আর ছাত্ররা শুধু শুনবে এই ব্যাপারটা ভেঙে তিনি চালু করলেন এমন সাংস্কৃতিক যাতে ছাত্ররাও বলবে। ছাত্রদের নিক্তিয় স্রোতার আসন থেকে তিনি তুলে নিয়ে এলেন বক্তৃতার মঞ্চ। কীভাবে এবং কেন? সেই প্রশ্নে যাওয়ার আগে দু'দিনটি সাধা নিয়ে নেব।

### 'তর্ক-বিতর্ক' করিতে দিতে'

ডিরোজিওর এক খাতনামা ছাত্র রামচন্দ্র লাহিড়ীর জীবনী লিখেছেন শিবনাথ শাস্ত্রী। তিনি লিখেছেন,

'ডিরোজিওর চতুর্থ শ্রেণীর সাহিত্য ও ইতিহাসের শিকশক হইলেন বট্ট, কিন্তু চুপক্ষে এমন লোহকে আকর্ষণ করে তিনিও অপর্যাপ্ত শ্রেণীর বালকলিককে আকৃষ্ট করিলেন। তিনি স্কুলে পদার্পণ করিবার পরেই বালকগণ তাঁহার চারিধারে ঘিরিত। তিনি তাহাদিগের সহিত কথা বলিতে ভালবাসিতেন। স্কুলের দ্বিট ইয়া গেলেন অনেককাল বিষয়া তাহাদের পাঠে সাহায্য করিতে, নানা বিষয়ে তাহাদের সহিত কথোপকথন করিতেন। তাহার কথোপকথনের এই রীতি ছিল যে তিনি একপক্ষ অকলঙ্ক করিয়া বালকলিকে অপরপক্ষ অকলঙ্ক করিতে উৎসাহিত করিতেন, এবং বাধীনভাবে তঁকে বিতর্ক করিতে দিতেন। এইরূপে বালকগণের স্বাধীন চিন্তার বিকাশ হইতে লাগিল।'

হরমোদ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন হিন্দু কলেজের করণিক। তিনি একটি স্মৃতিচারণমূলক লেখায় লিখেছেন—

'The students of first, second and third classes had the advantage of attending a conversazione

established in the school by Mr. Derozio where readings in poetry, literature and moral philosophy were carried on. The meetings were held almost daily after or before school hours.'

'Conversazione'-এর আভিধানিক অর্থ হল সাক্ষ্য বিশ্বসঙ্গর বা আলোচনাসভা। কলেজে ক্লাস-টাইমের বাইরে ডিরোজিওর উদ্যোগে এই বিতর্কগোষ্ঠা বা আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হত। 'without the knowledge or sanction of the authorities' প্রথম দিকে এই ভাবেই সভা চলত। সভা বা বিতর্কসভা খানাপ্রতি হতে চলে যায় শ্রীকৃষ্ণ শিখের বাগানবাড়িতে। তার নাম হয় 'আকার্ভেমিক অ্যাসোসিয়েশন' (১৮২৮)। ডিরোজিও মনে করতেন—

'কোনো মতকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে তার বিরুদ্ধে আপত্তিকর মতগুলিও হৃদয়ঙ্গম করা দরকার। এবং সেগুলির অসমতা উদ্যোক্তা না করলে সে মত প্রতিষ্ঠিত হতে কি করে? আমি তো এর বেশি কিছু করিনি। কিছু সময়ের জন্য একমূল তরুণের শিক্ষার দারিত্য আমার ওপর অর্পণ করা হয়েছিল। আমার পক্ষে কি উচিত হত তাদের কণ্ঠ ও অজ্ঞান ক্রুরপলি তৈরি করা; গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন শুধু একটি পক্ষের অনুকূল বক্তব্যগুলি তুলে ধরলে তারা কটুরপন্থী অজ্ঞানীই তৈরি হত। এ পন্থায় মনের সঙ্গীতই তৈরি হয়, উপরন্তু তরুণদের মানসিক সক্রিয়তা ও শক্তি নষ্ট হয়।'

তা হাতে না হয়, তারা যাতে যথার্থ জ্ঞানচর্চার শরিক হতে পারে, সে জন্য 'ক্লাস লেকচার সিস্টেম'-এর বাইরে তাদের দিনে এসেছিলেন। ছাত্রদের তিনি দুটি নতুন সংস্কৃতির দিকে এগিয়ে দিয়েছিলেন বাকসংস্কৃতি (eloquence) ও লিখন-সংস্কৃতি।

### বাক-সংস্কৃতি

বাগ চর্চার (eloquence) মধ্য দিয়ে মানুষ শালিত হয়ে ওঠে। সর্বমুখের নিজেকে উন্মোচিত ও প্রতিষ্ঠিত করে যখন বক্তৃতাসভা ও বিতর্ক সভা। সিলেবাস-শাসিত ও পরিমিত বিতর্ক



দ্রাসক্রমের মধ্যে শিক্ষকের একনায়কত্ব চলতে পারে কিন্তু ছাত্রদের সেই পন্থাভিত্তিক অধিকারের সুযোগ কোথায়? দ্রাসক্রমের মধ্যে সৌচকে অটোনোও শক্ত। তাই দ্রাসে শিক্ষকের কাছে শোনাতোই যেখানে শেষ হয়ে যেত প্রকৃতিত পাঠগ্রহণ প্রক্রিয়া ডিরোজিও প্রবর্তিত জ্ঞানচর্চার প্রক্রিয়ায় শোনাতে সুনামটাই বড় হেরে হতে পারত শ্রেণিকক্ষের মধ্যে। বাকি সবটাই হত দ্রাসের বাইরে। দ্রাসোত্তরের পর্যায়ে অনেক দূর পর্যন্ত শিক্ষক সঙ্গে থাকেন। এমন প্রথম সার্ককে প্রশিক্ষক অনেকক্ষণ হয়ে থাকেন সেইরকম আর কি! দ্রাসে শিক্ষকের কাছে শোনা পর > দ্রাসের বাইরে শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা > দরকার হলে আলোচনা করতে করতে বা আলোচনা করতে শিক্ষকের তামতেরে যাওয়া > শিক্ষকের সঙ্গে পাঠাগারে বা শিক্ষকের বাড়িতে তার নিজস্ব পাঠাগারে বা পাঠাগার থেকে বই এনে বাড়িতে পড়া, প্রয়োজনে সমস্যা জায়গাগুলি আবার শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করে নেওয়া > তারপর বাড়িতে একান্তে বসে বিস্ময়ী ওঠিয়ে লিখে ফেলা > শেষে বিবর্তসভায় বা আলোচনাসভায় সর্বসম্মতে লেগাটি পাঠ করা বা বক্তব্য রাখা। এই ভাবে ছাত্ররা নির্বিঘ্ন প্রকৃতির পথ বেয়ে বিবর্তসভায় আসত। এক একজন তাদের সাধ ও চিন্তার প্রকৃতি অনুসারে এক একরকম ভাষায়, যুক্তিগতভাবে ও সিদ্ধান্তে তাদের বক্তব্য পেশ করত। বিবর্তসভায় এসে সর্বসম্মতে মুমূর্শু হত নানারকমের যুক্তি ও ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্ত। এক রকমের অধ্যয়ন-সিদ্ধিত যুক্তিবাহিত সূচিত্তিত মতামতের সামনে আর এক রকমের অধ্যয়ন-সিদ্ধিত যুক্তিবাহিত মতামতের সঙ্করে ভুলে উঠত বিবর্তসভাগুলি। শ্রেণিকক্ষ থেকে ওক হত তাদের জ্ঞানগাথা, বিবর্তসভায় এসে শেষ হত তাদের জ্ঞান পরিষ্কার, আবার শোনা থেকেই ওক হত ভাষার নতুন যাত্রাপথ। তাদের প্রানচর্চার আবর্তন প্রক্রিয়ায় একপ্রান্তে দ্রাসক্রম, অন্য প্রান্তে ছিল বিবর্তসভা। তাদের প্রিয় শিক্ষকটি তাঁর কাজ ওক সম্বন্ধে শ্রেণিকক্ষে, শ্রেণিকক্ষে থেকে বের হবার পথ খাবার টেবিলে, কলেজে দ্রাস নাই হত অবকাশে, পথ চালাতে চালাতে, এমনকী তাঁর নিজের বাড়িতে, পঠনে-পাঠনে, বিব্রলম্বে, টুকরো টুকরো ভাষাগুলির ওপরে, প্রত্যন্তরে ব্যাপৃত থাকতেন। শিনাক্ত শব্দী লিখেছেন, 'তিনি কুলে দানার্ণ করিবামাত্র বলকণা উঠার চারিদিকে ঘুরিত।' '... কুলের ছুটি ইয়া গেলেও অনেককাল ব্যস্ততা তাদের পাতার সাহায্য করিতেন।' "প্যারীচান মিত্র লিখেছেন, 'তারা নিমিত্ত ডিরোজিওর বাড়িতে যেত। খন্টার পক্ষ বাতাসে তারে আলোচনা করত। তিনি কুলে যা পড়তেন বাড়িতেও তা নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যেত।' এভাবে ছাত্রের ছাত্ররা নবজাত শিশুর মতো বড় হয়ে উঠতে উঠত। তাদের মানসিক সংগঠনের কারিগরকে তারা ছাড়তেই চাইত না। শিশুর

যেমন ছাড়তে পারে না তাদের মাকে অনেকটা সেইরকম। নির্বিঘ্ন প্রকৃতির পথ পেরিয়ে নানা নানীর মতো তারা এসে মিলত সাদ্ধা বিবর্তসভায় সমুদ্রে। ডিরোজিও ছিলেন তাদের উৎসব, তাদের প্রবাহিত হবার ভূমি, তাদের আকাশে যুদ্ধিরাণী ঘননিবিষ্ট মেঘ এবং সাদ্ধাসভার সাগরসমস। বৃহত্তে অসুবিধা হবার কথা নানা দ্রাসসমমী ডিরোজিওর কাছে 'উপকায়' হয়েই থেকে গিয়েছিল 'আসল বড়' জায়গান হয়ে উঠছিল দ্রাসের বাইরে। দিনে দিনে কালচে মেঘে বাড়তে যেমন ভাবেই বাবা ছিল আচাচারই এই বাকগণ-বহির্ভূত প্রকায়। কর্তৃপক্ষকে আগাচরে বা অনুমানের অপরূপ না করে প্রথম দিকে কলেজেই চলত এই আলোচনাসভা। কিন্তু শেষপর্যন্ত কলেজের বাইরেই থাকে পা রাখতে হল। আত্মপ্রকাশ করল 'আলোকডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' (১৮৮২) নামে এক অভিনব বিবর্তসভা।

#### আলোকডেমিক অ্যাসোসিয়েশন

আলোকডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের অধিনা হল শ্রীকৃষ্ণ সিংহের যোগসাজশে যে একেই শ্রীকৃষ্ণ সিংহ? হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠায় সেসব রাষ্ট্র-মহারাষ্ট্র, অভিজাত সেওয়ান ও আর্চবিশপ ল্যাড লর্ডসের আর্থিক দান ও সক্রিয় উদ্যোগ ছিল তিনি ছিলেন সেই রকম একটি অভিজাত সেওয়ান পরিবারের জাভা সেওয়ান শ্রাবাসীরা সিংহের বংশধর রাষ্ট্রা ভয়কৃষ্ণ সিংহের পরিবার-সমস্যা হিসাবে তিনি এক সময় কলেজের পরিচালনামণ্ডলীর সভ্য হয়েছিলেন।" "দানক্রমে তিনি ছিলেন ডিরোজিওর প্রত্যক ছাত্র। অবগত পাঠকদের হৃদয় মনে পড়তে পারে ডিরোজিওর 'হিট মিটিং-এ যে দু'একজন শেষপর্যন্ত ডিরোজিওর পক্ষে লড়াই করেছিলেন' তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বাবু কৃষ্ণকৃষ্ণ সিংহ; অনুমান করতে অবশিষ্ট নাই হিন্দু কলেজের প্রথম প্রধান শিক্ষক, স্বায়ং প্রধানশিক্ষক কলেজে ডিরোজিও প্রতিষ্ঠিত বক্তৃতাভাসনা 'conversazione' চালানোর ব্যাপারে ক্রমশ পূর্ণপর্যন্ত হয়ে পড়তেন। তখন তাদের একটা অভিজাত, নিরাপত্ত ও স্বাধীন আশ্রয়ের দরকার হয়ে পড়েছিল। সেই আশ্রয় দিয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ সিংহ। শ্রীকৃষ্ণ সিংহ ছিলেন একদিকে বংশ ও বিবর্তের সামাজিকভাবে অভিজাতের মর্যাদা অধিষ্ঠিত ন্যায়দিকে নবনিকায় শিক্ত ডিরোজিও-ও অনুরাণী ওরূপ। ফলে যে বাগানবাড়ি ছিল কাঁচির কনকনিবা ও আমোদপ্রমোদের রোশনি দিয়ে ভরা থাকার কথা সেই বাগানবাড়ি ডিরোজিওর সাহায্যে হয়ে উঠল ইংর বেন্সলনের বুদ্ধির বদলার কোয়ার এরিন। এ কথাটি অনেকই ফোলা কবিরের বিদ্যোৎসাহীরা সর্বসম্মতে সুবিধিত কালীপ্রসাদ সিংহের আর্চবিশপের ভূমিকা পালন হয়েছিল শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাগানবাড়িতে আলোকডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠার মাধ্যম দিয়ে।

শরীরচর্চার জন্য যেমন ক্লাব বা ব্যায়ামাগার থাকে আলোকডেমিক অ্যাসোসিয়েশন তেমনই মনোচর্চার ক্লাব। হিন্দু কলেজের ইতিবৃত্ত নিয়ে যে পরিমাণ অনুসন্ধান হয়েছে আলোকডেমিক অ্যাসোসিয়েশন নিয়ে হারত উপাদান-স্বত্বতার কারণেই সেই ধরনের অনুসন্ধান সম্ভব হয়নি। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস ইংরেজদের 'আসল সূতিকাগৃহ হিন্দু কলেজ নয়, আলোকডেমিক অ্যাসোসিয়েশন। হিন্দু কলেজের ম্যানেজারবর্গ, শিক্ষকবর্গ, এমনকী তার পাঠসূচিও মতো তাদের যথার্থ হদিশ পাওয়া সম্ভব নয় অথচ সেই চেষ্টাই বেশি হয়েছে। তার কারণ কালের কামড় এড়িয়ে তার কিছু কিছু উপাদান এখনও টিকে আছে। কিন্তু আলোকডেমিক অ্যাসোসিয়েশন ছিল প্রধানত বক্তৃতা ও বিতর্কের সাধ্যাশ্রয়। অধ্যয়ন-খচিত, মননানীশু আওম স্বরানো সেই সব বক্তৃতা কবে হওয়ায় মিলিয়ে গেছে সেই সঙ্গে হারিয়ে গেছে তার ইতিহাসও। তবু টুকরো টুকরো স্মৃতিভাণ্ডার, স্মৃতিকথায় সে সম্পর্কে যেটুকু সংবোধ মেলে সেদিকে কান খাড়া করা যেতে পারে। এরমোহন চট্টোপাধ্যায়, ভিন্ডের জার্মান সৌজন্যে আমরা যেমন পেয়েছি কলেজের তত্ত্বেরের আলোচনাসভা বা বিবর্তসভার বিবরণ তেমনই আলোকডেমিক ভাষ্য, ভাবনু এম এম এলসন, প্যারীচান সিংহের প্রত্যক সাক্ষ্য মেলে কলেজ প্রাঙ্গণ বহির্ভূত বিবর্তসভার ছবি। রামচন্দ্র লাহিড়ীর জীবনীলেখক বা ডিরোজিওর প্রথম জীবনীলেখক এডওয়ার্ডসও এদিকে বিপরীকটা আলো ফেলেছেন।

প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শ্রীকৃষ্ণ সিংহের মানিকতলার বাগানবাড়িতে কলত আলোকডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের বিবর্ত সভার আয়োজন। সভাপতি স্বয়ং ডিরোজিও, সম্পাদক ডিআরসন পু। প্যারীচান মিত্রের জবানি ও এডওয়ার্ডসের বিবরণ থেকে জানতে পারি, সেখানে আত্মী শ্রোতা হিসাবে আসতেন স্বয়ং ডেভিড হোয়া, মাঝে মাঝে আসতেন সূত্রিম কোর্টের পরিচালক পুজারী ও এডওয়ার্ডস রায়ান (পরে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন), লর্ড উইলিয়াম বেন্টিনের প্রাইভেট সেক্রেটারি কলেমেল বেনসন, কলেমেল বিসন (পরে যিনি আত্মজটুটি বেনসনের লেখক হয়েছিলেন), বিপসক কলেজের অধ্যক্ষ প্রমথ প্রাসাদি ডি, জিল প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তির। রেভারেন্ড আলোকডেমিক ভাষ্য যে সে সভায় আসতেন তার সাক্ষ্য নিজেই দিয়েছেন। প্যারীচান লিখেছেন, 'সভা সমাপ্ত হবার পরও হোয়ার কিছু সমস্যা নিয়ে চিন্তা রাতে হাঁটতে হাঁটতে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। তিনি আসতেন সেকেন্দ্রে পরিষদের ওপর সদা রেভার জাকোটে বা বড় বড় রাস্তাে বসেদাময়ক নীল কোট পায়ে চাপিয়ে।"

বিতর্কের কেন্দ্রে থাকত একটি পূর্ণনির্দিষ্ট প্রমাণক বিষয়। কেউ একজন সে বিষয়ে লিখে আনা প্রমাণ প্রবী করত। অন্যরা

যে যার পক্ষ মতো পক্ষে বা বিপক্ষে লিখে আনা বক্তব্য পাঠ করে বা বক্তব্য রেখে বিতর্ক ঘটানো চলত। এই ভাবে নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর নামাধিক থেকে যুক্তি ও ন্যায়বোধের আলো ফেলা হত। উদ্দেশ্য বিষয়টিকে সব দিক থেকে যাচাই করে নেওয়া। কেনও কিছু সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাকে অঙ্কুরে মেনে না নিয়ে যুক্তির কাণ্ডাড়ায় দাঁড় করিয়ে তাকে বিচার বা ন্যায়সিদ্ধ করে জীবনে গ্রহণ করতে হবে। এটাই ছিল ডিরোজিওর শিক্ষা। এ বিষয়ে তাঁর নিজস্ব স্পষ্ট বক্তব্য আছে উইলসনকে লেখা চিঠিতে। বিশ্বাসের পরিবর্তে বিচারের এই নতুন সংস্কৃতি, কেনও বিতর্কে একপাক থেকে ছেনে তাকে অঙ্কুরে গ্রহণ করার পরিবর্তে তাকে সব দিক থেকে সমগ্রত পর্যালোচনা করে গ্রহণ করার সংস্কৃতি তিনি চালু করতে চেয়েছিলেন। এবং তার জন্যই দ্রাসক্রমের বিকল্প বিবর্তসভা।

#### আলোকডেমিক অ্যাসোসিয়েশন

আলোকডেমিক অ্যাসোসিয়েশন চার্চ অব স্টল্যাগার-এর দ্বারা প্রেরিত হয়ে, 'a valiant soldier of the cross' হিসাবে' ১৮৮০ সালের ২৭ মে কলকাতা পৌঁছে দেখলেন ডিরোজিওর ছাত্ররা গরম লাভার মতো টগবগ করে ফুটছে। পিতৃ-পিতামহের মধ্যে তাদের আস্থা গেছে ত্রিমূর্তির দীক্ষিত করার বাকি কাঙ্ক্ষিত সূত্রের ফেলতে হবে। ভাষ্য লিখেছেন, 'আমি ঠিক কলমাম এইসব বিবর্তসভা বা আলোচনাসভার একটি সূচিত্তে নিম্যিত যোগ দেবার সুযোগ বাবহার করতে হবে। কেননা তাহলে আমি স্পষ্ট বক্তব্যে পারব এদেশীয় শিক্ষিত তরুণদের আবেগ, সাহিত্য রচনা রাজনীতি ধর্ম সাক্ষ্য ব্যাপারে তাদের চিন্তা গঠন।" ডিরোজিও 'সোসাইটির' ব্যাপারসম্পর্কে তিনি খুব মনোযোগ সহকারেই দেখেছিলেন। লিখেছেন, 'বিতর্কের বিষয় একবার বিচার হয়ে গেলে যে যার বুশমতো পক্ষে বা বিপক্ষে বক্তব্যে পারি। নিম্নমতি ছিল এই যে কলমে বক্তব্যের বিকল্পে প্রতিদান করা যাবে না বা তাকে বাধ্য দিয়ে থামানো যাবে না। সকলেই স্বাধীন ভাবে বলতে পারবে। মাঝে মাঝে এমনও হত এক পক্ষই আত্মজন বক্তা পরপর বলে গেছে। ইচ্ছুক সমস্যাের বক্তব্য পেশ করা শেষ হলে বহিরাগত বা শ্রোতা হিসাবে উপস্থিত ব্যক্তিদেরও আমন্ত্রণ জানানো হত আলোচ্য বিষয়ের ওপর বা বক্তব্য পেশ করা কোনো বক্তব্যের ওপর তাঁর মতামত ব্যক্ত করার জন্য।" তিনি তাঁর প্রত্যক অভিজ্ঞতা থেকে বিবিত্ত প্রতিবেদন লিখেছেন অতুলনীয় ভাষায়—

'ইংল্যান্ডে জ্ঞানগ্রহণ করায় এমন একজন যদি দেখে সেখানকার সমুদ্রতীর থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে প্রান্তরে 'olive complexion and bronze colored' হলেবা স্বচ্ছন্দে



ইংরেজিতে মহৎ সব বিষয় নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করছে তবে বিষয়ে হতবাক ও আতুর্কি হয় পরা যারা যান না।... প্রকৃতপক্ষে যে ধরনের দূত্বতা সে ত্যাগ করার সঙ্গে তারা দেশীয় রীতিনীতি সম্পর্কে তাদের বক্তব্য উপস্থাপিত করে এবং দুঃসাহসিক নির্দয়তা দেখ-বিশেষের বিখ্যাত গ্রন্থকার বা শাস্ত্রকারদের সমালোচনা করে সুদীর্ঘ পেশের (ইউরোপের) ছেলেরা তাকে অতিক্রম করা ওে দূরের কথা তার ভালো কাছেও আসতে পারবে না।<sup>১১</sup>

... ছাত্রদের বক্তৃতা ইংরেজি গ্রন্থকারদের উদ্ধৃতিতে ছাওয়া থাকত। 'যদি যদি ইতিহাস হত তবে রবাসিন এবং গিবন; রাজনীতি বিষয়ক হলে আলোচনা দ্বিধ এবং জেরেমি বেথাম; বিজ্ঞান হলে নিউটন এবং ভেরি; ধর্মসংক্রান্ত হলে হিউম এবং টমাস পেইন আর নীতিশাস্ত্র বিষয়ক হলে লক, রিড, স্টুয়ার্ট এবং ব্রাউন। আর তার মধ্যে অনবরত ঢুকে পড়ত আমাদের জনপ্রিয় কবিদের উদ্ধৃতি বিশেষ করে বারনাম এবং স্যার জোয়াইন্ট। তবে এখানকার আমাদের প্রকৃতিবৃত্তের অবসারণি হয়েছে বারনামের ক্ষুদ্র কবিতার ছন্দ।"<sup>১২</sup> কিন্তু সবচেয়ে যেটা উল্লেখযোগ্য সেটা হচ্ছে 'freedom with'—সমস্ত বিষয় স্বাধীনভাবে আলোচনা করা (the freedom with which all the subjects were discussed)<sup>১৩</sup>

ছাত্রদের বিতর্কের ধরন, গভীরতা, ব্যাপ্তি, পৈন্দ্য এবং প্রকৃতি ডাফের সাক্ষ্য দিয়ে তার আলোর মতো পেরে যায়। তবে ছাত্রদের সব ব্যাপারই যে উপাধন হয়েছিল তা নয়। ছাত্রদের কুসংস্কারবিরোধী বিতর্কের ডাক্তরিত্ব ভাষা ছিল তারা হিন্দুধর্ম বিরোধী হয়ে পড়েছে। সুতরাং তিনি পূর্বে আশাবাদি হয়েছিলেন তাদের খ্রিস্ট ধর্মে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে। সে ক্ষেত্রে তারা কিনা ইংরেজের সংস্কারবাদ পলায়নক্ষণ করছে, টমাস পেইনের 'এ অব রিজন্'—এর দিকে অগ্রিমুখ পড়নের মতো ধাবিত হয়েছে। তিনি লিখেছেন,

"হুই মুখে পড়েন মতো ঘটনা হাচ্ছে ছেলেরা হিউমের কলাম আর পেইনের 'এ অব রিজন্' কে তাদের বিজ্ঞা হিসেবে গ্রহণ করেছে। আর এগুলো প্রচুর পরিমাণে তাদের হাতে তুলে দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। প্রত্যেক এক নতুন শিক্ষিত-শ্রেণি মাথা তুলছে সম্ভ্রম পেয়েই ইউনিটেড স্টেটস অব আমেরিকার এক হস্তাক্ষর পুস্তক ব্যবসায়ী এইসব এই কলকাতায় পাঠাচ্ছে। এবং ব্যবসায়ীরা ইশ্বর মানে না, মানে শুধু রূপের ডলার। আলোচনার 'এ অব রিজন্' ছাড়াও এসেছে এক বইও সম্পূর্ণ পেইনের চর্যনর সত্তা আমেরিকান সম্ভ্রম যার মধ্যে রয়েছে 'রাইটস অব মান' এবং অন্যান্য রাজনৈতিক ও ধর্মবিষয়ক চর্যনা। আশ্চর্যের বিষয় এই যে সত্যের সন্ধানের সমীপেও সর্বদা পৌঁছানো যায়।"<sup>১৪</sup> ইত্যাদি।

মুক্তচিত্তক ডিরোজিও এবং ডিরোজিও-পন্থীদের সত্যাত্মকভাবে যা অত্যাশঙ্ক্য, খ্রিস্টধর্মনিরোধী কিন্তু রাজসভার ডাফের কাছে তা দেখানো নামাত্র। এটিই স্বাভাবিক। কিন্তু ডাফের এই আক্ষেপ থেকেও ডিরোজিও ও তাঁর ছাত্রদের জ্ঞানার্জনের ধন ও আগ্রহের প্রকৃতিটা টের পাওয়া যায়। ডিরোজিও সূচিত ও লালিত আকাজেডেমিক আলোচনায়শনের মতো বিতর্কভার সৌজন্যে তপন ছাত্রদের মুক্তিভার চর্চা হয়ে উঠেছিল নির্দিষ্ট ও বিপরীত।<sup>১৫</sup> তাদের কুসংস্কারবিরোধী ও যুক্তিবাদী জ্ঞানের চর্চা যেনম কলিত হয়ে পড়েছিলেন রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের নেতৃবৃন্দ ঠিক তেমনই মুখে পড়েছিলেন আলেকজান্ডার ডাফের মতো আরও খ্রিস্টধর্ম প্রচারক।<sup>১৬</sup> ধর্মীয় অপরিস্রাব সম্রাটে গেলে উভাপকই কিন্তু পড়ে উঠবে জানা কথা। তা বলে সত্য থেকে বেটা বিচ্যুত হওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের বলাতে পারতেন—

ও কটা দলিতে গেলে দুই দিকে মর্মলজী দলে  
ঝিকারিবে। তাহে ভা নাই  
এ পাপ আভালাখান উপাড়ি ফেলিব মূলিতলে  
জানিব আমরা দৌঁছে ভাই।<sup>১৭</sup>

এক দীপ থেকে শতকে দীপ জ্বলে ওঠে। আলোর উৎসমুখ খুলে গেলে তার কিস্কমাল্লা ছড়িয়ে পড়ে নানা স্থানে। কিংবা রিটন মির থিউ কলেজ ও ডিরোজিও সম্পর্কে লিখতে গিয়ে লিখেছিলেন, 'সত্য যা ছিল আবশ্য অপস্টতার দ্বারা ঢাকা তা তাকে উজ্জ্বল আলোয় এবং পড়েছে। সূর্যের আলো প্রথম কামরজজায়া চূড়ায় এসে লাগে— তার মানেই উজ্জ্বল আলো। এই আলো ক্রমশ সমতলে সৌঁছায় এবং গভীর উজ্জ্বলতা ও নিম্নাবস্থিত ধানভেতেও ছড়িয়ে পড়ে।"<sup>১৮</sup> 'আকাজেডেমিক আলোচনায়'—এর অনুরণণ ও জ্ঞানরূপে এরপর পণ এক বিতর্কভাষা প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল। আলেকজান্ডার ডাফ লিখেছেন,

"ওখ একটা বিতর্কসভা নয়। বেশ অনেকগুলো বিতর্কসভা শহর ছাড়া গলিয়ে উঠেছিল ('a great number of debating societies')। তৎকালীন বড় বাধা দেওয়া হত এসব সভা করতে বা এসব সভায় যেতে ততই তারা উৎসাহের সঙ্গে এগুলো সংগঠিত করত। প্রথমদিকে কিছু ইউরোপীয় ভ্রমস্রোত এ ব্যাপারে তাদের অনুপ্রাণিত করত। পরে যখন চিন্তা এবং অনুভূতি এবং জিজ্ঞাসা স্বরনর মতো উৎসারিত হয়ে গেল তখন তারা এনে নিজের নিজের পথ নিজেসাই করে নিলে— সে-পথ যত পাথুরে প্রতিদ্বন্দ্বতানুর্ঘণ্য হোক না কেন।"<sup>১৯</sup> ভাষে সে সময়ে একটি প্রতিকর বক্তব্য উদ্ধৃত করে লিখেছেন, 'ডাফ ও উৎসাহের অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে, বিশাল আকাশে এক ঝড়ের সঙ্গানো দেখা দিয়েছে, সে-ঝড় জ্ঞানের ঝড়; এই ঝড় থিওডোজি করে

অপসারিত করে দেবে সেইসব বাধাগুলিকে যা বর্ধন ধরে চিত্রের প্রবাহ রুদ্ধ করে রেখেছিল।"<sup>২০</sup> শহরের সমস্ত প্রান্তে এইসব সভা ম্রুত আত্মপ্রকাশ করল। এমন একটা সম্রাট ছিল না যেদিন একটা, দুটো এমনকী ততোধিক সভা না হত। এক একজন অনেকগুলো সভায় তাদের নাম নথিভুক্ত করে রাখত। আলোচনা এবং বিতর্ক তখন ওড় বাতিকের পর্যায়ে। তার ফলে ঘন ঘন অনুষ্ঠিত এইসব বিচিত্র প্রকারের সভা থেকে অল্পবয়সিদের অস্বাভাবিক পৃষ্ঠিনিলিত আত্মশ্রা দেখা দিত। আসলে এটা ছিল প্রথম বহিমুখ বিদ্যাপ্রকাশের স্বাভাবিক ক্রিয়া।<sup>২১</sup> এমন সম্রাট এবং প্রত্যক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বতানুর্ঘণ্য ডাফের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। কিন্তু 'valiant soldier of the cross' হিসাবে নিজেকে যিনি অভিযাত্রা করতেন তিনি কোথাক ও ভুল করেও ডিরোজিওর নামোচ্চারণ করেননি। 'প্রথমদিকে কিছু ইউরোপীয় ভ্রমস্রোত এ ব্যাপারে তাদের অনুপ্রাণিত করতেন' বলে যেমনমুঠে সেপে লেখেন ডিরোজিওর সত্য ভূমিকার কথা। বোঝা যায় যাক-কতলাক তাকে কী পরিমাণ অপরূপ করতেন। ডিরোজিওর উৎসাহ ফসলের দিকে (শিক্ষিত চর্যনদের দিকে) লোলুপ দৃষ্টিতে যিনি তাকিয়ে ছিলেন তাঁর পক্ষে ফসলের প্রকৃত মালিকের অনুমোদনই বাক্যে স্বাভাবিক। কিন্তু কী অনবদ্য ভাষাতে তিনি ছাত্রদের স্বাধীন স্বচ্ছন্দ বিকাশের ছবিত্য এঁকে দিয়েছেন— 'পরে যখন চিন্তা এবং অনুভূতি এবং জিজ্ঞাসা স্বরনর মতো উৎসারিত হয়ে গেল তখন তারা যেন নিজের নিজের পথ নিজেসাই তৈরি করে নিলে।"<sup>২২</sup> পারিচয় লিখাছিলেন, 'তিনি ছাত্রদের এটাই শিক্ষণীয় প্রত্যেককেই নির্দেশ দিয়েছিলেন নিজে চিন্তা করে নিজে সিদ্ধান্ত নেওয়া। অন্ধভাবে কাউকে অনুসরণ না করা।"<sup>২৩</sup> এই স্বাধীনতার শিক্ষা বুঝা যায়নি। তারা যে নিজের নিজের পথ নিজেসাই তৈরি করে নিলে নিজেসাই তাদের সাক্ষ্যে তা প্রমাণিত।

#### গুরুবাদের সম্বন্ধে পরিচয়

গুরু ব্রহ্মা, ওহ যমি ও গুরুদেব মহেশ্বরের দেশে অমৃত্যু এবং জিজ্ঞাসা যা ঘটত 'তিনি' স্থলে দার্শনিক কবিরামর বালকপিতা তঁাহাকে চারিদিক ঘিরিত।<sup>২৪</sup> এই মোহমুগ্ধ গুরু নগরভ্রমণ করে কাটিয়ে তোলায় ভরা ডিরোজিও-ও প্রকল সন্তোষ করতে হয়েছিল সম্রাটে নেই। তার ইতিমধ্যে শিবনাথ শাস্ত্রীর লেখা— 'তঁাহার কাণোপকথনের এই রীতি ছিল যে, তিনি একজন অলম্বন করিয়া বালকলিঙ্গে অপরূপ অলম্বন করিতঃ উৎসাহিত করিতেন: এবং স্বাধীনভাবে তর্ক-বিতর্ক করিতে দিতেন।"<sup>২৫</sup> রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা'তে প্রজ্ঞা খেপোনা এক গুরুর কথা আছে তার নাম ধর্মদাস। তার নেতৃত্বে মুগ্ধ ছাত্র শিবনারায়ণ এর গুরুবাদের— 'তোমাকেই আমরা যমি, কথা তোমার নাই বা পুণ্যবান।' উত্তরে ধর্মদাস বলে— 'তাই ইতিমধ্যে সর্বদা হয়েছ।'

অল্প গুরুবাদের বিপন্ন ধর্মগুরুর মানসসম্বন্ধে যে ছবি রবীন্দ্রনাথ এঁকেছেন তা কি ডিরোজিও-কেও মোহমুগ্ধ করতেন হাননি? ধর্মদাস এক সময় বলেছে— 'তোরা আমাকে যত ভক্তিবে ধর্মসি তোদের সীতার শেখা ততই পেছিয়ে যাচ্ছে। আমারও পার হওয়া দায় হল।"<sup>২৬</sup> শিবনারায়ণের গুরুমুগ্ধ প্রকাশের হয়ে গেলেন বালকলি, 'আমাদের সকলের জোর একা প্রেমাই যমি।' উত্তরে ধর্মদাস বলে, 'তবে আমার হার হয়েছে।'<sup>২৭</sup> আমাকে পেয়ে আমাকে কোঁড়াবি।' এক সম্রাটের ছবি মেমোভাবের কারণে নয় না পড়লেও ডিরোজিও 'বিতর্কসভা'র আসরে বুদ্ধিত তরবারি খেলা দিয়ে সুপ্রসিকৃতিত ভাবে ছাত্রদের এ দেশীয় গুরুবাদের প্রকৃৎ ছেনন করে তাদের স্বাধীন, স্বতন্ত্র করে দিতে পেরেছিলেন। তাদের সকল 'কিছু'কে সরিয়ে ধর্মগুরুর মতো অবশ্যই করতে পেরেছিলেন— 'কিন্তু কী রে। একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে যা, উপরে হওয়া তুলে।"<sup>২৮</sup> ফলে তার ছাত্রেরা যে নিজের নিজের পথ নিজেসাই তৈরি করে নিতে পেরেছিল— সে প্রমাণ অস্বত্ব নয়। শিক্ষক ডিরোজিওর সাফল্যের কথা বিচার করতে গেলে গুরুবাদের এই সম্রাটজয়ের কথাও 'স্বরসে রাখা দরকার।

#### কলকাতা ছুড়ে বিদ্রমসভা

'ইতিয়া গেজট'—এ সে সমস্কারক বিতর্কসভা-সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন ছাপা হয়েছিল। তা পুনর্মুদ্রিত হয় 'তন বুলা' পত্রিকায়। তাকে আলেকজান্ডার ডাফের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সর্ম্মন হয়ে। অতিরিক্ত যা রয়েছে তা হচ্ছে সেই বিতর্কসভার ক্ষেত্রে ডিরোজিও-র প্রত্যক্ষ ভূমিকার কথা, ডাফ যা ইচ্ছাকৃতভাবে সেপে লেখেন। প্রতিবেদনটি এইরকম— "অল্প সময়ের মধ্যে কলকাতা ছুড়ে আত্মপ্রকাশ করেছে অনেক বিদ্রমসভা। এগুলির মধ্যে প্রথমতঃ হিন্দুকলেজের নেতৃমুদায়ী প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রসাই সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। এছাড়া মূল সেসাইটিস ইংরাজি স্কুল এবং রামমোহন রায়ের সেমিনারি হিসাবে পরিচিত স্কুলের ছাত্রেরও আছে। অমৃত সাতটা এই ধরনের আলোচনায়শন এখন রয়েছে যেখানে ইংরেজি ভাষায় চলে সভার কাজকর্ম। সেগুলি অধিকাংশই সপ্তাহে একদিন, কোন কোনগুটি তার চেয়ে বেশিদিন অন্তর অনুষ্ঠিত হয়— এসব সভা সাহিত্য এবং বিজ্ঞান বিষয় আলোচনার জন্য এবং কখনও কখনও রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। এক একটা সভার সমস্যা সংখ্যা ১৭ থেকে ৫০। কিছু সভায় লিঙ্গিও প্রব্রহ উপস্থাপিত হয় এবং সেটাই হয় ওঠে আলোচনা বিষয়। এই ধরনের কোনও একটি বৌদ্ধিক বিষয় নিয়ে সভার সমস্যা একের পর এক এসতে থাকে। এই সভার সভাপতি একজন পার্শ্বম ইন্ডিয়ান ভ্রমস্রোত। যিনি ইতিমধ্যে তাঁর বক্তৃতার কারণে ও চিত্তবিস্তারী কিছু কবিতা রচনায় সৌন্দর্য্যজনক পরিচিতি লাভ করেছেন। তাঁর



কৃত্বিত্ব সম্পর্কে আরও কিছু না বললে তাঁর প্রতি সুবিচার করা হবে না। তিনি শিক্ষক হিসাবে তাঁর দায়িত্বসূচ পালন করেই কাজ হেন না। তিনি 'মুসলিম জ্ঞান' নির্ধারণিত সময়েই বাইরেরও ছাত্রদের জন্য তাঁর পরিষেবা ও প্রতিভা উৎসর্গ করেছেন। আরও বলবার আছে যে যে যারা তাঁর প্রত্যক্ষ ছাত্র শুধু তাদের উদ্ভিতির জন্য না তাঁর সম্পর্কে এসে পড়া অন্যান্য দেশীয় তরুণদের জন্যও তিনি তা করে থাকেন। তিনি একটি সভার সভাপতি থাকলেও অন্যান্য সভার সদস্যও সঙ্গত হিসাবে মুক্ত। সাক্ষেপে বলতে গেলে দেশীয় যুবকদের বৌদ্ধিক বিকাশের প্রয়োজনে তিনি তাঁর যোগ্যতাপূর্ণ সক্রিয় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। অনেক তরুণ তাঁর কাছে শিক্ষা ও উপদেশের সুযোগ পেয়ে দেশের স্বাধীনতাশ্রমীত যোগ্যতার উৎকর্ষ ঘটতে পেরেছে। যুব সম্প্রতি তিনি মুসলিমসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত পটলডাঙা সুলে নীতিধর্ম (মোটফিল্ড) নিয়ে ধারাবাহিক সাক্ষাৎকৃত্য দিতে শুরু করেছেন। এটি ভাষ্য প্রায় ১৫০ জন শ্রোতা উপস্থিত থাকেন। কেননা (হিন্দু কলেজের) পরিচালকমণ্ডলী অন্তর্ভুক্তভাবে তাঁকে কলেজ কলেজ এঁকে ধরনের বক্তৃতা দিতে নিষেধ করেছেন। ইংরাজিতে এঁর ধরনের সভার দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হয়ে বাংলা ভাষাতেও বিভিন্ন বিষয় আলোচনার জন্য দু'দিনী সভা গড়ে উঠেছে।<sup>১২৩</sup>

### পটলডাঙা সুলে বক্তৃতা

পটলডাঙা সুলে নীতিধর্ম নিয়ে ডিগেটিভের ধারাবাহিক সাক্ষাৎকৃত্যর ব্যাপারটি প্রথিমানেগো। ডিগেটিভের এই কৃতী প্রাক্তন ছাত্র তখন হোয়ারের পটলডাঙা সুলের শিক্ষক। তাঁরা হলেন কৃষ্যমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও রসিককৃষ্ণ মলিক। কোনও সময়ে সেই তাঁরই উদ্যোগে এই ধারাবাহিক বক্তৃতার আয়োজন। শ্রোতাদের সকলেই ডিগেটিভের ওপমুখ প্রাক্তন ছাত্র এমন নয়। সেক্ষেপে পরিচালন সমিতিতে নিযোজিতা অন্যান্য বক্তৃতা সময়ে ছাত্রও যে সক্রিয়-চুরিয়ে সে সভায় উপস্থিত থাকত, তাতে সম্ভব নেই। হিন্দু কলেজ ছাড়াও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদেরও আসা সম্ভব। কিছু বয়স্ক ও প্রবীণ প্রগতিশীল মানুষও সে সভায় আসতে পারেন। কিন্তু 'সে'দেড়ক নিয়মিত শ্রোতাদের তালিকাতে তরুণরাই সংখ্যায় বেশি থাকত তাতে সম্ভব নেই। কেননা গৌড়া ব্রিটিশন পরিচালক 'ক্যালকাটা কুরিয়র' ডিগেটিভের বিরুদ্ধে একবার নিষেধাদান করতে গিয়ে লিখিছিল, 'কে আর মনে করতে না পারে হোয়ারের সুল থেকে মোটফিল্ড নিয়ে ডিগেটিভের বক্তৃতা শুনে গায় প্রতি রাতে ছাত্রের যে সব দুর্ভাব করতে করতে ফিরে? কে আর অধীকার করতে যে উদ্ভিত সেইসব ছোকরারা ডিগেটিভের আস্কার পেয়ে খোদ ইশ্বরের অস্তিত্বই স্বীকার করত না...'।<sup>১২৪</sup> the rising youth then denied

the existence of God himself."<sup>১২৫</sup> রক্ষণশীল ব্রিটিশদী পরিকার গৌড়া প্রতিবেদকের বক্তব্য থেকে নিম্না ও কোভটকু সময়ে নিয়ে যে সার তথ্যটিসূচ পাওয়া তা হচ্ছে দেশীয় ছাত্রদের মনে থেকে মুছে দেওয়া ধর্মবিশ্বাসের শূন্যস্থানে ডিগেটিভ ও বিকল্প কোনও ধর্মবিশ্বাসের স্বীকৃতি বপন করলেন। পরিবর্তে তিনি 'opinions and writings of the whole host of modern free thinkers'<sup>১২৬</sup> দিয়ে যুগিয়ে দিচ্ছিলেন তাদের মনে। এবং মৃত্যুত এঁর জন্য তাঁর ধারাবাহিক সাক্ষাৎকৃত্য দান এবং এটাই ব্রিটিশদী গৌড়া প্রতিবেদকের রিপোর্টের অন্য। শ্রেনিকসেবক বা পাঠ্যক্রম ও কুটিনের বাধ্যবাধকতা ছিল না তবু ছাত্ররা দলে দলে বাধানিষেধ ও নিষাদ পাহাড় ডিগেটিভ এসে ভিড় করত ছাঁটাই হয়ে যাওয়া এক শিক্ষকের বক্তৃতার সাক্ষাৎসরে। কিসের চানে? আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। কিশোরীদাস মিত্র একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন, 'ডিগেটিভ ও একটা মনে তৈরিক বিশ্বব্রত করে গেছেন। তাকে কি কলেজের মানেজারবোর্ড পৃথিবীর আর্কটন বিষয়ে আজ্ঞাধার্যক রোমের পাদ্রীসের মতো বন্ধ করতে পারেন? সারা দেশে ছুড়ে তা গঙ্গার মতোই সমুদ্রের দিকে বয়ে চলেছে সত্য এবং ধর্মের প্রতিহিত বাধীনের'।<sup>১২৭</sup> আবেগময় হলো এ বক্তব্যে সারবন্ধ ছিল। 'মুক্তধারা'র ধনঞ্জয় বলেছিল, 'পড়বে দেয়াল, ভাঙবে দরজা, আলো ছুটে বের হয়ে আসবে—সমস্ত প্রকাশ হয়ে পড়বে'<sup>১২৮</sup> তাই ডিগেটিভকে কর্মমাত্ত করে নিমন্ত করা যায়নি। কঠোর নিযোজিতা জারি করে তরুণদের ধামানো যায়নি। আলো সত্যিই ছুটে বের হয়ে এসেছিল।

### উলস্টনের সাক্ষাৎ

হিন্দু কলেজের অধুনাবিদ্যার শিক্ষক ছিলেন ডাবলু এম উলস্টন। 'ক্রেডেন্স অব হিন্দু ইয়ুথ' নামক একটি 'মুতিচালকমূলক' লেখায় হিন্দু কলেজের ছাত্রদের রীতিপ্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। অত্যন্ত চিত্তকর্ষক তাঁর প্রতিবেদন।<sup>১২৯</sup> তিনি নিজে ডিগেটিভ বিবর্তকসভার সভাপতি ছিলেন যেটা অন্তর্ভুক্ত হতে জটিল বাবুর (B—S) বাড়িতে। লিখেছেন, 'যে কলেজ আমার মিলিত হতাম সেটা বেশ বড়সেড়া এবং লম্বাট, ফালির মতো। শৌখিনদের অনেকের বাড়িতেই এরকম থাকত। মাঝখানে ফাঁকা জায়গা। এক প্রান্তে একটা টেবিল সভাপতি ও সম্পাদকদের জন্য। অন্য প্রান্তে একটা ছোট সলংঘর ঘর যেখানে বাবুর বস্তুরা একান্তে গল্পওভর করে। একদিনের বিবর্তকের বিষয় ছিল— "দামদ্ব এবং কুতুম্ব মধ্য কনোটি শ্রেয়?" রাধানাথ শিকদার, রসিককৃষ্ণ মলিক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ছিল। বিবর্তকসভার পাণ্ডায়া নাগো। পাণ্ডায়া নাগোয় পর কিছুক্ষণ চলে দাম ও 'ব্যাকম্যান' (baggaman) খেলা' লিখেছেন, 'একদিনের কথা। মিটিং স্থগিত হওয়ার পর ছোট ঘরে প্রবেশ করলাম। একটা গোলাকার

টেবিল, তার ওপর বিভিন্ন জায়গায় রাখা আছে বিভিন্ন রকমের ফল এবং মিষ্ট। এছাড়া পর্যাপ্ত কাটি মাখন বিয়ার এবং প্রান্তি। বাড়ির কথা বুঝে পাঁড়াপাঁড়ি করলেন যাতে আমি টেবিলে রাখা খাবারের অর্ধেকও গ্রহণ করি। আমি কিছু লেবু, সবরকমের মিষ্ট থেকে একটা, দুটো এবং একটা দুধধারার টেস্ট নিয়ে আহার শেষ করলাম। "এমন একদিন হরমোহন যোগ্য (হারড?) একটি রমনা পাঠ করল হিন্দু বিশ্বাসের রীতিনীতি নিয়ে। চিত্তার এমন মুক্ত ও সাহসী প্রশ্ন আমি দেবিনি। অনার্যও স্বাধীন ও স্বচ্ছ ভাষায় আলোচনায় অংশগ্রহণ করল।"

উলস্টনের এই বিবরণ থেকে দেখা যাচ্ছে ধর্মীয় বাগান বাড়ির অবকাশযাপন ও আহারাদির সংস্কৃতির সঙ্গে নবোদ্ভূত বিবর্তকসভার আগ্রহে সংযুক্তি মিলে যাচ্ছিল কোথাও কোথাও। উলস্টন বিবর্তকসভা কোন বাবুর বাগানবাড়িতে হত তা স্পষ্ট নয়। তত্পর আপ্যায়নের বহর দেখে বোঝাই যায় ডিগেটিভ-র ইয়াদেবল সংস্কৃতি বাবুদের বাগানবাড়িতেও চুকে পড়ছিল। উলস্টন তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছেন, হিন্দুরা ইউরোপীয়দের সমতুল্য, তাদের 'মুতিশক্তি চমৎকার, যুব চটপট তারা বিদ্যা অধিগত করতে পারেন। প্রথমদিকে তারা ভায়রন প্রতিকূলতার মধ্যে পড়লেও তিনি আশা প্রকাশ করেননি অবিলম্বে তারা এসব বাধা অতিক্রম করতে পারবে এবং লিখেছেন, 'আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই এইভাবে জানচর্চা ও অবকাশ্য যদি তারা চালিয়ে যেতে পারে তবে তারা সম্পূর্ণ মার্জিত, পরিণীত ও সুপরিণত যাকে বলে 'perfect courtier' হয়ে উঠবে।'<sup>১৩০</sup>

### বিবর্তক কী নিয়ে?

টিক কী কী নিয়ে আলোচনা, বক্তৃতা ও বিবর্তক চলত হিন্দু কলেজ conversation-এ, শ্রীকৃষ্ণ সিংয়ের বাগানবাড়িতে আলােকমিক আসোনিয়শনে বা অন্যান্য ডিগেটিভ সেসাইটি ও বক্তৃতাভাড়া তার হিমলি পণ্ডায়া আজ প্রায় অসম্ভব। উত্থাপন ও আলোচকের নামমাত্র দু'চারটি বিবর্তকের বিষয় কোনও বিশেষ্টে বা কারও কারও 'মুতিচালক'ই এসেছে তাতে ব্যাপারটা সম্পর্কে সামান্য কিছু অভাস পাওয়া যায় এইমাত্র। হিন্দু কলেজের ছাত্ররা অংশগ্রহণ করেছে এমন বিবর্তক অভ্যুত। এসব বিবর্তক হয়েছে নানা জায়গায়—গ্রামে, বার্ষিক পরীক্ষা উৎসবে, গ্রাম-বর্জিত সাক্ষাৎ আলোচনাসভায়, আলােকমিক আসোনিয়শনে ও অন্যান্য বিবর্তক সভায়। কলেজে বার্ষিক পরীক্ষা উৎসবে ছাত্ররা যেসব বিষয়ে বিবর্তক করেছে গুলি জানা গেছে সেগুলি এইরকম—<sup>১৩১</sup>

- উত্তরাংশ অন্তরীণ হলে নীপথ আখিরের ফলে ইউরোপ ও এশিয়ায় কী কী সুবিধা হয়েছে?

- ব্যক্তিগত সুখ না সামাজিক সমৃদ্ধি— কোনটিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত?
- গ্রিস দেশের নগররষ্ট্র পরিচালনার জন্য গ্রহণীয় শাসনব্যবস্থা কী ধরনের হওয়া উচিত?
- রোমানদের সাম্রাজ্য বিস্তারের ব্রিটনের লাভ হয়েছিল? ক্ষতি হয়েছিল?
- শিশুগণ উপযোগিতা কী?
- রাজতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ?
- প্রাণীহত্যা কি নীতি-সম্মত?
- মানুষের সংস্কৃতি কে টিকমতো নির্ণয় করে? দুর্ভাগ্য না নীতিভাগ?
- কোন বিবাহবিধি প্রকৃষ্ট? ইউরোপীয় না হিন্দু বিবাহ প্রকৃষ্ট?
- বিজ্ঞান অনুশীলন অপেক্ষা ভদ্র সাহিত্য-অনুশীলন ব্যক্তিবিশেষ, জাতিবিশেষের কাছে অধিকতর সুখকর, হিতকর ও সমাজজনক নয়।

'ব্যক্তিগত সুখ না সামাজিক সমৃদ্ধি— কোনটিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত?— বিবর্তক গদ্যাগোবিন্দ নামক এক ছাত্র বলেছিলেন, 'আমি সমাজকল্যাণমূলক কাজকেই শ্রেয় মনে করি কেননা সমাজের বেশি সংখ্যক মানুষের জন্য সর্বোচ্চ কল্যাণমূলক কাজ করা যায়, পারিবারিক ব্যাপারে বেশি মনোযোগী হলে তা করা যাবে না।'<sup>১৩২</sup>

বাইরের বিবর্তকসভার প্রত্যেক সাক্ষাৎ আলেকজান্ডার গুফ লিখেছেন—নারীশিক্ষার যৌক্তিকতা নিয়ে একটি আলোচনায় হরচন্দ্র যোগ্য বলেছিলেন, 'নারীশিক্ষা কি আমাদের শায়ে নিষিদ্ধ নয়? ন্যায় এবং মুক্তির ধারা অনুমোদিত নয় এমন অনুশাসন যদি শাস্ত্রের থাকে তবে সেই শাস্ত্রকে আমি অগ্রাহ্য করি।'<sup>১৩৩</sup> ভালুক এবং উলস্টন একদিনের একটি বিবর্তকসভার 'মুতিচালক' করতে গিয়ে লিখেছেন, 'দামদ্ব এবং মুক্তার মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ? এ বিষয়ে রামানথ শিকদার উঠে বলেছিলেন— "দামদ্ব প্রকারও কিছু সুফল আছে। যেমন ব্রিটনের রোমকদের স্বৈরশাসন থেকে বহু হিতকর শিক্ষকতা ও বিজ্ঞান জেনেছি।" রসিককৃষ্ণ বলেছিলেন— "হিন্দুরা" আজ হযত দাস। হিন্দুরা আজ শূন্যভাষনেব অত্যচারিত। একদিন আসবে যেদিন তারা শেকল খুঁড়তে ফেলবে।"

হরমোহন চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, অধিকাংশ বিবর্তকসভায় হিন্দু সমাজের হীন অবস্থা নিয়ে আলোচনা হত। হিন্দুদের বর্তমান বিবর্তকসভার জন্য দাবী করা হত অজ্ঞতা ও অসংসার আত্মতাকে। উদারতাবৃত্ত জ্ঞান ছাড়া এই দুর্বলতার অবদান



ঘটা সম্ভব নয়।" তিনি লিখেছেন, একদিনের সভা সর্বসম্মত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যে নারীদের অধিকাংশ লেখাপড়া শেখাতে হবে।<sup>১০</sup> আলেকজান্ডার ডাফ লিখেছেন, "সাধারণভাবে আলোচনার মূল সূত্র ছিল গ্রন্থিত ধর্মীয় বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। আ্যাকাডেমির নবীন সিংহরা এই বলে গর্জন করত হিন্দুধর্ম গোমায় যাক, গৌড়ানি নিপাত যাক।"<sup>১১</sup> নৃত্তি এবং নায় শাসিত বিতর্কসভা ডাফের চোখে বিতর্ক হিন্দুধর্ম বিরোধী সভা হিসাবে দেখা দিয়েছিল। যদিও ছাত্ররা টম পেন্ডনের "এজ অব রিজন্স" বা হিউমের সংশয়বাদী দর্শনের পাঠ নিচ্ছে বলে তিনি মুগ্ধ পড়েছিলেন। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজপতিরা ইয়ংমেন্সদের সম্পর্কে যে মূল্যায়ন করেছিলেন তা খ্রিস্টধর্ম প্রচারক ডাফের থেকে অনারকম কিছু ছিল না। রাধাকান্ত দেবরাও তাদের হিন্দুধর্ম বিরোধী বলেই চিহ্নিত করেছিলেন।

### তথ্যসূত্র

১. শিবকাম শাস্ত্রী : রায়চৌধুরী ও তৎকালীন কলকাতা, ১৯৫৭ খ্রি পৃ ৮৫
  ২. T. Edwards : Henry Derazio, the Eurasian Poet, Teacher and Journalist, Riddhi edition, 1980 pp66-67
  ৩. Song of the Stormy Petrel (Complete works of H.L.V. Derazio), Ed by A.M., A.D., A.K. S.S.M.: DCC & Progressive Publications, Correspondences, Removal of Derazio, pp. 328-332
  ৪. দ্বিতীয় উল্লেখ ১
  ৫. P.C. Mitra, A Biographical Sketch of David Har, Jignasa edition, 1977 (অনুবাদ লেখকের)
  ৬. হিন্দু স্বদেশ জাগরণের ৫,০০০ টকা বা তার বেশি টকা চলে দিয়েছিলেন যারা টাকা 'প্রিন্সিপাল কলভার' হিসাবে পণ্য হন। সেই সূত্রে জায়কুমার বৈষ্ণব প্রতিষ্ঠাতা সমগ্র হয়েছিলেন। তাঁদের বংশগণিতিক—
- | পারিবার (১৯২২-৭৮) |                      |                             |
|-------------------|----------------------|-----------------------------|
| অনুপকুমার         | জয়কুমার (১৭৭০-১৮২০) |                             |
| রাজকুমার নবকুমার  | গোপালকুমার           | শ্রীকুমার নন্দলাল (১৮১৯-৪৪) |
|                   |                      | কলীপ্রসাদ (১৮৪০-৭০)         |
৭. P.C. Mitra, Ibid, p. 161
  ৮. ১৮২৯ সালে আলেকজান্ডার ডাফ ধর্মযাজক পুত্রিগ্রহণ করে, 'চার অব স্বদেশান্তরে'র শব্দে ভারতবর্ষে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর একান্ত ইচ্ছা, 'that I may be enabled to approve myself a good and a valiant soldier of the Cross, and not merely a common soldier but a champion—' George Smith, Life of Alexander Duff, PT.I, 1879, p. 55; অলোক বাস,

রক্ষণশীল হিন্দু সমাজপতিদের 'ধর্মসভা'র ঠিক বিপরীত প্রকল্পে আত্মপ্রকাশ করেছিল ডিরোজিও পরিচালিত আ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন। হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালকবর্গ ছিলেন 'ধর্মসভা'র উদ্যোক্তা, সংগঠক ও সদস্য। আর হিন্দু কলেজের শিক্ষক ডিরোজিও ও তাঁর তরুণ ছাত্ররা ছিলেন আ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোক্তা, সংগঠক ও উৎসাহী সদস্য। 'ধর্মসভা' ও 'আ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন'র মধ্যে যে সম্ভাব্য অনিবার্য হয়ে উঠেছিল তা আসলে রক্ষণশীলতার সঙ্গে প্রগতিশীলতারই দ্বন্দ্ব। 'ধর্মসভা' ছিল প্রাচীন পন্থী সংস্কৃতির মুখপাত্র। আর 'আ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' হয়ে উঠল 'নব্যবদন' বা ইয়ংমেন্সদের মানসিক ব্যায়ামাগার। এই দুয়ের সামাজিক সম্ভাব্যতারই অনিবার্য পরিণতি ডিরোজিওর কর্মচ্যুতি।

৯. আলেকজান্ডার ডাফ ও অনুপমা কয়েকজন, প্যারিস, ১৯৮০, পৃ ৩
১০. A Duff, India and Indian Mission, including Sketches of the gigantic system of Hinduism, Edinburgh, 1839, Delhi edition 1988, p. 638
১১. 'Their theory was that as professing enquiries after truth, they ought not to do violence to anyone's conscience by constraining him to argue against his own settled convictions'—A. Duff, Ibid: উল্লেখ স. উম্মে, তবলে, পৃ ৭১ (অনুবাদ সুরেশচন্দ্র মৈত্রয়)
১২. A Duff, Ibid, pp. 638-639 (লেখকবৃত্ত অনুবাদ)
১৩. A. Duff, Ibid, (লেখকবৃত্ত অনুবাদ)
১৪. A. Duff, Ibid, pp. 640-641
১৫. ১৯৩৭ সালের ৬ মার্চ মুন্সিফ মিউডেস ফোজারশেনের একটি দল পার্লামেন্টে অনুষ্ঠিত করি সনে কথা করত এনে করি হাজার একটি কবিতা নিয়ে উদ্ভার দেন। কাজী কিলিশিং। উদ্যোগ মুন্সিফ মজিউলীন বিদ্যা, রবীন্দ্র চন্দ্রদাস মুন্সিফ সমাজ, ১৯৯০, পৃ ৩০৭, প্রতিপদন মুদ্রণাগার, 'ইস্টার্ন রেনেসাঁসের আলোকে বাংলা রেনেসাঁস', প্রকাশিত পাবলিশিং, ২০০০, পৃ ৩০১
১৬. P.C. Mitra, Ibid, Appendix-B: 'The Hindu College and its Founder', Kishory Chind Mitra, p. 150-151 (অনুবাদ লেখকের)
১৭. A. Duff, Ibid, p. 638 (অনুবাদ লেখকের)
১৮. 'The night of desolation and ignorance is beginning to change its black aspect, and the sky, big with fate, is about to bring forth a storm of knowledge, which will scatter and sweep those airy battlements away from so long imprisoned the tide of thought—' Quoted A. Duff, Ibid, p. 638 (লেখকবৃত্ত অনুবাদ)
১৯. A. Duff, Ibid, p. 638 (অনুবাদ লেখকের)

### ছোটগল্প

## কেন্দ্রানুকূলে

### সূত্র্য যোষাল

আমার কাছে কেউ গল্প চাইলে সত্যি বলছি বেশ ভয় করে এখন। তার কারণ একটাই। কাকে গল্প বলে এই ব্যাপারটা নিয়ে যত দিন যাচ্ছে ততই জমতে থাকছে সংশয় এবং মুচুতা যুগপৎ, আমার মনে এবং আমার মননেও। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভাল বিজ্ঞের হাসির যতই মূল্য থাক, যতই প্রভাবিত প্রচারক দিকে দিকে, তা নিয়ে আমার তেমন কোনও আশঙ্কা নেই কোনও কালেও। কোনও কোনও বিজ্ঞতার চাপে পড়ে জীবনানন্দের কবিতা বেঁচে গেলেও তাঁর গল্পের নান্দ্যমান উঠেছে। তিনি বড় কবি, কিন্তু তিনি ছোটগল্পকার হিসেবে আদ্যন্ত ছোট— এমন কথা ফলাও করে বলার মতো বিজ্ঞজনের অভাব ঘটেনি আমার কোনও ভয় নেই, বরং কৌতুকবোধ আছে কোনও কোনও বারাদার। কালে বসে। আমার ভয়টা নিজেদের নিয়েই আশান্বিত। আরও একটু বুঝিয়ে বলি, বিজ্ঞের হাসিকে নয়, আমি ভয় পাই অজ্ঞের বাঁশিকে। যে কিছুই জানে না, যার কাছে রাগান্বিতাংশীল শিশু নেই, একবারেই, সে যে কখন কোন প্রশ্নের কি সুরে রাডিয়ে তুলতে চাইবে সেটা নিয়েই আমার দৃষ্টিভঙ্গি সবচেয়ে বেশি। আরও একটা ব্যাপার নিয়ে আমি যে অসন্তোষিত সে কথাটা এই সুযোগে প্রকাশ করে না ফেলতে পারলে ক্ষেত্র কণার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকতে হবে কতদিনের জন্য তাও বলা সম্ভব নয় চট করে। তাই কথাটা বলেই ফেলি নিজেকে গুনিয়ে এবং পরিবারের কার ঠিক এমন মুহুর্তে যখন শীত দিয়ার নিচ্ছে সবচেয়ে আরোগ্যবান হয়ে উঠে আসার-অপেক্ষায় আর ধাঁড়িয়ে না থেকে শয্যাশাপ্য থেকে নির্ঘাত। আমি ভেবেচিন্তে এই মুহুর্তকে প্রকাশের পরিমলক করে নিতে চাইছি। কারণ বসন্ত একবারে দাঁড়িয়ে পড়লে আমার কথার মধ্যেও এসে পড়তে পারে নতুন নতুন পাতার দোলা। তাতে শেষ পর্যন্ত কোনও লাভ হবে না কিন্তু। কেন্দ্রান্তিগে হয়ে বুকেছি কেন্দ্রান্তিগে হওয়ার কত সুখের মর্মে মর্মে।

আমার সংশয় এবং আমার মুচুতা যে দ্বিতীয় ক্ষেত্রটি নিয়ে সেটা হল অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র। কতগুণি অভিজ্ঞ হলে একটা গল্প

লেখার মতো কাজে হাত দেওয়া যায় এটা নির্ণয় করে উঠতে গিয়ে যে কোনও দৃষ্টান্তেই আমাকে হিমসিম খেয়ে যেতে হয়। শীত ও বসন্তের দুর্বলস্পর্কের এই আত্মীয়তার দিনেও নির্ণয়ের কাজটা যে বিদ্যমান লম্বু হতে পেরেছে একথা ভাবার মতো মিথ্যা আর কিছু হতে পারে না। আমি দেখেছি মূল সমস্যা কখন না কখনও। তা কেবল আমার পালটায় এক আধার থেকে আর এক আধারে আশ্রয় নিতে পারার সুযোগে। এই যে ঘরে একটা টেবিলের সামনে বসে একটা দিকে তাকিয়ে ভাবনামাখি হয়ে চাইছি, এর মধ্যে নতুন কোনও ভূমিকা তো জন্ম নিতে পারছে না কোথাও। সত্যিই ঘরে বসে থেকে কেবল উত্তর দিকে দৃষ্টি রেখে এমন কিছুই কি লেখা যায় যা পড়ে মানুষ বলে, হ্যাঁ, নৈম পড়ে উঠলো? উত্তর তো একটা মহামৌনের দিক। সেই দিকে তৃপ্ততার সঙ্গে নীরবতা নিয়ে, উত্তরতার সঙ্গে উৎসর্জন মিলে নিদ্রণ ও বিরহের এমন এমন প্রতিমা তৈরি করতে যে তলি দেখে অন্য হয়ে কিছু লিখতে গেলে যাত্রী হতে হয় চিরকাল। কত শব্দও কথার খিরে কত মাতৃভাষার জন্ম হচ্ছে। আর এই সবার মাতৃভাষার জোরে কেউ কেউ কখনও কখনও সত্যিই লিখে ফেলেছেন এমন সব কাহিনি যেগুলো স্বচক্ষে দেখা এবং ছন্দের সাহায্যে কখনও কখনও গল্পের বুলে নেওয়া যায় বেশ। উত্তর দিকের কথা বারই দিলাম না হয়। আরও তো কত দিক আছে এই নিপাতিত্রে। কাঁধে ব্যাগ বুলিয়ে কত মানুষ তো নিয়ম মেনে নানা সপ্তাহে কিংবা বিভিন্ন ক্ষুদ্রতর বেরিয়ে পড়ে ইহইউ করি। আর কত সাফল্যমণ্ডিত হয় সেই সব নির্ঘমন। কত রবিবারের থানায় এসে পড়ে এমন এমন গল্প যেগুলোর মুক্তা বোঝা, ষড় আছে, আর আছে জ্বিলে জ্বল আনার মতো স্বাদ। যার কোনও দোলাচল নেই, যে ট্রেনে চাপে এক সময় কৃষিকোরে ছড়িয়ে পড়তে পারে না, কিংবা যে সন্দের উড়ানে চাপে কোনও এক কালের মহানগরের মতো ভূপ কণ করে পড়ে ছাড়া রাখতে পারে না



কেনও অপেক্ষাকৃত নীলনয়নার ঘাড়ের, তার গমের সতিই কি কোনও অপেক্ষা থাকতে পারে কোথাও? এই প্রশ্নের মুখোমুখি হইলেও আশাঙ্কল কেঁপে উঠি একেবারে গোলায়ে গোলায়ে। এতদিন যে বীণীটাকে অবলম্বন মনে করিছি, এতদিন যে বসন্তাকে ইহঁৎবান মনে হয়েছে, তাদের আশা ছেড়ে আমি একটু বেপরোয়াভাবে সেটুর দিকে তাকাই। সেটুর মুখ খবরের কাগজের ঢাকা পড়ছে পুরোপুরি। তাই এখন আমার প্রথম কাজ হবে খবরের কাগজের আড়াল থেকে তাকে মুক্ত করে আনা যাতে আমি তার হৃৎ স্পন্দে পৌঁছে গাই সরাসরি।

প্রথমেই বলে রাখি কাজটা বড় সহজ কাজ নয় কিন্তু। দলবল্লের খেলায় কে এই মুহুর্তে নির্ভল হয়ে নতুন ভাবে কোন দলে যোগ দেওয়ার সুময় বুঝবে সেসব নিয়ে দুটো পিচাকা দুটো দিক থেকে আলোচনা করেছে বেশ বরফেরে ভাষায়। এতটাই রক্তবরে যে রাসা সোনেনে পর্বত পড়লেও, বহুগুণ আগে অষ্টম শ্রেণিতে উঠলে না পারার সুযোগ হারালো তাতে কোনও অসুবিধে হয় না সেটুর মতো পাঠকের পক্ষে। সেটু তার বাড়ির সামনে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতেই শিশু গেছে কাকে দলে থাকা বলে এবং কাকেই বা বলে দলে না-থাকা। বাড়ি থেকে বেরিয়ে কিংবা কিছুক্ষণ বাইরে থেকে বাড়ি ফেরার সময় বুকে গেছে দলে থাকার সুবিধেইবা কীভাবে প্রস্তুতিগুণ থেকে শুক করে শখান পর্বত সর্বত্র সাহায্য করে প্রতিদিন। সে যখন ছোলা ছোলায় বলে ওঠে, একটা শর্মাকে দেখান তো যে দলের এটো না খেয়ে বেঁচে আছে, তখন টক করে তার মুখের সামনে কাউকে এনে হামির কল সাহায্যিই বুল কলকর হয়ে পড়ে এক-একসময়। আমি যে দু'কলজনের নাম বলাই জন্য উশুপ করি কখনও কখনও তাদের নিয়ে সবচেয়ে বড় অসুবিধে নেই যে তাঁরা আশ্চর্যকর অর্থে ললন্ত না হলেও দলিত নন কোনও ক্ষেত্রেই বিদুম। তাঁদের অর্থেই জোরই সকলের অভ্যস্ত কোথায় যেন তাঁদেরই ঘিরে গেছে যেটো স্নেহের ভাষা দিয়েছে যেগুলো হয়েছে কোথাও কোথাও নতুন নতুন মূল্যেবর্ধিত ভূমিকা পালন করে চলেছে কলমণ-না-কলমণ। দলবল্লের মধ্যর ভিন্ন ভিন্ন মানচিত্র ছাড়াও সেটুর চোখের সামনে আছে দেশে দেশে জনসভায় এমন সব প্রতিশ্রুতি যা এই মুহুর্তের কোশলিনে ডাকের মতো সুসুন্দর লাগে যারা সেই অর্থে বেকার নন, চিরকাল কেনও ক্রমে খনিমুত তাদেরও আসবে আসবে। তাদের রাতে যে জনসভায় ভিন্ন দুর্দশর্নীর দৌলতে বুকের কাছে আসে, হাজার হাজার অপেক্ষার সামনে যে জনসভা থেকে কেবলই বেরিয়ে আসতে চায় মগ জুড়ে ফুট ওঠা আশানুভূতি, পরের দিন সকালে সেই জনসভায় বিবরণ সুন্দর ছাপার অক্ষরে সামনে দেখা, শোনা এবং পড়ার দৌলতে একেবারে সামনে যেন বারবার এসে পড়ে একটা আশা স্বপ্নীর

যা প্রতিশ্রুতির পর প্রতিশ্রুতি দিয়ে রচিত হলেও মূলত সন্তোষের জন্য বিরাজিত আশোপাশ। সেটুকে সেই শরীরের কাছ থেকে সরিয়ে আনা কত যে কঠিন কাজ তা কেবল ভুক্তভোগীর পক্ষেই জানা সম্ভব। এ ছাড়াও আজ সেটুর সামনে আছে সুসুত্রিত মাঠ। সেই মাঠে এগারোজন খেলোয়াড় একটা কাপ তুলে ধরে প্রকাশ করছে উদ্ভাস। আর যেন সেই উদ্ভাসকে যৌনিয্যার শাফল্যের মতো কল্যাণীয়া করার জন্য সেই ছবির খুব কাছেই যে প্রতিবেদন বেরিয়েছে সবিস্তারে তাতে আছে, খেলার আলোকে শিশুরে দেওয়ার অর্গিসে কীভাবে অর্থের ক্ষমতার ছিটকে পড়তে চেয়েছিল যে - পায়ের কাছে বলের দাসত্ব সবচেয়ে বেশি সেই পায়ের শিরায় শিরায়। কাজেই সেটুকে কাগজের আড়াল থেকে মুক্ত করে আনার জন্য আমাকে একটু ভাবতেই হচ্ছে আভ।

আমি যাকে খিয়ে করছি সে সেটুকে 'ছোড়দা' বলে ডাকে। আমার বিয়ের আগে আমি সেটুকে দেখে থাকলেও মনে করে রাখতে পারিনি। আমাদের বিয়ের অনেক আগে থেকেই আমার স্ত্রী তার সঙ্গে মিশেছে। তাদের রাধাগোবিন্দ মন্দিরের চাতালে সকাল সন্ধ্যায় মানুষের ভিড় জমে। কেউ বেশ বসে থাকাখনি শোনে, পুজো দেবে। কেউ আবার সেটুর পিনিমারে ছিটকে লাগে হওয়ার চেষ্টা করে। আমাদের বিবাহিত জীবনেরও প্রায় পঁচিশ বছর পূর্ণ হয়ে চলে। শীত চলে যাচ্ছে। এবার বসন্ত প্রতিষ্ঠিত হয়ে চাইবে। বিংশছাত্তা ভারসাম্যের সুখ সুখ সব সময়েই বসন্ত কতটা রাজত্ব করতে পারবে জানি না। তবে এটা জানি, এটা বেশ দুল, এটা স্থিরনিশ্চিত যে বসন্তকে চলে সরিয়ে রাজধানী দলিত বসন্তের সময়ের অনেক আগেই এসে পড়বে গ্রীষ্ম। সেই গ্রীষ্মের প্রবল প্রচাপের দিনে কেনও এক সন্দের মুহুর্তে পাণিত হোক না হোক আমাদের পরিণয়ের রজতবর্ষটি হবে এই পৃথিবীর অনেক দিন। পরিণয়ের, তবু প্রশ্রয় নন কোনও ভায়ে। প্রশ্রয়ের সঙ্গে পরিণয়ের নতুন নতুন স্বরূপে কে যে কাকে শেখেন ফেলে এগিয়ে চলেছে স্রুত তা বলা শব্দ। প্রশ্রয়ের সঙ্গে যে মুহুর্তটিকে মনে হয়েছে জলজাত তা যে কখন স্বর্ণাভ হয়ে উঠেছে তা আমরা কেউই বুঝতে পারিনি। আমার যে মুহুর্তটিকে স্বর্ণাভ বলে স্বীকৃতি দিতে এগিয়ে এসেছি তা সেমুহুর্তে হেতুবাের ত্যাগত হয়ে উঠেছে নিশ্চিতভাবে। হাতত তখন না ত্রিক, যাকে এত জোর দিয়ে ত্যাগত বলতে চাই তা নরপাণ্ডুরগণের কেনও এক লহমার উপার্জন বড়জোর। মন্দিরা আমার এসব কথাতে মান্যতা দেওয়ার জন্য সময় নষ্ট করতে চায় না সাধারণ। আমি 'কালের মন্দির' শোনার জন্য কখনও উৎকর্ষ হয়ে জড়ার ছেঁটোতে গিয়ে করে চলে সরিয়ে দিই এই প্রশ্রয় ও পরিণয়ের যোগফলগুলি এতসবকম ভিত্তা দেখে দেখে। কিন্তু কথটা হল মন্দির তার এই ছোড়দাকে চেনে যখন

তার চুল বড় হয়েছে, বদনমুত হওয়ার দায় এসে পড়ছে প্রত্যহ। নিজেই নিজের দলে অপরদের দ্বারা বেশপঙ্কিত হয়ে ওঠার সাধ হয় সকলেরই কেনও না কেনও সময়। বিশেষ করে দেখা গেছে, ইতিহাসের সন্ধান নিয়েও বলা ওঠা যায়, বিবেকোপলব্ধি, কিংবা দিনালের ভাব এসে গেছে ত্রিক এই সমস্তা সামনের দিকে তাকিয়ে উপবিষ্ট অবস্থায় সাধে জাগে বৈশীস্বাদের। আমি মনে মনে সেইসব দিনালের কথা ভাবি যখন ত্রৌপদীর তাঁর কৌর প্রয়োজনে অনানন্দ হয়ে পড়ছেন। আর চারিদিকে ছড়িয়ে যাওয়া সেই অনানন্দত্বা থেকে জন্ম নিচ্ছে লাগোয়ার আতুল। ততো মন্থা নায যতো অনিমিত্ত। আর যতো অনিমিত্তা ত্রিক ততোই শৈলী। লাগোয়ার শৈলী। সেই লাগোয়ার শৈলীর মধ্যে মুহুর্তকাল দাঁড়াতে পারলে ফুল ফুটত। কেনও সন্দেহ না হতো। আমার আভ সেই ফুলের জগৎ নিয়ে কথা বলার অধিকার হারিয়ে ফেলছি। সেটুরে রাধামাধব মন্দিরের চাতালে বসার অধিকার হারিয়ে করে নিয়ে পিনিমার কাছ গিয়ে নিজের কদমর সঁপে দিতে পেরেছিল মন্দিরা বিয়ের অনেক আগে থেকেই। বলে যারা ভাল যে শুধু পরিণয়ের আগে থেকে নয়, প্রশ্রয়ের আগে থেকেও পুরোপুরি।

মন্দিরের যে চাতালে পিনিমার দিকে পঞ্চদশের রেখে মন্দিরা দিনের পর দিন নিজেছে উপস্থাপিত করে গেছে সহজেই হওয়ার বাসনা হয় সেই চাতালে পরবর্তীকালে আমারও কেটেছে বিজ্ঞপ্তিভাবে হলেও বেশ কয়েকটি বিবেক, সন্দেহ। না, প্রত্যকালে আমার কননও পিনিমার কাছে যাওয়া হানি। যাওয়া হানি একই রাতের দিকেও। সেটুদের মন্দির হয়ে তাদের বাড়িতে ঢুকতে বড়। কিংবা বলা যায় তাদের সৎসারের সঙ্গে তাদের মন্দিরের সম্পর্কটা প্রতীকের নয়, শেষপর্যন্ত তা বোধহয় অতিক্রমেরই। আমি যতবারই বিকেলের আলো বা সন্দের অরতকালোয় প্রস্থান সর্মথনে মন্দিরের চাতালে গিয়ে বসছি, পিনিমা তাঁরে ঘিরে থাকা মানুষজনের জাল ভেঙে করে একটু ঝুঁকো হয়ে ত্রিক ঢালে এসেছেন আমার কাছে। আমার কাছে বসে আমার মুখোমুখি হতেও তাঁর কোনও দ্বিগা হানি। আমি যে শুধু মন্দিরামের বাড়িরই জামাই নই, পাড়াপ্রতিবেশীরও জামাই একশোবার, একখাটা স্বরণ করিয়ে দিতে সেটুর বাবার বড় বোন আমার ছাে কোলে তুলে নিয়ে বসবার বলে উঠেছেন। তোমার মুখ এত শুকনো লাগছে কেন, জামাই? তাঁর প্রশ্ন সর্বর্ষাই অমূলক ছিল না। সর্বর্ষাই অশুশীল সেন্যার পশ্চদ এড়িয়ে গেছে পালনে তাঁর গাথা। যিনি তাঁর স্বামীরা চোখের দিকে প্রশ্রয়বর তাকানোর পরে তাঁর পাঁচ মন্দিরের বেশি আর তাকানোর সুযোগ পাননি কালজ্বরে তৎকালীন ভাষাযাত্রার ভায়ে, তিনি যে কতবার তার সন্ধানের চোখের দিকে তাঁর মনে মেড়া শীর্ণ

অবয়বের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসা ব্যাকুলতা দিয়ে চোখ রেখেছেন তার সতিই কেনও ইয়াত্র নই। আমি তাঁর প্রশ্রয় উত্তর কননও কননও বলতে বাধ্য হয়েছি বাইরের দিক থেকেও আমার ভাল না থাকার কথা সামান্য পরিমাণে। পিনিমার যা বোঝার তা বুঝে নিতে দেহি হানি খুব। — জামাই, তুমি লাগোয়া এত চিন্তা কর কেন? তোমার কীসের এত দুশ্চিন্তা। বাড়ির কাছে জেগে ওঠার আগে তুমি যি জেগে উঠতে পার, বড় ভাল হয়। পারবে না? যে চোখ এই প্রশ্ন করেছে সে চোখে স্থিরতার সঙ্গে দিলে সজলতা নির্ঘাত। একটু থেমে, একটু স্তিমিতা হয়ে তবই তো তাঁর পুনরায় সরব হওয়া। কিংবা বলা যায় যতটা সন্তব আশ্রয় দিয়ে আলোচিত করা রবকে। — তুমি হচ্ছে করলে না পারার কিছু নেই, জামাই। সবার আগে জেগে উঠবে। চোখেমুখে ভাল দিয়ে পূর্বদিক ধরে হাঁটতে শুরু করবে। হাঁটতে হাঁটতে যখন দেখবে তুমি ঘাসের মধ্যে এসে পড়ছে, তখন কিন্তু একটা কাজ করতে হবে গো জামাই। সেটুর পিনিমা কথা বলতে বলতে আবার মীর হয়ে গেলেও সেটুর মুখ ঢেকে যাওয়া এই মুহুর্তের মীরবরণের সঙ্গে তার কত যে তৎপরা। যারা তাঁর কাছ থেকে মগ্নপুত জল নেবে বেশ বেশ আদুনিক বিভাসের সব বোতল নিয়ে অপেক্ষা করে আছে, যারা দুর্ক থেকেও আঁত হয়ে এসেছে প্রথম সুযোগেই মস্তক নামিয়ে তাঁর মুখের বাতাসের স্পর্শ নিতে, যাদের যত ব্যথা ততটাই ইথৈ, যত পাশ ত্রিক ততটাই বিপাশ, তারা তাদের শান্ত অপেক্ষাকে যতখানি মনবেত করেছে ততখানি সমবায় কঠৈ এনে পিনিমা আমাকে নির্ভর হতে বলেছিলেন। পায়ের চাটী হাতে আসবে আর পা থাকবে একসঙ্গে নয়। সেই নয়াত্যা এসে মন্দির চিরপায়ের মুকিত আর কণিগের শিশির। সেই পদযাত্রায় থাকলে মে। মন্দিরকে মেভাবে ভালবাস। তোমার পা দুটোকেই সেইভাবে ভালবাসতে হবে। নাহলে পায়ে কদিন আপনমনে হেঁটে দানো, তুমি নিজেই তাঁর পাবে কী মুখ। তোমার চোখগুণ কথা বলবে। কি জামাই, পায়ের না? তবে একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না। বাড়ির কেউ জেগে ওঠার আগে তোমাকে বেরিয়ে পড়তে হবে কিংবা। দেখবে কত গাছ মাথা উঁকু করে দাঁড়িয়ে আছে। কত পাখি ডাকছে। কত ফুল ফুরে পড়ছে। দেখবে মনে ভাল লাগবে। শেষে তোমার মনে হতে পারে, মনিগার জন্য দুটো ফুল নিয়ে যাবে।

সেটুর পিনিমা তাদের মন্দির আর বাড়ি ছেড়ে কোথাও যেতে পারেন না। সেটু অনেক বেলোয়া সার করে। কিন্তু পিনিমা জোরবেলোয়া তাঁর সোনের জন্য তৈরি হন চিরকাল। পাগল লাগানোর লাগানোর বাবনা যত বড় অননও সেই পরিমাণে অকৃত। বাড়ির সেই উদার উঠানে বাড়ির কত ছেলেনেকি কত কাজে যে ব্যস্ত থাকে বিশেষ রাখবে কত। কি দিয়েই বাস্তবতার থেকে



ভোরবেলায় কোনও না-কোনও মেয়ে কোনও না-কোনও কাজ করিয়ে যে কাছটাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয় তা সতিহি সেবাফলক। পিসিমার মনোনে জন্য জল গরম করে সেই জল অলপকরত হানাদীরা কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। সেই জলের উষ্ণতাকে ঘটা প্রয়োজন ততটাই বাড়িয়ে রেখে তিনি এমন এক তাপমাত্রার সৃষ্টি করেন যা সারা বছরই সাদুর পক্ষে থেকে যায় উপযোগী। বলা বাহুল্য যে এই সুস্থির পেছনে ভূমিকা থেকে ঠাণ্ডা জলেরও। সেই-মেয়ে গরম জল ভালবেসে পৌঁছে দিয়ে যায় ঠাণ্ডা জলও পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব হানিমুখে বহন করে। তাবপার তার পিসিমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকার আর প্রয়োজন থাকে না। তিনি মাথায় হেল মেখে বসে বসে এক আধার থেকে আধেয় নিয়ে আর এক আধারের মাখে নাশ্ত করেন। ফলে এক আধারের সঙ্গে আর এক আধারের যে সহাবস্থান ঘটে তাকে সমন্বয়ের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বসে বসে একটা খেলার মেজাজ আমার চোখে যে থাকে কোথাও তা অনুমান করে নিতে পারি আমি। আমি ভোরের কোনও ভিতর বাড়িতে দাঁড়িয়ে এই আত্মশাশন দেবার সুযোগ না পেলেও অনুমান করার সুযোগ পেয়েছি বারবার, দিনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দিকে বসে বা দাঁড়িয়ে থেকে। তবে যেটা তথ্য সেটা এই যে ভিজে থান ছেড়ে ওকনে বা বসে যিনি মিলনের একেবারে কাছের ঘরটিতে নিজের বিছানা না বসে মেঝেতে উবু হয়ে বসেন এবং হাতের কাজ পেয়ে যান লালাদের বাড়ি থেকে ইতোমধ্যে এসে যাওয়া আলাদা প্রাসে আলাদা রকমের চা ও বিস্কুট, তাঁর পরিভাষ্যকর মনে নিয়ে তাঁর বাড়ির একমাত্র বস্তুকে বিব্রত হতে হয় না কখনই। সেদূর নিঃসঙ্গতা বউদি অনেক রাত পর্যন্ত ঠোঁড়া বানানোর কাজে তার স্বামীকে সাহায্য করে। ফলে তার সকলবেলা ঘুম থেকে উঠতে একটু দেরি হয়। তার জাগরণের আগেই অকারণে তখন পড়় থাকা থান কেতে তারে ছেলে দেওয়ার কাজটা আনন্দের সঙ্গে করায় জন্য যাদের মাতৃভাষা বাংলা নয়, দিল্লির জাতিতা আছে যাদের মাতৃভাষা, এমনও হতে পারে যে গতিশীলতার সঙ্গে সঙ্গে স্থিতিশীলতার লিপ্স আর বজায় থাকে না কোনও মতে যাদের লেখাযা বা উচ্চারণ, তাদেরই কোনও মেয়ে যা বউ নিজস্ব কাজ ফেলে নিজস্বের অনন্য থেকে কিছু সময়ের জন্য ছুটি আসে। যারা বিশ্বাস করে তাদের বৈশ্বকরণী সদর বা অন্দরের বাখা পিসিমার ওভেস্কা ও সক্রিয়তার যুব বেশি মাথা তোলাবার সুযোগ পায় না, হেরে যায় ভিতরে ভিতরে, তারা কেউ না-কেউ কখনও না-কখনও অপেক্ষাকৃত যারা তাদের কাজ থেকে পিসিমাকে কিছু সময়ের জন্য সরিয়ে এনে তাঁর সবাবসনেও যে বাস্তব প্রায় একই আমি হচ্ছে সেবেই স্বীকার করি।

এই সবাবহনের পরিস্থিতিতে মনে পড়়ে তিনি একবার আমার সঙ্গেও কোনও এক সবাবহনের ভাব এনে আমাকে যেমন অস্থি আর লজ্জায় ফেলেছিলেন তেমন দিয়েছিলেন অতীত একই সঙ্গে। একটু গুছিয়ে বলার প্রয়োজন আছে নিশ্চিত। কেবল মন্দিরটির নয়, এক-একটা কাহিনিরও কৌশি সহাবহনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে সময়ের সময়ে। সে বছরটা আমাদের পাজার ভিতরেও বাইরে মাল্লারিয়ার সময়। যে রোগ বন্ধকর আগে নির্বাসিত হয়েছিল তাকে চিনে নিতে কখনও কখনও বেশ সেরি হয়ে যাচ্ছে নতুন দিনের ভাতারসের। ফলে পাজার ভিতরেও বাইরেও মন্দিরটি মনোবাসী অমৃত্যু হয়েছিলেন মানবিক অসহায়তার একটা মুষ্টি প্রায় প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে। এমনই নিনকালে আমার অতীত ভুর হয়, দুর্বলতা আসে এবং মুখ ভরে যায় অচেনা বিষাদ। জ্বরের সৃষ্টি হলেও তুঁৎকদিন বাসে জ্বর সাধারণত ঘুমেই অর্থাৎ হয়। কিন্তু থেকে যায় দুর্বলতা আর অল্পট ভাতারের সক্রিয়তা সত্ত্বেও। পিসিমাকে পেয়ে মন্দিরকে বর্ণালোনে— ভাস্মাকে একবার নিতে আসতে পারলে ভাল হয়। আমি আপত্তি করিনি। আপত্তি করার মতো বলিষ্ঠ কোনও কারণও খুঁজে পাইনি হাতের কাজে। দেরি না করে একদিন মন্দিরসাহায্যে বাইরের চালেরে বসে মুশোমলি হয়েছিলাম পিসিমার। তিনি আমাকে পন্দ না করে যলিকটা করণা দিয়ে এবং খানিকটা অরণ্য হয়ে আমাকে নীরবে চলতে দেখেছিলেন কিছুক্ষণ। যিনি মন্দিরকে তাকিয়ে তাঁর হলে ওঠা— জামাই আমার খুব দুর্বল হয়ে গেছে। বকে স্কুল করতেই হবে। তুঁই আমার সঙ্গে একটু ঘরে আয়। আমি চাচাল বসেছিলাম একা একা কিছুক্ষণ। একা একা মনে যারা চাতালে ভিড় করেছিল তাদের সঙ্গে যুক্ত হতে না পারা। কিংবা তাদের দেখতে দেখতে নিজের জগতে হারিয়ে যাওয়া কোনও এক মনে। কিছুক্ষণ বাসে মন্দির একটু দেরি এসেছিল। বাড়ি ফিরে যেতে যেতে জানতে পেরেছিলাম পিসিমা মন্দিরকে তাঁর ঘরে ডেকে নিয়ে দু'রকম পাতার কাজ বসেছিলেন। একটা বেটে নিয়ে তাতার পাতা বেটে হলে। আর একটা ভাল করে খেঁটে পাতার সেই কালা দুটি হাতের করতলে ভাল করে মাখিয়ে শেষে ধুয়ে ফেলেতে হলে হাত। অস্বীকার করে দাতা সেই যে কিছুদিনের মধ্যে আমি দুর্বলতা কাটিয়ে উঠি এবং লালদেব সামনে পেলো তা আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করবার ইচ্ছেটাও ফিরে আসে বেশ। কিছু হানিভিকসে আমি চিহ্নিত হয়ে পড়়ি খেপেট পেরিয়ে। একদিন মন্দিরকে ঘুম থেকে উঠে সকলতা এবং খিদেয় উপস্থিতি সত্ত্বেও হাঁটতে গিয়ে টের পাই ডান পায়ের দুটি আঙুলে বেশ ব্যথা। কেবল তাই নয়, আঙুলগুলির চির-নীচ একটা মেলাগা বাবা বা জন্ম নিয়েছে স্পষ্টভাবে। গুরুত্ববিস্ময়ের কাছে ছেলে তিনি কয়েক দিনের জন্য রায় সেই ঠোঁটহাটীর বিপক্ষে— এক

সপ্তাহ বাড়ির বাইরে বেরোবেন না। তারপর কেমন থাকেন আমাকে জানাবেন। সেই বিশ্রামের অবকাশ ছিল না বলে আমি আশেপাশে থেকে সরে যেমিওপাখির আশ্রয় নিছি। পরের চিকিৎসক খুবই সুমন্য অর্জন করেছেন খুবই অভিজ্ঞ হয়ে। আগের চিকিৎসক এক সপ্তাহ দেখে তারপর যে আশঙ্কার সমর্থনে রক্ত পরীক্ষা করে ভেবে রেখেছিলেন হোমিওপ্যাথির সেবক সেই অশঙ্কাকেই সঠি বলে মনে করতে চেয়ে সফিত ইউরিক আসিডের ব্যয়ের জন্য ওষুধের নাম লিখে দেন এবং কিছুদিন এমন কয়েকটি যাদুগ্রন্থ করতে নিষেধ করেন যেগুলির প্রতি আমার আশ্রি আছে অনেক বছর ধরে। আমি তাঁর প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা রেখেও তাঁর ওষুধের নাম লেখা কাগজটি পকেটে সেই যে রাধি আর বের করি না পরের দিনেও। বরং পরের দিনে মন্দিরকে পাঠাই পিসিমার কাছে। বাখার বুদ্ধি এবং শ্রদ্ধার ক্ষমি দেখে মন্দিরও যেতে অসম্মত হয় না। পিসিমাকে রিকশায় চাপিয়ে লেগে বসে আমাদের বাড়িতে নিয়ে এসে খিল চোয়ার সরিয়ে রেখে বসে পাতারের মেঝেতে। আমি তাঁর সামনে গিয়ে বসি। তিনি প্রথমে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে শেষে আমার পায়ের দিকে তাকান। শেষে তাঁর বা-হাতের অবতরণ ঘটে আমার ডান পায়ের ক্রিষ্ট ক্ষেত্র। আমি বেশ খুশতে পারি তাঁর আঙুলগুলির সাহায্যে একটা সবাবহনের ভাব প্রায় প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। বাখার নজরগারনের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় সন্ধ্যাকালেও আগোনা। খাঁর পায়ের আমার হাত রাখার কথা তিনি যখন আমার পোরাই হাত রাখেন নিষ্ঠুর সঙ্গে তখন সন্ধ্যাই তো হয়ে উঠবে সবচেয়ে সম্মানিত অতিথি। সেই অতিথ্যকে অস্বীকার করে, বলা যায় নিশ্চিক করে দিয়ে প্রায়, সেটু এই মুহুর্তে যে চোয়ার কাগজ মুখে করে বসে আছে মেঝেতে বললেও সেই চোয়ারে খাঁর দেহকণ্ড লেগে ছিল তিনি একসময় প্রায় সম্মত হয়ে পড়়েন এবং আঙুলের গতির মধ্যে আনেন নিভিভতার রতি আছে আছে। এই কাজ কিছুক্ষণ চলে। তারপর হাত উঠিয়ে নিয়ে পিসিমা আমাকে পা গুটিয়ে নিতে বলেন— মন্দির, জামাইয়ের ওসব কিছুই হয়নি। পুরনো চটি আর পরতে দিস না। বের পায়ে মাপ নিয়ে গিয়ে যত ভাড়াতাড়ি সম্ভব এক তেলু চটি কিনে আন। তবে একটা কাগজ মনে রাখনি। আমাদের জামাই যেমন সরল তার চটিও তো তেমন সরল হতে হবে। তাই কাপড়ের চটি আর পরা চলবে না গো মা। বলে রাতা ভাল, নতুন চটি পরে এবং কোনও ওয়ান না সেয়ে এবং আঁসক্তির খাবারওলা মুখের সামনে রেখে আমি শেষ পর্যন্ত রাত ফটেরই সেই উপলব্ধির শরিক হই যে ঘুমাবার আগে যাওয়ার রাস্তায়ে মহিলা-মাইল। আর সেই যাওয়ার ইচ্ছেটাও ফিরে এসেছে পুরোপুরি।

সেটুদের পাশে লালাদের বাড়ি হলে লালাদের পাশে যে ভাবা যাবে না মন্দিরার পায়ের বাড়ির কথা এমন কোথাও কথা নেই যুগ্মশীল। একটুও বাড়িয়ে কথা হবে না যদি মন্দিরার কোন ইন্দ্রিয়কে কখনও রাখাশোণিম ক্ষেত্রের আসতে হলে তারের বাড়ি থেকে বেরিয়ে শেষে একটা বাড়িই অতিক্রম করতে হবে। আর সেটা সেই বাড়ি যার সামনে লালাদের ঘর সেকান এবং যার পেছনে তাদের অদমনমুখী সব ঘর গোলা হয়ে প্রায় একটা বৃত্ত রচনা করার অভিল্যায় রচনা করেছে। ছেলেবেলা থেকে সেটু ইন্দ্রিয়ের বাড়ি আসতে কি না তা আমি ঠিক বলতে পারি না। জেলে নেওয়া মেয়ে ইচ্ছেও মন্দিরকে সেটুদের সঙ্গে দেখার যথেষ্টবারে বেজে ওঠার অনেক আগে থেকেই সেটুদের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের যলিনতাতে ইন্দ্রিয়ের ক্ষেত্র ভালপালা মনেতে দেখেও কেউ কখনও এমন কিছু করেনি যেন বলা যেতে পারে প্রকাশ বিদ্রোহ। তখন তাদের আর ছিল না। কিন্তু মন্দির-ইন্দ্রিয়ের বলাগত করে হলেও ইরেকি প্রকাশ রাখতে চলে। ক্ষিতিভাভে পুরোটা পড়়তেন এবং জোড়পত্রকে পড়়তে দিতেন যথাসময়ে। পিতা ও পুত্রের মতো আলোচনাও হত। আর সে সব আলোচনার মধ্যে ইতিহাসও ভূগোলের দীপ্তিধারা থাকতেও পুত্রের মানচিত্র নিয়েও যে কথা হত তা তো যকর্ণে তুনেছি আমি সেই অধ্যায়ের একেবারে শেষ দিকটাতে হাজির হওয়ার সঙ্গে। কিন্তু ইন্দ্রিয়ারাখারটাকে চিনতে চোয়েছে। তাকে স্কুল পাঠ্যক্রম অপরীক্ষিত কাঠোয়ান কষ্ট করে করেও খুব বেশি দুল পাঠানো সম্ভব হয়নি শিফার প্রতি তার অন্যগ্রহের মাত্রা ক্রমাগত বাড়তে থাকায়। সেই স্কুল ছেড়ে সে যত গৃহস্থ হয়েছিল, ততই তারের ঘরে ঘরে দিগ্বালোকে বা সৃষ্টিভয়ের পর অস্বস্তিক সাময়ি ধরে গেছে যুবকবৃত্তিয়ার মুশোমলি বসে সন্ধ্যাপর অপরূপিতভিতেও অদ্বৈত হয়ে থাকার ভবিষ্যৎকে প্রকাশ করার একের পর এক মূহুর্ত। কিন্তু পড়়ুটির পরিবর্তন হয়। সেটু তার মুখের সামনে মাতৃভাষার যে কাগজ মেলে ঘরে বসে আছে, তার সামান্য শিফা সেই কাগজের পাঠক হতে কোনও অন্তরায়ের সৃষ্টি করে না। সে সারা সকলটা টান্সি চালিয়ে, সারা সপ্তাহ ঘরে শব্দরের নানা দিক প্রসারিত হয়ে ঘুটটি দিনে কোলা দিকে কখনও কখনও আমাদের বাইরের ঘরে বসে যে কাগজ থেকে জেনে নিতে পারেন গোপনের খবর, বিভিন্ন বাজারে কাগজপানার দান, কিংবা কোনও দেশেশব্দে কোনও মন্ত্রপুত্রের মধ্যকারে শাস্যায়লনিত রেষারাজ সে কাগজ তার অবহার কোথাও পরিবর্তন করতে পারেন না। তাকে বছরে পর বছর যাবৎ থেকে যেতে হয় নিকটীয়ের টান্সির লালক দিনের কোলা। কিন্তু ইন্দ্রিয়ার-মন্দিরার দান যে কাগজ পিতার পর্যবেক্ষণে পড়়ত আপাদমস্তক, তারই



দৌলতে তার, ভাষাধার জন্মায় এবং তা বাড়তে থাকে উপযোগিতার সূত্রে ক্রমান্বয়ে। ফলে সে একদিন এমন সম্ভ্রম যোগ দেওয়ার সুযোগ লাভ করে যার ক্ষেত্র বিশ্বজোড়া। সে প্রথমে হুদুমি ফেলে যোগ দেয় এবং পরে তাদের হুদুমিতে গমন করে। সংস্কারে তুষ্ট করার ক্ষমতা অর্জন করতে করতে সে কিন্তু সতিই একদিন সিংহাসনে বসে এবং তার দেশ-দেশান্তরে যাবার ক্ষমতাও লাভ করে ওরূপ করে একে একে। সে শেষে রাধামাধব মন্দিরের একটা বাড়ি পরে যে বাড়িটাকে চিরকাল থেকে এসেছে, প্রবাসী মালিকের কাছ থেকে সেই বাড়িটিই কিনে নিয়ে একদিন আমার সামনেই মেলে ধরে রঙের তালিকা। দেওয়ালে কী রঙ বসবে তা ঠিক করার জন্য যাদের উপস্থিতি বৈধ ছিল তাদের মাথা ছিল সেটুও সেদিন। সারা বাড়ির জন্য সেদিন যে রঙ মূলত নির্বাচিত হয় সেই রঙের সঙ্গে তাল রেখে আমার দ্বীপ বড় ভাই তার গাড়ির রঙ পছন্দ করে। নতুন গাড়ির সমাহার থেকে গাড়ি বেছে নিয়ে সেই গাড়ির চাবি মন্দিরার বড় ভাই সেটুর হাতে তুলে দিলে সেটু গাড়ি চালিয়ে নিয়ে এসে থামায় যে মন্দিরের চাতালে পিসিমা বসে থাকেন মন্দিরের আশ্রয় বৃক বাধার ভিত্তি নিয়ে তার ঠিক একটা বাড়ি পরে।

এবার বলি নতুন গাড়ি আসার ফলে এই মহানগরীর একটা বুথ পুরনো অঞ্চলে কবে একটা নতুন বিদ্যাস যে তৈরি হয় তার কথা। আগে কী হত, চা-বিবুটু খেয়ে নিরুদ্ভাষীর ট্যাগ নিয়ে সকল আটায় বেরিয়ে পড়ত সেটু। যখন আরোহী থাকে না, কেবল বাড়ি, বিদ্যে পায় এবং অল্প পরসর জলধারার হাতে তুলে নেওয়ার মতো হানও এসে যায় চলন্ত যানের যাত্রাপ্রাপ্তের মাঝখানে, তখন সেটু সেইসব সুযোগের সম্ভাব্যতার করে নেয় চিরকাল। হিম্মরা বা মন্দিরার দারার গাড়ি কেনার সঙ্গে তার কোনও সম্বন্ধ থাকার প্রসঙ্গ ওঠে না। প্রমোটা উঠেছে দ্বিগুণের সেটুর প্রত্যাবর্তনের পর থেকে। আগে সে বাড়ি নিয়ে গমন করে মধ্যাহ্নভোজন সেরে নিত দাদা-বউদির সামনে বসে নিশ্চিন্তে। তারপর আসত দিবাশ্রম প্রবেশ কিছুটা সময় কাটানোর পর্বা। তারপর সন্দের দিকে পাড়ার দোকানে চা খেয়ে সে চলে যেতে পারত সেই ক্ষেত্রে যেখানে সন্সারের টুকটাকি কাজ করতে করতেও একটা এককোণে নিজস্ব এককোণে গোপন অপেক্ষা দানা বাঁধতে থাকে রোজ। কিন্তু গাড়ি কেনার পরে যতদিন না মাসমাসিকের বিস্তৃত চালক বুজ্ঞে পাওয়ার কাজ শেষ হয়, ততদিন ধরে ওরুপ করে যায় সেটুর নতুন কাজ। সন্দের নিশ্চিন্তে সে এখন বাস্তব হয়ে পড়ে হিম্মরার দাদাকে নিয়ে বিভিন্ন দিকে প্রধাবিত হওয়ার কাজকর্ম। কখনও কখনও দাদার পরিবারের সেকেন্ড তার দেশের বাইরে থাকার সময়টাকে

কাজে লাগিয়ে বেরিয়ে পড়তে থাকে সেইসব আয়ীষযজনের বাড়ির দিকে যাদের সঙ্গে সম্পর্ক ক্রীণ হয়ে এসেছিল বলে বৃণুধান করার কর্মসূচি আমন্ত্রণ আসতে থাকে একের পর এক। এই ভাবে একটা সময় আসে যখন সেই পুরনো খাতির নতুন চেহারার মধ্যে, সত্ত্বানাময় সন্ধেওলোর মধ্যে সেটুকে আর প্রতিষ্ঠিত হতে দেওয়া হয় না। অত্যন্ত সপ্রতিভতা এবং বিশেষভাবে বাধ্যমি কিছু নীরতবার তারাই সেটুকে সরিয়ে দেওয়া হয় তার সেই বহুবছর ধরে গেয়ে আসা একটাই গান থেকে আরে আরে। হিম্মরাও যে সব বৃথতে পারে তা আমি বুঝতে পেরেছি বহুবর। কাকে বিশ্বাসন বলে তা তাকে কেউ কোনও দিন বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেনি। আর নিজে থেকে প্রগতির সপ্তোজ্ঞা বুঝে ওঠার ক্ষমতা বা ইচ্ছে কোনওটাই তার না থাকায় সে প্রতিবাদও করতে শেষে না কখনও। সে কেবল তাদের নতুন রঙের দীপ্ত জ্ঞানলা গিয়ে সেই দিকে ভাবায় কখনও কখনও যেদিকে রাধামাধব মন্দিরের চূড়ায় যুগ যুগ ধরে কোনও রঙ না হওয়ার সরলতা।

কেন জানি না সেটু কোনও কোনও রবিবার সকালে আমাকে মনে করে ঠিক চলে আসে। মন্দিরার মনে থেকে কখনও না-কখনও শুনে ফেলে 'ছোড়দা' এই সন্ধ্যাধন অত্যন্ত নিরোগ্যভাবে। আর তেমন কোনও বক্তব্য না থাকলে অবশ্যই কাগজ দিয়ে ঢেকে রাখে মুখ। তাকে আনবুত করার জন্য আমি এক-একদিন এক-একরকম কায়দার কথা ভাবি। তার কোনওটিই কোনও গল্পের কাজে লাগে কি না এ নিয়ে আমার ভ্রা আছে, আমার সংশয়ও আছে যথেষ্ট। অছাড়া আমার অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে যেমন কম আমার বীশির অজ্ঞতাও তেমন সুদূরপ্রসারী। একটাই শুধু আশার কথা—বিজ্ঞের হাসি আমাকে কখনও দিতে পারে না বলে যা মন চায় সেটাই করে বেধে যখন-তখন। আজ এই মুহূর্তে যেমন আমি সেটুকে মালাপো বাওয়ার টোপ দিলাম—চলো সেটু, সুরেশের দোকানের মালাপো খায়ে, শ্যামলের চা খেয়ে একবার পিসিমার সঙ্গে দেখা করে আসি। অনেক দিন যাওয়া হয়নি। মালাপো বা চায়ের কথাও ততটা নয়, বরং পিসিমার কাছে যাওয়ার কথাই সেটু মতো যেন বিচলন জাগে। সে মুবের ওপর থেকে কাগজ সরিয়ে নিয়ে মোমুবাষি হয় আমরা—দাদা, সতি এখন পিসিমার কাছে যাবেন? চলুন তাকে।

আমাদের সূর্যালোকে চলা শুরু হয়। সুরেশের দোকানে দাঁড়তে চান না সেটু।—ওসব আজ থাক। আর একদিন হবে। এমনকী তাকে থামানো যায় না শ্যামলের দোকানের সামনেও। বেশে বোঝা যায় সে-ও আজ কেন্দ্রাভিগণ না হয়ে কেন্দ্রাভিগণ হওয়ার সুধিবে নিতে চাইছে যতটা সম্ভব।

আমরা এমন রাস্তা বেছেছি যাতে প্রথমে পড়বে হিম্মরার বাড়ি এবং হিম্মরার গাড়ি যুগপৎ। আরপর পড়বে লালারের দোকানের বাস্তবতা। লালার নিজেদের মধ্যে যে ভাষায় কথা বলে সে ভাষার বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটলে তা তো আসলে সেই তুলসীদাসেরই ভাষা। আমার কী দুঃসাহস, অনেক বছর আগে তাঁর একটি দৈহার চারটে ছত্র আমি পিসিমা যে ভাষায় কথা বলেন সেই ভাষায় অনুবাদ করার চেষ্টা করেছিলাম। এই মুহূর্তে সেটুর সঙ্গে রাধামাধব মন্দিরের চাতালের যুব কাছে এসে পড়েছি। ওই তো পিসিমা আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে

আছেন। আর তার দিকে তাকিয়ে বসে আছে যাদের নানারকম বাধা আছে তাদের একটা দল। ফলে অনেক বছর আগের সেই অনুবাদ আমার মুখ থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। নিরুপায় হয়ে সেটুর কাঁধে হাত রেখে বলতে থাকি—

আসার সময় সবার হাসি

তুলসী ছাড়া কামাটা কার

যাবার সময় সেদিক যেন

হাসিটা তোর কান্না সবার।।

### 'বাক-সংস্কৃতি নির্মাণ' ডিরোজিওর অবদান-এর তথ্যসূত্রে পোষণ

২০. 'But after the promulgation of that decree, the direct stimulus of European agency was not needed. A fount of thought, and feeling, and enquiry, and enquiry, and enquiry, must find vent for itself, even if it be through the crevices of the most rocky obstacles'—A. Duff, Ibid, p. 638 (লেখকৃত অনুবৃত্ত)

২১. P. C. Mitra, I bid, p. 27, 'He used to impen upon his pupils the sacred duty of thinking for themselves.' (সমালোচনা লেখকের)

২২. শিবনাথ শাস্ত্রী, তবৎ, পৃ ১৫২

২৩. শিবনাথ শাস্ত্রী, তবৎ

২৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মুক্তধারা (১৯২১), রবীন্দ্র রচনাকলী ৫ম খণ্ড, পৃ ৩২৩

২৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তবৎ, পৃ ১৩০

২৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তবৎ, পৃ ১৩৮

২৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তবৎ

২৮. "India Gazette", rpt. "John Bull", উক্ত, তবৎ, পৃ ৩৯-৪০ (সমালোচনা লেখকের)

২৯. Song of the Stormy Petrel, (Complete works of H.L.V. Derazio) Edited by AM, A.D, AK & SSM, DCC, 2001, Appendix, pp.437-441, শিবনাথ মুখোপাধ্যায়, কলকাতার আদি জাভা, ডেভিড ড্রামট, Teacher of Derazio, ডিরোজিওর নথয়

সমিতি, পুনঃ পৃ ৭৭

৩০. শিবনাথ মুখোপাধ্যায়, তবৎ, পৃ ৭৭

৩১. P.C. Mitra, Ibid, pp.150-151

৩২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মুক্তধারা, তবৎ, পৃ ১৩৮

৩৩. 'Sketches of Hindoo Youths', W.M. Woolaston, "The Oriental Pearl for 1832", p. 171-191

৩৪. 'Sketches of Hindoo Youths', Ibid, p. 181 "It was thus that I first heard an able essay by H-G-E, in condemnation of the Hindu mode of marriages. I never heard the boys express their thoughts in common conversation, so freely and boldly as they now did in speeches and essays."

৩৫. 'Sketches of Hindoo Youths', Ibid, p. 192

৩৬. যু. মৈত্র, তবৎ, পৃ ৬৩-৬৬

৩৭. যু. মৈত্র, তবৎ, পৃ ৬৩

৩৮. যু. মৈত্র, তবৎ, পৃ ৭২

৩৯. 'Sketches of Hindoo Youths', Ibid, p. 188 (অনুবৃত্ত লেখক)

৪০. T. Edwards, Henry Derazio: The Eussian Poet, Teacher and Journalist, Calcutta, W. Newman, 1884, Riddhi Edition, 1980, pp.66-67

৪১. A. Duff, Ibid, p. 652



মহারাজা বীর্ষ মণিকা ত্রিপুরার রাজত্ব করেছিলেন ১৮৬৩ সাল থেকে ১৮৯১ সাল পর্যন্ত। প্রখ্যাত ইংরেজী শিক্ষায়তন 'সিউনিট' নামে ১৮৮৬ সনতেও বাল্য কাটাতে তার অসাধারণ গুণ ছিল। তিনি বৈষ্ণবশাস্ত্রেও সুপারিত ছিলেন। এ ছাড়াও তিনি মল্লিক উচ্চ দলের সিঁহীরা, চিত্রকলায়ও ফটোগ্রাফিতে যথেষ্ট পারদর্শী। তারপর ত্রিপুরার রাজসভায় রাজ্যে ভাষা ভাষায় প্রয়োগ শুরু করেন। তাঁর রাজত্বকালে ত্রিপুরায় দাদপ্রথা, সর্দারী ইত্যাদি উচ্চ প্রথা-র অবসান ঘটে। তাঁর রাজসভায় বেশ কয়েকজন ভারতীয়তাবাদী সমাজ হান পেয়েছিলেন। তাঁর কাব্যপ্রতিভা ছিল প্রসারশীল। তাঁর রাজত্ব চিহ্নটি কাব্যপ্রয়োগে প্রকাশ্যেই সমাজতাবকরা। এর মাধ্যমে 'ফুলনমসল' ও 'হোহী' গ্রন্থের মৌলিক সীমালোচনা-উৎসব-উৎসব-উৎসব পাওয়া যায়। এমনকী 'ব্রজব্রজ' ভাষাতে কাব্যরচনার যে ধারা তিনি সৃষ্টি করেছিলেন, ফরাসী বীর্ষশাস্ত্র 'ভানুসিংহের পদাবলী' (১৮৮৪) কাব্যপ্রয়োগে অনুসরণ করেছেন। বিদ্যমানসল নাম করেন 'ভানুসিংহের পদাবলী'। অনেক ছন্দর পেরে মহারাজা বীর্ষশাস্ত্রের ভাবা পেরে তিনি পণ্ডিত রামানুজায় তর্কপারদ্বয় দিয়ে টাকা ও বাংলানামসল শ্রীমদ্রামায় বর্টী সঙ্গীতরচনা করে ও তার প্রয়োগে ব্যবস্থা করেন। মহারাজা বীর্ষশাস্ত্রের বীর্ষশাস্ত্রের পদাবলী বই-একটি ছাড়া সৃষ্টি করেছেন। বিদ্যমানসল নাম করেন 'ভানুসিংহের পদাবলী'। মহারাজা বীর্ষশাস্ত্রের নিম্নলিখিত বীর্ষশাস্ত্রের

অন্যনা অর্থেক রাজ্যের মতইনি ছিলরাজ্য রাণাসাহসনে  
চারটি মোটামুটি মসীমওসীরা হাতেই ছিল, অনেক ক্ষেত্রে রাজ্যের  
সব কথা না জানিয়েওসীরা মধ্যস্থত করছিলেন এবংও সফল  
হয়েছে। রাজ্যসাহসনের অনেক জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য  
মহারাজ রাধাকিশোর রবীন্দ্রনাথের শরণায় হয়েছিলেন এবং  
রবীন্দ্রনাথ চিঠিতে তাঁকে রাজনীতি ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সব  
উপদেশ দিয়েছেন। মসীমওসীর নিয়োগ, রাজ্যের আর্থিক সুরক্ষা  
বাংলা, বাঙালি তৈরি করা, রাজ্যের প্রশাসন ব্যবস্থার বৈধতা  
করা, শিক্ষাবিহী ইত্যাদি সব বিষয়ই রবীন্দ্রনাথ মহারাজের  
উপদেশ নিয়েছিলেন এবং রাধাকিশোর অনেকটাই রবীন্দ্রনাথের  
ওপর নির্ভর করতেন। এ জন্য কবিকও “বারবার যখন  
হেনন জ্বালা সহ্য করত হয়েছিল কিছু তাই এখনও সন্দেহভাজন  
হয়নি।” ছিলরাজ্য পরিবারের কাছে এখনও রবীন্দ্রনাথের  
হাতেলেখ্য সব চিঠি ও বিবর্তন সমগ্রত রক্ষিত আছে। মহারাজ  
বালাকিশোর খন্ডাবের নিজস্ব, শিশু ও সাহিত্যের পুঁথীসাহসনা  
করতেন। রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্র সুর, পদ্যলেখার কাজ অর্থাৎ  
বন্দ হয়ে যাচ্ছে, এতদ্বা সাহায্যের পরোয় কাছে ফেলি  
তাই জগদীশচন্দ্রকে ৫০,০০০ টাকা অর্থ সাহায্য পাঠিয়েছিলেন। তখন  
ছিলরাজ্যের রাজস্বের সবে কিছু সমস্যা ছিল, তা সত্ত্বেও তিনি  
এই সাহায্য করেছিলেন। এই সাহায্যের ফলত জগদীশচন্দ্র বিহার  
রাজ্যে গবেষণার কাজ চালানতে সক্ষম হয়েছিলেন। অল্প  
কয়েক বছর দুইয় অসুখ্য পড়তেন (জন্ম তিনি রাজ্য  
আজীবন বৃত্তি মজুর করেন। পণ্ডিত দীনেশচন্দ্র সেনের জন্য  
তিনি মালিক বৃত্তি মজুর করেছিলেন। দীনেশচন্দ্র সেনে রাজ্য “বৈষ্ণব”  
বলত ছিলরাজ্য ইতিহাসের বিখ্যত বিবরণ তিনিই  
লেখ্য করেছিলেন। শাস্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয়  
প্রতিষ্ঠিত হবার সময় থেকেই বার্ষিক ১,০০০ টাকা অনুদান  
তিনি মজুর করেন। “বঙ্গদর্শন” পত্রিকার সম্পাদনা রবীন্দ্রনাথ  
নিজেহা করে নেবার পর তিনি ওই পত্রিকার জন্য আর্থিক



সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কিন্তু তা শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। কলীতে মোটর দুধনিয়ায় তাঁর আকৃষ্টিক মৃত্যু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।

মহারাজ বীরচন্দ্র এবং রাধাকিশোরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'বীরচন্দ্রের পুত্র রাধাকিশোর মালিকা আমার প্রতি তাঁর পিতৃদত্ত সমাদরের ধারাকে রক্ষা করেছিলেন। অকৃত্রিম স্নেহে তিনি আমাকে কাছে টেনে নিলেন। সেদিন রাজার হাত থেকে যখন কবির হিলক পেয়েছিলাম তখনও কবির যশ সন্ধানিত ও সঙ্গীর্ণ ছিল। আমার সেদিনকার বহু মিনা-কাঙ্ক্ষিত ব্যাতিত প্রতি তাঁর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা তিনি সমভাবে রক্ষা করেছিলেন। কেবলমাত্র কবি বলেই নয়, সুহৃদ ও ভ্রাতৃত্বভাবে তিনি আমাকে আত্মীয় করে নিয়েছিলেন।' সে এমন আত্মীয়তা, যা মিনা স্বভাব প্রত্যাশা করত না, যা বিরুদ্ধ বাক্যকেও স্বীকার করে নিতে কুণ্ঠিত হত না। আবার রাজ-পরিবারের সঙ্গে তাঁর প্রভাসপোষ উল্লেখ করে তিনি লিখেছিলেন, 'রাধাকিশোর ও বীরচন্দ্রের লেখার মতো চিঠি আমি খুব অল্পই দেখেছি। সেগুলি যেমন সযত্ন, তেমনই সুসংকল্প— তেমনই সরস। মাতৃত্বভাষাকে এমন সুনিপুণভাবে ব্যবহার করা এ যে তাঁদের রাজোচিত সৌন্দর্যই নয়! এই বৈদেহ্য, স্বদেশের সঙ্গীত-শিক্ষা-সাহিত্যের এই রসজ্ঞতা তাদের অভিজাততার গৌরব যোগ্য করে। এই সমস্ত তাদের বাস্তবিক মনোভাৱে দেখছি, সেই মনোভাৱ আমার কাছে তাঁদের চরিত্রের উজ্জ্বলতাই পরিচয় দিয়েছিল।'

রাধাকিশোরের আহ্বানে রবীন্দ্রনাথ প্রথম ত্রিপুরা সফরে যান। শুধু একবার নয়, তাঁর রাজকীয় কবির পাঁচবার ত্রিপুরা অমেনে গিয়েছিলেন। যথাক্রমে ১৮৯৯ সালে শ্রীপক্ষ্মী তিথিতে তিনি মহারাজ রাধাকিশোরের আমন্ত্রণে ত্রিপুরা যান। দ্বিতীয়বার যান ১৯০১ সালে। তৃতীয়বার ১৯০৫ সালে 'ত্রিপুরা সাহিত্য সম্মিলন'-র সভায় সভাপতিত্বে করতে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'কলকাতা' কাব্যগ্রন্থ মহারাজ রাধাকিশোরকে উৎসর্গপুষ্ট। 'কলকাতা' রাধাকিশোরের সর্বদর্শনার কলা 'সঙ্গীত সমাধি'—এ 'বিসর্জন' নাটকটি মঞ্চস্থ হয় ১৯০০ সালের ১৬ই ডিসেম্বর, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং রত্নপতির ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে ত্রিপুরা মহারাজের দেওয়ান হিসেবে নিয়েছিলেন (জনা) রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়কে ত্রিপুরা পাঠিয়েছিলেন। রমণীমোহন ছিলেন তাঁর বড় ভাই বিরেন্দ্রনাথ তাঁকুরের ভ্রাতা, বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী এবং এই রাজ্যের অধ্যাপক। মহারাজ রবীন্দ্রনাথকে মন্ত্রী-পরিষদে নিয়োগের জন্য নির্ভরযোগ্য কারণ নয় সুপারিশ করতে বলায় তিনি রমণীমোহনের নাম প্রস্তাব করেন। এই প্রসঙ্গ তিনি লেখেন, 'রমণীর প্রতি এমন অব্যাহতভাবে কর্মভার অর্পণ করিবেন

যাহাতে তিনি কোনও অংশে বার্থ না হন এবং সম্পূর্ণভাবে দক্ষতা প্রয়োগ করিবার ক্ষেত্র পান।' আর একটি চিঠিতে লিখেছেন, 'মহারাজাকে আমি পুনঃ জানাইতেছি রমণীকে রাজকাণ্ডে নিযুক্ত করিলে তাহার বিশ্বাসতা, দক্ষতা, দুর্দশাচিত ও সহনশক্তি-গুণে মহারাজ নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট এবং সন্তুষ্টিভাৱে নিশ্চিত হইতে পারিবেন।' এর থেকেই যোগ্য যান রমণীমোহনের কর্মদক্ষতা ও বিশ্বাসতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কতটা আহুশীল ছিলেন। তাঁর রমণীমোহনের রাজমন্ত্রী পদে অভিরূপের মনে তিনি চতুর্থবার ত্রিপুরা যান (১০ই নভেম্বর, ১৯০৫)। ত্রিপুরা রাজদরবারের চক্রান্তে কিন্তু রমণীমোহন বেশি দিন ঢলেক আকড়ে পারেননি, বছর দেড়েক পরেই তাঁকে ত্রিপুরা থেকে চলে আসতে হয়। শুধু রমণীমোহনই নয়, কবির অনুরোধে রাজার প্রাইভেট সেক্রেটারি হয়েছিলেন যতীন্দ্রনাথ বসু, ভোড়াকালো ঠাকুর পরিবারের যত্নে অক্ষয় চৌধুরীর জামাতা। কবির পক্ষমহাবীর ত্রিপুরাযাত্রা ৩ই ১৯০৫ সালেই, বরিশালে 'প্রাসঙ্গিক বসীয়া সাহিত্য সম্মিলন'—এ সভাপতিত্ব করতে যাওয়ার পথে তিনি আগরতলায় এসেছিলেন।

১৯০৯ সালে রাধাকিশোরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বীরেন্দ্রকিশোর মালিকা রাজা হন। বীরেন্দ্রকিশোরের অভিরূপের পর রবীন্দ্রনাথ নিজেকে অনেকটা সরিয়ে নিয়েছিলেন। তবে রাধাকিশোরের আম এক পুত্র রাজপুত্র ব্রজেনকিশোরের সঙ্গে কবির বন্ধারই যোগাযোগ ছিল। বারবার তিনি চিঠিতে ব্রজেনকিশোরকে নানাবিধ উপদেশ দিয়েছেন এবং এই বন্ধনের কিছু চিঠি 'প্রাসঙ্গী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৮৬ বঙ্গাব্দের আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায়। রাজপুত্র ব্রজেনকিশোর এ সম্পর্কে বলেছিলেন, 'তাঁর হাতের পশখ খাঁরা পেয়েছি, তাঁরই অতুলে পশখের কঠোরছাৎ এক অনির্বচনীয় শাশ্বত প্রলপ। রবীন্দ্রনাথ আমার কাছে বী ছিলেন তা আপনাদের কাছে ভাষায় আমি ব্যর্থ করেছি অক্ষম। তাঁর আমায় প্রেমোচ্ছিন্ন এক, স্বজন বিয়োগের আঘাতও কম নয়। সব শোভাচরিত্র ভুলে যাই, কিন্তু কিছুতেই ভুলতে পারি না রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে আমার জীবনের মহানান্দন্য।'।

মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোরও ছিলেন সাহিত্য ও সঙ্গীতরসিক। তিনিও রবীন্দ্রনাথের প্রতি আশ্বাসী ছিলেন। মহারাজ আসেন ব্রজেনকিশোরের আমন্ত্রণে কবি শ্রীহট্ট থেকে আগরতলায়। আসেন ফাল্গুনের মতন ১৯১৯ সালে। সেবার তিনি 'কুব্জনা' প্রাসাদের ধারে টিলার ওপর তৈরি একটি ছোট বাড়িতে ছিলেন। সেটি পর্তমানের রসকৃষ্ণ এবং তার নাম হয়েছে 'মালকনিবাস'। বীরেন্দ্রকিশোরের শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের অতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। কবির অনুরোধে তিনি শান্তিনিকেতনে নৃত্যশিক্ষার

জনা মণিপুরি নৃত্যগুরু রাজকুমার বুদ্ধিমন্ত সিংহ ও তাঁর স্ত্রীকে শান্তিনিকেতনে পাঠান। পরবর্তীকালে তাঁকুর নবকমার তাঁকেও শান্তিনিকেতনে নৃত্যশিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন। আশ্র একথা অবশিষ্ট যে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন তৃত্যনাট্যে মণিপুরি নৃত্যকলা সুবিদিত হয়। কিন্তু এর মূল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ত্রিপুরার রাজপরিবারের ঘনিষ্ঠনের সম্পর্কে নিহিত।

ত্রিপুরার শেষ স্বাধীনরাজ্য বীরব্রজমিশোর মালিকা। তিনিও তাঁর পিতা ও প্রপিতামহের মতই নিপুণ ও সাহিত্যে আত্মীয় ছিলেন, নিজে ভাল সেতারও এসরাজ বাজাতেন। ১৯২৬ সালে রবীন্দ্রনাথ আগরতলায় এই কিশোর মহারাজের সঙ্গে পরিচিত হন। এবার তিনি বাস করেন মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোরের তৈরি 'পুষ্পক' প্রাসাদের পূর্বের অংশে। এই প্রাসাদ এবং বাগানে রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু গান রচিত হয়েছে। এই অংশটি বর্তমানে ত্রিপুরার রাজভবনের অংশ এবং দক্ষিণ দিকের বাগানটির নাম হয়েছে 'রবীন্দ্রকান্দ'। সেবার কবিকে 'কিশোর সাহিত্য সমাধি'—এর পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় ১৩৩২ বঙ্গাব্দের ১০ই ফাল্গুন। এই সংবর্ধনাসভায় কবির অভিভাষণে তিনি বলেছিলেন, 'আমরা এই শেষ কাল জিনিষে যাই যে, আমি যশোভাগ্যবান কবির মতো এখানে মান নিতে আসিনি, আমি স্বর্ণপত্ন মহারাজদের বন্ধুস্বপ্নে যেমন আমার তরুণ বয়সে এখানে স্রীতি ও শ্রদ্ধা ভাল করেছি, আজ আমার শেষ বয়সেও এই আত্মীয়তার শেষ চেষ্টাকৃত ভোগ করে বলে যেতে এসেছি "সর্বস্বত্বত্ব দুর্গম সাহিত্যভ্রমনি পয়াত্ব"। এই সর্বশেষ ত্রিপুরা সফরে কবির সঙ্গে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী, নিপুণী, মিলেন্দ্রনাথ ও অধ্যাপক পেন্ডুনী মরিস। তাঁদের আঘাউটা স্টেশনে অভ্যর্থনা করেন মহারাজকুমার ব্রজেনকিশোর, মহারাজকুমার রাধাকিশোরকে ও আরও অনেকে। পরে দেখা করতে আসেন নবীম মহারাজ্য বীরব্রজমিশোর মালিকা। ১০ই থেকে ১৪ই ফাল্গুন (২২শে থেকে ২৬শে ফেব্রুয়ারি, ১৯১১) ত্রিপুরা যাত্রাকাল প্রকৃতভাবে শোভা দেখে রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়েছিলেন। সেইসময়ে হলো কয়েকটি একক ও রূপ ফটোগ্রাফ প্রকাশিত হয় 'রবি' পত্রিকার বীরব্রজসংলগ্ন সংখ্যায়। ১৯০১ সালে রবীন্দ্রনাথের ৭০ বছরের জন্মদিন উপলক্ষে কলকাতার টাউনহলে 'রবীন্দ্রশ্রদ্ধা প্রদর্শনী' ও মেলা। আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন তরুণ মহারাজ বীরব্রজ। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ত্রিপুরার সম্পর্কের উল্লেখ করেন বলেছিলেন, 'আমি তাঁরই "ত্রিপুরার কবি" বলিয়া অর্থ প্রদান করিতেছি।' ১৯০৯ সালে মালিকা বীরব্রজমিশোর শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের অতিথি হয়েছিলেন। এই বছরে ৬ই জানুয়ারি মহারাজ্য সপরিবার শান্তিনিকেতনে আসেন।

অগ্রকূলে স্নেহে আনুষ্ঠানিক সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সঙ্গীতভবনের রসমঞ্জরী নির্মাণের জন্য মহারাজ্য কৃষ্টি হাজার টাকা অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। ১৯৪১ সালে সাম্রাজ্যবাদ দমনায় পীড়িত বেশ কয়েক হাজার মানুষ পূর্ব বাংলা থেকে ত্রিপুরায় আশ্রয় নিতে আসেন। এই প্রসঙ্গে তাঁদের মুক্তহস্তে সাহায্য করেছিলেন, এ সবদল পেয়ে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে বাসে মহারাজের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাভাবন করেছিলেন। মৃত্যুর মাত্র তিন মাস আগে মহারাজ্য বীরব্রজমিশোরের কবিকে 'ভালো ভক্তের' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন। এক হিসাবে, কবির জীবনের প্রথম ও শেষ সম্মান এসেছিল এই ত্রিপুরার রাজবাংলা থেকে।

ত্রিপুরার রাজপরিবারের সঙ্গে চারপঞ্চ-স্থায়ী রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক উল্লেখ করতে গিয়ে রবি পত্রিকায় প্রমথনাথ বসী লিখেছেন, 'রাজা ও কবিতো উভয়ে সম্বন্ধ, সকলে দেখেই বিবল। যেটেরে স্নেহে Weimar-এর Duke-এর হলুতায় ও যোগাযোগ বোধকরি ইহার একমাত্র অনুরূপ।' এই একই বিষয়ে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য: 'রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ-পরিবারের যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল, তার নাম আমরা কবিচিত্রের একটি বিশেষ দিকের স্তরান পাই। তিনি নিয়েছিলেন—এই প্রভাতকুমারী বাসবংশকে বাঙালী জীবনের শিরোভূষণ করণে—সর্বভাষাভাষে আদর্শ রাষ্ট্র সেখানে গড়তে, ভারতীয় সংস্কৃতির মূর্তি সেখানে প্রতিষ্ঠিত করতে। এই বিষয়টি আলোচনা করতে গিয়ে স্বভাবতই জামানি করে ও মনীষা গোটের কথা মনে হয়। যৌবনে তিনি বাইমার-এর (Weimar) রক্তচোষা প্রব্রব প্রব্রবন এবং সেখানে নানা বিষয়ে সংস্কার আনবার চেষ্টা করেছিলেন। একটা বড় আদর্শবাদ থেকেই অপ্রতিরোধ্য করেছিল। তবে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য যথেষ্ট তা, যেটেরে জীবনচিত্র পাঠে মনেই থাকে; জানেন; রবীন্দ্রনাথের নৈর্ব্যক্তিক মন কখনো কোথাও থাকা পড়েনি—নির্মলপ্রভাবেরে নয়। চলে যাওয়াই তাঁর ধর্ম। তাই ত্রিপুরা-রাজপরিবারের প্রেমে আবৃত্তি হতেও কিছুটা চোঁটে ন্যায় ভীকমাপন করতে পারেননি। সেই জন্য কবিতো ইচ্ছা করে, যেটেরে সঙ্গে তাঁর মিল যত বেশী, অমিলও ঠিক ততখানি।'

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের রচনার ওপর ত্রিপুরার প্রভাব সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা প্রয়োজন। সকলেরই জানা আছে যে ত্রিপুরার ইতিহাসকে অবলম্বন করেই রবীন্দ্রনাথ 'রাজবী', 'মৃত্যু' ও 'বিসর্জন' এই তিনটি বই রচনা করেন। ১৮৮৫ সালে সোভোভ্রান্সের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী 'বালক' নামে একটি ছোটোদের পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই 'বালক' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের জার্মান উপন্যাসের অংশবিশেষ অর্থাৎ প্রথম ২৬টি অধ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় ১৯২২ বঙ্গাব্দের আঘা



থেকে মাঘ সংখ্যা পর্যন্ত। কাহিনিটি সপ্তদশ শতাব্দীতে মহারাজ গোপবিন্দুমণিক ও তাঁর ভাই ছত্রমণিকা (নক্ষত্র রায়) এর রাজত্বকালে এবং ত্রিপুরার শাস্ত্রমণ্ড ও বৈষ্ণবধর্মের সম্মেলনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই কাহিনিতে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ‘স্বপ্নলব্ধ গল্প’। এ প্রসঙ্গে ‘জীবনমুখি’ গ্রন্থে লেখা হয়েছে: ‘দুই-এক সংখ্যা বালক বাহির হইবার পর একবার দুই-এক দিনের জন্য সেওঘরে রাজনারায়ণবাবুকে দেখিতে যাই। কলিকাতায় ফিরিবার সময় রাস্তায় গাড়িতে ভিড় ছিল, ভাল কায়দা ঘুম হইতেছিল না, ঠিক চোখের উপর আলো ছলিতেছিল। মনে করিলাম, ঘুম যখন হইবেই না, তখন এই সুযোগে বালকের জন্য একটা গল্প তালিয়া রাখি। গল্প ভাবিবার ব্যর্থ চেষ্টার চাপে গল্প আসিল না, ঘুম আসিয়া পড়িল। স্বপ্ন দেখিলাম, কেন্দ্র এক মন্দিরের সিঁড়ির ওপর বলির রক্তচিহ্ন দেখিয়া একটি বালিকা অত্যন্ত করুণ ব্যাকুলতায় সঙ্গে তাহার ব্যাপকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, ‘বাবা, এ কী। এ যে রক্ত’। বালিকার এই কাতজন্তর তাহার বাপ অন্তরে ব্যথিত হইয়া অথচ বাহিরে রাগের ভান করিয়া কোনোমতে তাকে প্রত্যাকে চাপ দিতে চেষ্টা করিতেছে—জানিয়া উঠিয়াই মনে হইল, এটি আমার স্বপ্নলব্ধ গল্প। এমন স্বপ্ন-পাখোয় গল্প এবং অন্য লেখা আমার আরও আছে। এই স্বপ্নটির সঙ্গে ত্রিপুরার রাজা গোপবিন্দুমণিকের পুরাণ্ড মিশাইয়া গল্প মাসে মাসে লিখিতে লিখিতে বালকে বাহির করিতে লাগিলাম।’

উপন্যাসটির শোষণে রচনাকালে এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশের অল্প পূর্ব তিনি ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্রকে এক চিঠি লেখেন। সেই চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, ‘মহারাজ বোধ করি অনিয়া থাকিবেন যে, আমি ত্রিপুরা-রাজবংশের ইতিহাস অলঙ্ঘন করিয়া ‘রাজর্বি’ নামক একটি উপন্যাস লিখিবেছি। কিন্তু তাহাতে ইতিহাস রক্ষা করিতে পারি নাই। তাহার কারণ, ইতিহাস পাই নাই। এ জন্য আপনাদের কাছে মার্জনা প্রার্থনা বিধিতে বিরক্তনা করিতেছি—আমাদের অনেক বিলম্ব হইয়াছে, তৎপরি মহারাজ যদি গোপবিন্দুমণিক ও তাঁহার আতার রাজত্বসময়ের সবিশেষ ইতিহাস আমাকে প্রেরণ করিতে অনুমতি করেন, তবে আমি যথাসম্ভব পূর্ববর্তন করিতে চেষ্টা করি। মহারাজ গোপবিন্দুমণিক তাঁহার নির্বাসনকাল চট্টগ্রামের কেন্দ্র হানে কীরূপ অবস্থায় ছিলেন যদি জানিতেন পারি তবে আমার যথেষ্ট সাহায্য হয়। প্রাচীন রাজধানী উদয়পুরের সঙ্গে ঐকিহাসিক ত্রিপুরার অন্যান্য স্থানের ফটোগ্রাফ যদি পাওয়া সম্ভব হয় তাহা হইলেও আমার উপকার হয়’ (২৩শে বৈশাখ, ১২৩৬ বঙ্গাব্দ)। প্রায় একই সময়ে রবীন্দ্রনাথ বোম্বে শহরধারী ত্রিপুরার রাজা অরুণমণিকের কাহিনি অলঙ্ঘন ‘মুক্ত’ উপন্যাসটি লিখেছিলেন। এর উত্তরে মহারাজ বীরচন্দ্র

লিখেছিলেন, ‘মুক্ত’ ‘রাজর্বি’ নামক দুইটি প্রবন্ধই আমি পাঠ করিয়া দেখিয়াছি। ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বন্ধে যে যে স্থলন হইয়াছে, তাহা সংশোধন করা আপনার বিশেষ কষ্টসাধ্য হইবে না। ‘রাজরত্নাকর’ নামে ত্রিপুরা রাজবংশের একখানা ধারাবাহিক সম্বৃত্ত ইতিহাস আছে। এই গ্রন্থ ধর্মমণিকেশ্বর রাজত্বসময়ে সম্বলিত হইতে আরম্ভ হয়। উক্ত রাজরত্নাকরে আর একখানা প্রাচীন সম্বৃত্ত ভাষায় লিখিত ‘রাজমালা’র উল্লেখ আছে; কিন্তু সেই প্রাচীন রাজমালা এখন কোথায় অনুসন্ধান পাওয়া যায় না। রাজমালা বলিয়া যাহা প্রচলিত তাহা রাজরত্নাকর হইতে সংক্ষিপ্ত ও সংপৃষ্ঠীত এবং বাঙ্গালা পদ্যে লিখিত। সাধারণে পাঠ করিয়া মনে অনায়াসে বুদ্ধিতে পারে এই অভিগ্রহের দ্বিতীয় ‘রাজমালা’ রচিত হইয়াছে। আপনি যে ত্রিপুরা ইতিহাস অলঙ্ঘন করিয়া নবন্যাস লিখিতে যত্ন করিতেছেন, ইহাতে আমি চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। যে যে স্থলে ইতিহাসের সহায়তা প্রয়োজন একান্ত বাসনা। ঐতিহাসিক কোন বিশেষভাগের সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ করিয়া দিতে প্রবৃত্ত আছি। আপনার অপর্যাপক বিষয়ে প্রশংসিত প্রবন্ধগুলিতে ইতিহাসের যথার্থ ব্যাখ্যা থাকে, ইহা আমারও একান্ত বাসনা। ঐতিহাসিক কোন বিশেষভাগের সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হইলেই, উদয়পুরের যে কয়েকখানা ফটোগ্রাফ আছে তাহার বিবরণ লিখিয়া ইহার পর তাহা আপনার নিকটে পাইয়াছি। (১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১২৩৬ বঙ্গাব্দ)। এর দ্বিতিকাল পরে ১৯০০ সালে ‘রাজর্বি’ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রায় একই সময়ে রবীন্দ্রনাথ রাজর্বির কাহিনিটির ন্যায়রূপ দিয়ে ‘বিসর্জন’ নামে করেন (১৮৯০)। অনেক পরে ১৯২৬ সালে ত্রিপুরা সফরকালে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ‘গোমতীর বুক থেকে গোপনমণির প্রেরণ। হইতে ভূবনেশ্বরীর মন্দিরে—অদূরে গোপবিন্দুমণির প্রসাদ। হ্যাঁ, মহারাজ বীরচন্দ্র ‘রাজর্বি’ রচনার যুগে আমায় অনেক সাহায্য করেছেন ইতিহাস, কবিকল্পী, পাহাড়ি ছড়া, ত্রিপুরার রূপকথা আর নানা খবর পাঠিয়ে। ‘রাজর্বি’তে আমি কিন্তু আমার কল্পনারই পরিবেশ একেছি। তোমরা বলছ, প্রাচীন উদয়পুর আর গোপবিন্দুমণিকের বাড়ি আমায় দেখানো—সে আমি আর দেখতে চাই নে। আমার কল্পনার ‘রাজর্বি’ চিরকাল আমার কল্পনারই অবিচলিত থাকুন। অনুরাগী উত্তরসারকণ্য তাঁদের মনসস্বর্ণে ভূবনেশ্বরীর দেউল গড়ছেন।’ ‘মুক্ত’ অবশ্য এই সময়ের উপলক্ষে হলেও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে অনেক পরে, সম্ভবত ১৯০৮ সালে।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের রচিত গানগুলির সঙ্গে ত্রিপুরার সম্পর্ক আলোচনা করাও অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ‘রাজর্বি’ উপন্যাসে কবি দুটি গান ব্যবহার করেছিলেন—‘হরি, তোমায় ডাকি, সংসারে একান্তী’ (১২৯২ ভাট) এবং ‘আমায় ছলনায় মিলে পদ দেখায় বলে’ (১২৯৩)। প্রথম গানটির পাঠ্যভার আছে এবং কবির ভীকৃন্দায় অন্য কোনও গীতগ্রন্থে মুদ্রিত হয়নি। দ্বিতীয় গানটি ‘আমার পিঁই’ (১৮৯৩) বইতে মুদ্রিত হয়েছিল। দুইটি ব্যাক কবির কবীর গান।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে ১৯০০ সালে মহারাজা রাধাকিশোরের সম্মানার্থে ‘বিসর্জন’ নাটকটি অভিনীত হয়। নাটকটি ১২৯৬ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে রচিত এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১২৯৭ বঙ্গাব্দের ২রা জ্যৈষ্ঠ (১৮৯০)। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ রত্নপত্রের ভূমিকায় অভিনয় করেন। তখন এই নাটকে ৬টি গান ব্যবহৃত হয়েছিল—যদিও রক্ত শব্দে কান্টামুড় বেয়ে, আমি একলা চলছি এ ভাবে, উলসিনী নাচে রত্নপদে, ওগো পুরবাসী, আমার কে নিবি ভাই সঁপিতে চাই আপনাকে এবং থাকতে তো আর পারলি নে মা পারলি কই। পরবর্তীকালে ন্যাট্যানুষ্ঠানের সময় কোনও কোনও গান বর্জিত হয়েছে। প্রত্যেক গানগুলির প্রত্যেকটি ‘আমাদের বই’ (১৮৯৩) বইতে বিবরণ অংশে অন্তর্ভুক্ত ছিল, ব্যতিক্রম কেবল ওগো পুরবাসী গানটি, এটি ‘গান’ বইতে (১৯০৯) অন্তর্ভুক্ত হয়।

পরবর্তীকালে ১৯২২ সালের ২৫শে, ২৭শে ও ২৮শে আগস্ট অপর্যায়ের রঙ্গমঞ্চে বিসর্জন নাটকটি আবার অভিনীত হয়। রবীন্দ্রনাথ নিজে ভূয়সিংহের, মিনেন্দ্রনাথ রত্নপত্রের, আগরকলা খেঁক কলকাতা ফেরার পথে লিখেছিলেন—জানি তোমার অন্তর নাহি গো। এই গানগুলির প্রথমটি ‘রবি’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ‘প্রবাসী’, ‘সবুজপত্র’ ও ‘বিশ্বভারতী’ পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। সূত্রবাহী এই গানকটির সঙ্গে ত্রিপুরার যোগাযোগ ছিল সরাসরি।

#### তথ্যসূত্র:

- ১) জীবনমুখি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ, ১৯৬১), গ্রন্থ পরিচয় ও তথ্যপত্র সমেত।
- ২) রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (দেখ, ১৯৭১, ১০৫১ বঙ্গাব্দ; দেখ পূর্ববর্তীকালী প্রবন্ধ সংস্করণ (১৯৩০) এ সংশ্লিষ্ট ও পুনর্মুদ্রিত)।
- ৩) অন্যান্য বহুদলে এক কবি এক রাজকুল—বিভিন্ন চৌধুরী কৌরব সহিত পত্রিকা, বিশেষ পত্রিকা সংখ্যা, ২০০২।
- ৪) Tagore's Immortal ties with Tripura—Bikach

জয় জয় পরমা নিম্ভুতি, হে আধার রাতে একলা পাগল যায় কৈসে, আমার যাবার বেলায় পিছু ডাকে এবং কোন উল্লেখ হয় দেখাবি। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে গানগুলি ১৩০০ বঙ্গাব্দের ভাত্র মাসে রচিত। এই গানগুলি যথেষ্ট পরিচিত এবং সবগুলিই ‘গীতবিন্দন’ গ্রন্থে বর্ণিত (১৯৩১) প্রকাশিত হয়েছিল। অবশ্য তার আগেও এর মধ্যে কোনও কোনও গান ‘প্রবাসী’ গ্রন্থে (১৯২৫) মুদ্রিত হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ সাত বার ত্রিপুরা ভ্রমণে গেলেও ১৯২৬ সালে তাঁর শেষ সফরেই কেবল কয়েকটি গান লিখেছিলেন। প্রভাতকুমারের ‘গীতবিন্দন কালানুক্রমিক সূচী’ (১৯৭৬) অনুসারে এর আগে ১৮৯৯, ১৯০১, ১৯০৫ ও ১৯১৯ সালে যে ক’বার রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরা গিয়েছিলেন সেই সময়কালে ত্রিপুরায় রচিত আর কোনও গানের সন্ধান পাইনি। ১৯২৬ সালে ত্রিপুরা সফরে রচিত গানগুলির মধ্যে আছে ‘অনন্তের বাণী তুমি’, যা রচিত হয়েছিল রমেশচন্দ্র ভট্টশালার কন্যার বিবাহ উপলক্ষে। রচনাকাল ১১ই ফাল্গুন, ১৩০২ বঙ্গাব্দ। এরপরে ১০ই থেকে ১৫ই ফাল্গুন আগরতলায় বাসকালে আরও দুটি গান লিখেছিলেন—বনে ঘনিষ্ঠ ছিলি কেনে সেই পিঁই এবং আপনহারা মাতোয়ারা আছি তোমার আশা ধরে। এরপর ১৫ই ফাল্গুন শ্রীমতী রেবা মল্লানবিশের বিবাহ উপলক্ষে লিখেছিলেন আরও দুটি গান—দোলে দোলে গেলো প্রেমের পিঙ্গল-চাঁপা আর যাগনের নবীন আশ্রমে। সম্ভবত রচনার দিন দেলপুটিক ছিল এবং এই তথ্য সুশোভন সরকারের একটি চিঠি থেকে জানা গেছে। সম্ভবত ১৬ই ফাল্গুন সপ্তমীর আগরকলা খেঁক কলকাতা ফেরার পথে লিখেছিলেন—জানি তোমার অন্তর নাহি গো। এই গানগুলির প্রথমটি ‘রবি’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ‘প্রবাসী’, ‘সবুজপত্র’ ও ‘বিশ্বভারতী’ পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। সূত্রবাহী এই গানকটির সঙ্গে ত্রিপুরার যোগাযোগ ছিল সরাসরি।

Chowdhury, ইরফানউল খোকা।

- ১) বীরচন্দ্র কালানুক্রমিক সূচী—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৯৬৬, সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ট্রোয়ার রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ২০০৫)।
- ২) রবীন্দ্রনাথের অষ্টাদশজন্ম—সম্মান সেতুগু (সহিগু সংস্করণ, ২০০৫)।
- ৩) নান্দারের রবীন্দ্রনাথ—সম্পাদনা বিষ্ণু শর্মা ও অরুণকমল মিত্র (দেখ, ২০০০) গ্রন্থে সংশ্লিষ্ট চিঠি বর্ণন। ত্রিপুরায় কবির সম্মেলন পদার্থ—বিজ্ঞানভিত্তিক বস্তু এবং ভক্তবৎ রবীন্দ্রনাথ—হীরেন্দ্রকুমার বৈদ্যকবি।



## বাংলা বানান ও বর্ণমালা সংস্কারে চাই দুই বাংলার যৌথপ্রয়াস

সূর্য্যংশু ভট্টাচার্য

ছয় দশকে আমাদের প্রায়ই কলকাতার বই-পাড়া কলেজ স্কোয়ারে যেতে হত। কারণ আমি যে-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলাম। সেই বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতির সভাপতি ডক্টর দ্বিজেন্দ্রবিদ্যাসিনহা প্রগতিবাদী বিদ্যালয়ে মজার বুক এজেন্সিতে আড্ডা দিতেন। এই আড্ডায় অনেকে যোগ দিতেন, এর মধ্যে অনেকে ছিলেন ব্যাতিমান লেখক। এই লেখকদের মধ্যে একজন ছিলেন আশী-উত্তীর্ণ দেবপ্রসাদ ঘোষ। দেবপ্রসাদ ঘোষ কেবল গণিতবিদ ছিলেন না তিনি বাংলা বানানসমস্যা নিয়েও চিন্তাশীল ছিলেন। বাংলা বানান নিয়ে তিনি প্রায়ই আড্ডাকে সরণম করতেন। তখন আমি বাংলা বানান নিয়ে যে সমস্যা আছে সে সম্বন্ধে অবহিত ছিলাম কিন্তু তার বিশদ বিবরণ জানতাম না। তবে একথা বুঝতে পারতাম যে দেবপ্রসাদবাবু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সম্পর্কিত কমিটির প্রস্তাবিত সংস্কারগুলোর সঙ্গে সহমত ছিলেন না। তিনি সংকৃত ব্যাকরণকে মান্য করে বাংলা বানানের নীতি হিরণ্যকরা পক্ষপাতী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এবং সুমিত্রকুমারকে প্রায়ই তিনি ব্যঙ্গ্যকৃত বাংলা বন্ধ করতেন। প্রসঙ্গ: তাঁদের প্রস্তাবিত বানান নীতি: এই নীতি দেবপ্রসাদবাবুর হাসির অমুখরত খনি ছিল। পরে অবশ্য আলোচনা সূচ্যোগ হয়েছিল দেবপ্রসাদ ঘোষের বানান সম্পর্কিত বক্তব্যের যাচাই করে দেখার।

বাংলা বানান নিয়ে একটা ইহিত্য দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ 'কলাক' প্রক্রিয়ায়। সেটা ১৯৯২ সাল। প্রবন্ধের নাম 'বাংলা উচ্চারণ'। উচ্চারণের সঙ্গে বানানের অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক। সে যাই হোক ১৯৩৬ সালের পূর্বেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিভাষা সমিতি গঠন করেছিল। এই সমিতিতে সম্প্রসারিত করেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গঠন করে বানান-সংস্কার সমিতি। এই বানান-সংস্কার কমিটির প্রতিবেদন নিয়েই দেবপ্রসাদ ঘোষের মতো অনেকেরই ক্ষেত ছিল।

১৮৬৪ সালে দেবপ্রসাদ ঘোষ তাঁর 'বাস্তবতা ভাষা ও বানান' পুস্তকটি প্রকাশ করেন। এই পুস্তকটি ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ুক্ত বানান-সংস্কার কমিটির সুপারিশের পরে

প্রকাশিত প্রথম পুস্তক। দেবপ্রসাদ ঘোষ তাঁর জীবনকালে ছিলেন একজন সত্ৰম আদায়কারী ব্যক্তিত্ব। তাঁর 'মুখশক্তি' ছিল ইষবীয়া। বাংলা বানান নিয়ে তাঁর প্রতিবাদী বক্তব্যের জন্যই বানান-সংস্কার সমিতির সভায় তাঁকে আহ্বান করা হয়েছিল। তাঁর পুস্তকের দুটি শব্দ, 'বাস্তবতা বানান' এবং 'বানান সমিতি'কে কয়েক ঘণ্টা তাঁর মতামতের ঝটিকা। পুস্তকটির পরিশিষ্টে 'কর্তার ইচ্ছায় কথ' নামক একটি চিঠি সম্বলিত। এই অংশে বানান-সংস্কার কমিটির সুপারিশের রয়েছে কিছু সমালোচনা। কবিরাজ সম্বন্ধে দেবপ্রসাদ ঘোষের পক্ষ বক্তব্য 'যে নয় (৯) হলে, বর্ধিত হয়, সেখানে সর্বদাই এইরূপ ইচ্ছা থাকে, শিষ্ট প্রাণেই ইহার কোনো ব্যত্যয় নাই।' বিসর্গ বর্জন নিয়ে তাঁর বিশ্বপাশ্বক মন্তব্য ছিল- 'বিসর্গ বর্জন করলে 'ক্রমশ'র উচ্চারণ হবে 'লোমশ'-এর মতো, 'বস্তুত' শব্দটির উচ্চারণ হবে 'বস্তুত' শব্দের মতো এবং 'পিত' (পিতঃ) উচ্চারণ হবে 'শীত' শব্দের মতো। তিনি সর্বনাম 'কী' এবং অব্যয় 'কি'-এর মধ্যে পার্থক্য করার চেষ্টাকে অহেতুক বলে মন্তব্য করেন। সংকৃত শব্দের উত্তরজীবীকে দেবপ্রসাদ ঘোষ ছিলেন আত্মশীল। সে কারণেই 'কনি' শব্দ থেকে আসা বানান শব্দটিকে তিনি সর্বদাই 'বানান' লিখেছেন।

বাংলা বানান নিয়ে দেবপ্রসাদের পরে যিনি সবর হয়েছিলেন তিনি মণীন্দ্রকুমার ঘোষ। ১৮৮৫ সালে মণীন্দ্রকুমারের 'বাংলা বানান' পুস্তকটি প্রকাশিত। সময়েই হিসাবে দেবপ্রসাদ ঘোষের প্রায় চার দশক পরে মণীন্দ্রকুমারের পুস্তক। অবশ্য এই পুস্তকের প্রবন্ধগুলো পূর্বেই বিভিন্ন সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়ে সাড়া ফেলেছিল। মূলত তাঁর প্রবন্ধে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রজ্জিত বানানরীতির সীমাকব্ধতা এবং সেই বানানরীতি যে আরও আরও সমস্যার সৃষ্টিকারী তাই পক্ষ করা হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয় প্রজ্জিত প্রতিটি প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা রয়েছে মণীন্দ্রকুমারের পুস্তকে। বাস্তবদ্বিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি 'কার্তিক' শব্দটি যেহেতু 'কৃতিকা' শব্দ থেকে উৎপন্ন তাই তিনি 'কার্তিক' শব্দটির বানান 'কার্তিক'

রাখারই পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। অনুরূপভাবে 'আচার্য' বানানটিকে তিনি 'আচার্য' রাখার পক্ষে, যেহেতু আচার্য শব্দের বাংলা উচ্চারণ যে জ-বর্ণনি উপস্থিত তা য-ফলা জাত। মণীন্দ্রকুমার ও স্থানে ৭-এর বিকল্প ব্যবস্থাকে অগ্রসারীণীয়ে মনে করেন। মণীন্দ্রকুমার কখনও কখনও দেবপ্রসাদ ঘোষের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন। প্রথমসূচক সর্বনাম 'কী' এবং প্রসূচক অব্যয় 'কি' বানান তিনি গ্রহণ করেছেন। 'দারী' বানানটিকে রবীন্দ্রনাথ 'দারি' লেখায় দেবপ্রসাদ ক্ষুব্ধ কিন্তু মণীন্দ্রকুমার তাতে কোনও ত্রুটি খুঁজে পাননি।

বাংলা বানান নিয়ে ১৯৮২ সালে পরেচাশ্রয় মজুমদার একটি মূল্যবান পুস্তক রচনা করেন। পুস্তকটির নাম 'বাংলা বানানবিধি'। পুস্তকটি তিনটি পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ। প্রথমে তিনি বানান সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে তার সম্ভাব্য সমাধানের পথ সম্বন্ধে ইঙ্গিত করেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কারের প্রচেষ্টা সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করে তিনি এসেছেন বৈয়াকরণিক রীতিনীতিতে। পরেচাশ্রয় মজুমদার একেবারে বাস্তব জীবন থেকে বানান সমস্যার উদাহরণ আমাদের সামনে এনেছেন। বিভ্রাট, পোস্টার, সংবাদপত্র, টিউল ম্যাগাজিন থেকে উদাহরণ দিয়ে বানানের বিচিত্রতা দেখিয়েছেন। ফুল কলসেরের ছাত্রছাত্রী শিক্ষক-অধ্যাপক, কবি-প্রাবন্ধিক-উপন্যাসিক ও গল্পকারদের ব্যবহৃত বানানের বিভিন্নতা, পরেচাশ্রয়ের মতে উচ্চারণের নামাঙ্ক। চলিত ক্রিয়াপদের বানানের 'বৈচিত্র্য' একটি মৃদু সমস্যা বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। বানান সমস্যার সমাধানে তিনি তিনটি বিষয়কে শর্ত হিসাবে দেখেছেন। প্রথম শর্ত অধ্যাপকের জীবন করা। দ্বিতীয় শর্ত উচ্চারণ-অনুসারী বানান লেখার বিজ্ঞানিত বদ্ধ করা। তৃতীয় শর্ত উর্ধ্বকরার ব্যবহার, ও-কারের ব্যবহার এবং হ-চ-ট-থের ব্যবহার সম্বন্ধে উদারতা। বানান-সমিতির সুপারিশের দৃষ্টান্তমূলক আলোচনা করে পরেচাশ্রয় কিছু প্রস্তাব রেখেছেন। 'আ' ধ্বনির সঙ্গে তিনি 'দ্রা' ধ্বনির সংযোগ মতে প্রকাশ করেছেন। তিনি মনে করেন অনুধাবনের কলমে 'ড' ব্যবহার বেশি যুক্তিগ্রাহ্য। ফলে পরেচাশ্রয় 'বাংলা'র বদলে 'বাঙলা' লেখার পক্ষপাতী।

পরেচাশ্রয় মজুমদারের 'বাংলা বানানবিধি'র প্রকাশের পরে বানান সমস্যা নিয়ে অধ্যাপক পবিত্র সরকার একটি উল্লেখযোগ্য পুস্তক প্রকাশ করেন। পুস্তকটির নাম, 'বাংলা বানান সংস্কার: সমস্যা ও সমাধান'। প্রকাশের কাল ১৩৯৪। অধ্যাপক সরকার একজন ভাষাবিজ্ঞানী। তাই ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি বাংলা ভাষার বানান সমস্যাকে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। বানান ভুলের সমস্যাকে তিনি যথোচিত গুরুত্ব দিয়ে

আলোচনা করেছেন। বানান লিখতে গিয়ে 'শ্বলন এবং বানান লিখতে গিয়ে ভ্রান্তি এক নয়, তুল্যমূল্যও নয়। 'শ্বলন ও ভ্রান্তির বিবিধ কারণ তিনি অনুসন্ধান করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বাংলা ভাষার বর্ণ নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন করেছেন। বর্ণমালার জন্যই যে অনেক সময় বানানে বিভ্রান্তি আসে, তা নিয়েও অধ্যাপক সরকার আলোচনা করেছেন। বাংলা ক্রিয়াবাচক শব্দের ভাবাত্মকতা বিশ্লেষণ পুস্তকটিকে বদনাম করে তুলেছেন।

অধ্যাপক সুভাষ ভট্টাচার্যের 'বাংলা ভাষা চর্চা' একটি উল্লেখযোগ্য প্রাসঙ্গিক পুস্তক। পুস্তকটির প্রকাশকাল ১৯৯২ সালে। অধ্যাপক ভট্টাচার্য নানা পরগণত্রিয়াক বাংলা ভাষার সমস্যা নিয়ে ইতিপূর্বেই কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। পুস্তকটির ভূমিকায় আছে, 'প্রাতঃস্মরণীয় মণীন্দ্র মণীন্দ্রকুমার ঘোষের সামনে এসে একসময়ে অনেক কিছু শিখেছি যেমন, তেমন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতে তর্ক করার পূর্ণাঙ্গ দেখিছি।' এই উল্লেখ থেকে বোঝা যায় যে অধ্যাপক ভট্টাচার্য বহু পূর্বে থেকেই বাংলা বানানের অবসারণ নিয়ে ভাবিত। এ প্রসঙ্গে ভাষাচার্য মণীন্দ্রকুমার ঘোষের সব বইয়ের আলোচনা করেছেন। পরেচাশ্রয় মজুমদার ঘোষের বক্তব্য বর্তমান প্রবন্ধলেখকের যোগেযোগে কণা উল্লেখ করার প্রয়োজন ত্যাগ করতে পারছি না। সেটা ১৯৬১-৬২ সালের কথা। মণীন্দ্র কুমার তখন পশ্চিমবঙ্গ প্রধান শিক্ষক সমিতির মাসিক পত্রিকার সম্পাদক। আমি সমিতির নবীন সদস্য। সমিতির অফিসে যাতায়াত শুরু হতেই পরিচয় হল পরিকল্পনাপ্রসূত মণীন্দ্রকুমার ঘোষের সঙ্গে। তাঁর আচরণ এবং কথাবার্তা ছিল চুইকের মতো আকর্ষণ। সে সময় তিনি সমিতি প্রকাশিত সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির বাংলা পাঠ্যপুস্তক সম্পাদনা করছিলেন। তিনি আমাদেরও এই সম্পাদনার কাজ টেনে নিলেন। সে সময়ইই বাংলা বানান নিয়ে তাঁর মতামত জ্ঞেয়ছিল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পর্যালোচনা এবং সুমিত্রকুমারের সঙ্গে বাংলা বানান নিয়ে তাঁর দ্বন্দ্ব আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল। সমিতি পত্রিকার ১৯৬৫-৭ ডিসেম্বর সংখ্যায় 'নির্দেশক সংখ্যক' বাবে বাংলা বাক্যবিন্যাস নিয়ে একটি প্রবন্ধ লেখেন। ১৯৬৬ সালের মাঘ মাসের সমিতির পত্রিকায় মণীন্দ্রকুমারের প্রবন্ধের নাম 'বাংলা বাক্যবিন্যাস কর্মব্যাচ'। তারপরে কিছুদিন বিরতির পরে ১৯৭০ সালের জুলাই মাসের সমিতির পত্রিকায় তিনি লেখেন 'কবিরাজি' নামে একটি প্রবন্ধ। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসের সমিতির পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধ ছিল 'কর্ম কর্তব্য'। সুমিত্রকুমার চৌধুরীঘোষের ব্যাকরণ এবং 'ভাষা-প্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ' সম্পাদনা করেছিলেন মণীন্দ্রকুমার এবং তা সুমিত্রবাবুর একান্ত অনুরোধে। এই ব্যাকরণ পুস্তকটি সম্পাদনা করতে গিয়ে কুড়িটি নীতিগত আপত্তি তুলেছিলেন



মৌলভীকুমার এবং তাঁর আপত্তির বেশিরভাগই সূনীতিবাবুকে মেনে নিতে হয়েছিল। মৌলভীকুমার ব্যাকরণ বিষয়ে দিল্লী পুস্তক রচনা কমিটিতেই বোঝা যায় বাংলা বানানের গুণ্ডাকর্ত্তে তিনি কিছু গুরুত্ব দিতেন। সেই ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, “আজগলকার শিক্ত মূল ব্যাকরণ-চর্চা অনাবশ্যক মনে করেন। এ কথাও অস্বীকার করা যায় না যে, যে কথক উপন্যাসিক গল্পলেখক ব্যাকরণ-জ্ঞান ব্যতীতই সাহিত্যক্ষেত্রে সৃষ্টিভিত্তিক হয়েছিলেন। তৎসত্ত্বেও একথা বা বলিয়া পারি না স্বশিবিদ্যাগণের ব্যতনামা কোন কোন অধ্যাপক যখন বলেন, “উচিত, তত্ত্ব, স্যোপবিত, নভোচর, বহিঃসৃষ্টি” তখন অনেকে মনে অবস্থিত হইয়া যায়। সাহিত্যিকদের ব্যাকরণ-জ্ঞান না থাকিলেও চলে, কিন্তু শিক্ষক-অধ্যাপকদের ব্যাকরণ সহজে অস্বীকার খুব একটা গর্বের বিষয় নয়।” বাংলা ভাষার প্রতি এই দরদ যে তিনি তাঁর সন্তানদের মধ্যে সঞ্চারিত করিতে পেরেছিলেন তা বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের পক্ষে শুভ প্রতিপন্ন হয়েছে। মৌলভীকুমার যোনের যে অকৃপণ মেহ তখন পেরেছিলেন সেটা আমার পরম তৃপ্তির কারণ। ‘সাময়িকী’ পুস্তকটি প্রকাশিত হইবার পরই আমিহাতে একটি কপি উপহার পাঠিয়েছিলেন যা আমার কাছে সারা জীবনের একটি মূল্যবান সম্পদ। তিনি বুঝেই বহু করেছেন ভাবাবিদ্য অধ্যাপক সত্যজিট্রাচার্য্যের ‘অভ্যুত্থান’ নবীন্দ্র শিক্কার্য্য মৌলভীকুমারের ‘পুস্তকটি পাঠ করে তা জেনেছি। অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যের ‘বাংলা ভাষা চর্চা’ পুস্তকে আছে, ‘মৌলভীকুমার যোগ একসময় এই লেখককে লেখছিলেন যে, ফার্সি বানান করিতে বললে ফ-য-ফলা আকার না বলে ফ-য় আকার বলাই সঙ্গত। কথটি মুক্তিপূর্ণ।’

অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য তাঁর পুস্তকের ‘বাংলা বানান-সম্বন্ধে’র পৃষ্ঠা দশক ‘অধ্যায়ের শেষে তাঁর নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন, ‘বানান-সম্বন্ধিত কিছু নিয়ম গ্রহণ ও কিছু নিয়ম বর্জন করিতে হবে। অনেক ক্ষেত্রেই সমিতির বিকল্পের বিধান অঙ্গ করিতে হবে, কেন না তাঁরা প্রয়োজন এখন ফুরিয়েছে।... বাংলা শব্দভাণ্ডারের বিশিষ্ট চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বানান সম্বন্ধেও একটা মিশ্রনীতির অবলম্বন আজ অপরিহার্য্য ও অনিবার্য্য।’

বাংলা বানান নিয়ে ভাষাতাত্ত্বিক অবস্থান অনেক সহজ হইতে পারত যদি রামমোহন রায় রচিত বাংলা ব্যাকরণ, ১৮৩০ সালে

প্রকাশিত ‘গৌড়ীয় ব্যাকরণ’-এর ধারা অব্যাহত থাকত। কিন্তু তা থাকেনি। ভাষার বিবর্তন স্বতন্ত্র নয় প্রত্যয় না থাকায় শ্রীমান সেন রচিত ১৯০০ সালে প্রকাশিত ‘ভাষাতত্ত্ব—প্রথম খণ্ড’ এবং ১৯০৯ সালে প্রকাশিত ‘ভাষাতত্ত্ব-দ্বিতীয় খণ্ড’ বাংলাবানান নিয়ে কোনও চিন্তার সূত্রপাত করতে পারেনি। উত্তর কুমার দাসের ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত, ‘বাংলা ভাষাতত্ত্ব ও রবীন্দ্রনাথ’ পুস্তকের ভূমিকায় অধ্যাপক নির্মল দাস বলেছেন, ‘গত শতকের (উনিশ শতকের) প্রচুরতা ব্যাকরণে বাংলা ভাষার নিজস্ব রূপ পুরোপুরি ধরা না পড়লেও যাত্রা বিদেশীভাবের জন্য ইংরেজিতে বাংলা ব্যাকরণ লিখেছেন তাঁদের রচনায় (যেমন, শ্যামাচরণ সরকার) এবং সারদাচরণ মিত্র বা শ্যামাচরণ রচিত পুস্তকটি মতো কিছু ভিন্নমতের রচনায় বাংলা ভাষার লৌকিক রূপের শক্তি স্বীকৃতি লাভ করেছে।’ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ (১৯০১) প্রতিষ্ঠার পরে এ সম্বন্ধে ভাবনাচিন্তায় বান গেল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পরিষদের এ সভায় প্রচলিত ব্যাকরণচিন্তার বিপরীতে মত প্রকাশ করায় রক্ষণশীল পণ্ডিতসমূহের শরচ্ছত্র শাস্ত্রী এবং বীরেশ্বর পাণ্ডের রোষে পড়েন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ রক্ষণশীলদের ন্যায় করে ভাষাচর্চার এক নতুন দিশেস্তা সূচনা করেন। প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের ‘শব্দতত্ত্ব’ (১৯১৫)। পরে প্রকাশ করেন ‘বাংলা ভাষা পরিচয়’ (১৯৪০)। এভাবেই বাংলা বানান-চর্চায় এক নতুন যুগের উদয়ে হয়েছিল। উল্লেখ্য ১৮৮৬ সালে প্রকাশিত পদ্যসিদ্ধান্তের উদ্ভাটকের ‘ব্যাকরণ’ বাংলায় লেখা বাঙালির প্রথম ব্যাকরণ।

বহু ভাষাবিদ এই বানান-চর্চায় নিজস্বের অবদান রেখেছেন। অধ্যাপক বিদ্যাসিংহাচার্য্য প্রকাশ করেছিলেন তাঁর পুস্তক ‘বাগধ’। সুকুমার সেন লেখেন ‘ভাষার ইতিবৃত্ত’। অতীত মজুমদার লেখেন ‘ভাষাতত্ত্ব’। এই চর্চার বিভিন্ন সময়ে যোগ দিয়েছেন বিজয়চন্দ্র মজুমদার সুকুমার সেন, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, নতুলেশ্বর বিদ্যাবূষণ, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, স্বর্ষিমচন্দ্র, রামগতি ন্যায়দ্বার, রায়নারায়ণ বসু, ভগবতচন্দ্র বিশ্বাস, ব্রজকিশোর গুপ্ত, মোহনলাল ঠাকুরের মতো ব্যক্তি। ইহাশ্রী নভোজ এছাড়া বিদ্যাবূষণ চৌধুরীর প্রবন্ধ ‘বাংলা শব্দভাণ্ডার চারচিত্র’। ১৯১৯ সালে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সম্পাদনায় ‘আনন্দমোহন রায় প্রকাশিত গৌড়ীয় বানানবিধি স্বশিল্পিত পুস্তক, ‘বাংলা কী লিখেন কেন লিখবেন’ প্রকাশিত হয়েছে। কোনও পত্রিকার এ ধরনের প্রণীতি ভূমিকা অভিনন্দনযোগ্য। ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ অধিকারসিদ্ধি প্রকাশ করেছে ‘আকাশবাণী বাংলা অভিধান’। পুস্তকটির সম্পাদনায় অনেকের মধ্যে রয়েছেন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। অন্য দিকে আনন্দমোহন রায়ের ইতিহাসেও অলস করা

হয়নি। ফণীভূষণ আচার্য্যের বাংলা বানান নিয়ে রচিত পুস্তক ‘বাংলা বানান বিচিষ্টা’-১ম ও ২য় খণ্ড চালু রয়েছে।

দেশভাগ হওয়ার পরে ভাষা-নীতিও দু’ভাগ হয়ে গেছে। ভাষা এক কিন্তু তার সোভ্যধারা দু’ভাগ। পশ্চিমবঙ্গের আর পদ্ধতির পাড়াঘেঁষা বাংলাদেশের (পূর্বের পূর্ব পাকিস্তানের) অসাধারণ সূত্র থেকে মনে হতে পারে যে বাংলা বানান নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের, ভারতের বাঙালিরই চিন্তা করছেন, ভাবছেন, লিখছেন, বাস্তবচিত্রা করছেন। এমন মনে হওয়ার কারণ বাংলাদেশের ভাষাচর্চার সব সংবাদ পশ্চিমবঙ্গের এবং ভারতের বাঙালির মধ্যে প্রচারিত নয়। রাষ্ট্রীয় যেরাটোপ ভাষার সাবলীল হেলেনোলেনে একটা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন অবস্থা চলতে থাকবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে দু’টি সমান্তরাল ধারা সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নয়।

অনেকের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, বাংলা বানান নিয়ে বাংলাদেশে যে দীর্ঘ অর্থহীন কাজকর্ম ও চিন্তাভাবনা হয়েছে সে সম্বন্ধে তাঁরা অবহিত নয়। যারা কীটাত্তরের বেগু লিখে থাকেন আটকাতে চায়, বা আটকাবার ব্যবস্থা করে তারা যে বাংলা ভাষার সার্বভৌমত্বের ওপর আঘাত হানছে সে সম্বন্ধে কোনও সাধারণের অবগত নাই।

বাংলাদেশে বাংলা বানান ও হরফ নিয়ে ১৯৪৭ সালের পর থেকে নানা জ্ঞান দাখীলাবানি করেছে। তাঁদের মধ্যে অনগ্রগণ্য ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহের মতো ভাষা-পণ্ডিত যিনি পশ্চিমবঙ্গ থেকে উদ্ভূত হয়ে পূর্ব পাকিস্তানে (অধুনা বাংলাদেশ) চলে গিয়েছিলেন। স্বাক্ষর করা যেতে পারে যে পাকিস্তান সৃষ্টির সেই আদি লগ্নে বাংলা ভাষার ইসলামিকরণের একটা সংঘাত লগ্নে জোর হওয়া তুলেছিল। অর্থাৎ বাংলা হরফসমূহের পিকবর্তন করে আরবি-ফারসি-উর্দুর মতো করার একটা ধর্মগত রব তাকার আকাশ বাতাস তোলপাড় করছিল। সঙ্গে বাংলা ভাষার মধ্যে আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দকে ওভারডোজে প্রবেশ করিয়ে ফেলার পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার একটা ‘সবুজ-সাম-না’ গোছের মানসিকতা সৃষ্টি করা হয়েছিল। এটা ছিল স্বেচ্ছা-যেবা বাংলায় পালাটা হিসাবে আরবি-যেবা বাংলা তৈরির একটা পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী প্রচেষ্টা। এ সম্বন্ধে ড. আয়েম শরীফ তাঁর ‘ভাষা প্রসঙ্গে-বিতর্কিতের অন্তরালে’ প্রবন্ধে বলেছেন, ‘বাঙলা ভাষার হরফ ও বানান নিয়ে কোন সমস্যা ছিল না; তবু অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বাঙলা ভাষা সম্পর্কিত একটা কান্দনিক সমস্যার সমাধান সরকারি অফিসে (পাকিস্তানের) অত্যন্ত জঙ্করী হয়ে উঠেছিল। তাইর ফলে ভাষা সংস্কার কমিটিটি পদপদ গড়ে উঠেছে। সরকারী কমিটি, বাঙলা একাডেমী কমিটি, ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি ও ব্যক্তিগত প্রয়াস চারদিক মতিয়ে তোলে। এদিকে আরবি হরফে বাঙলা লেখনার অভিযানও সরকারী অর্থে চলতে থাকে।’

মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে মধ্যমণি করে ১৯৪৯ সালে পাকিস্তান সরকার গঠন করে ‘পূর্ববঙ্গ সরকারী ভাষা কমিটি’। এই কমিটি সুপারিশ করে ‘শহজ বাংলা’ রীতি। ‘শহজ বাংলা’ প্রস্তাবে সাড়টি স্বরবর্ণ এবং ৩১টি বাজ্ঞনবর্ণের স্বীকৃতি ছিল। বাদ দেওয়া হয়েছিল ৮, ৫, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, ১৪১, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ১৫০, ১৫১, ১৫২, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮, ১৫৯, ১৬০, ১৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৭০, ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৮, ১৭৯, ১৮০, ১৮১, ১৮২, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৭, ১৮৮, ১৮৯, ১৯০, ১৯১, ১৯২, ১৯৩, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৭, ১৯৮, ১৯৯, ২০০, ২০১, ২০২, ২০৩, ২০৪, ২০৫, ২০৬, ২০৭, ২০৮, ২০৯, ২১০, ২১১, ২১২, ২১৩, ২১৪, ২১৫, ২১৬, ২১৭, ২১৮, ২১৯, ২২০, ২২১, ২২২, ২২৩, ২২৪, ২২৫, ২২৬, ২২৭, ২২৮, ২২৯, ২৩০, ২৩১, ২৩২, ২৩৩, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৭, ২৩৮, ২৩৯, ২৪০, ২৪১, ২৪২, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৬, ২৪৭, ২৪৮, ২৪৯, ২৫০, ২৫১, ২৫২, ২৫৩, ২৫৪, ২৫৫, ২৫৬, ২৫৭, ২৫৮, ২৫৯, ২৬০, ২৬১, ২৬২, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৫, ২৬৬, ২৬৭, ২৬৮, ২৬৯, ২৭০, ২৭১, ২৭২, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৫, ২৭৬, ২৭৭, ২৭৮, ২৭৯, ২৮০, ২৮১, ২৮২, ২৮৩, ২৮৪, ২৮৫, ২৮৬, ২৮৭, ২৮৮, ২৮৯, ২৯০, ২৯১, ২৯২, ২৯৩, ২৯৪, ২৯৫, ২৯৬, ২৯৭, ২৯৮, ২৯৯, ৩০০, ৩০১, ৩০২, ৩০৩, ৩০৪, ৩০৫, ৩০৬, ৩০৭, ৩০৮, ৩০৯, ৩১০, ৩১১, ৩১২, ৩১৩, ৩১৪, ৩১৫, ৩১৬, ৩১৭, ৩১৮, ৩১৯, ৩২০, ৩২১, ৩২২, ৩২৩, ৩২৪, ৩২৫, ৩২৬, ৩২৭, ৩২৮, ৩২৯, ৩৩০, ৩৩১, ৩৩২, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৫, ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪০, ৩৪১, ৩৪২, ৩৪৩, ৩৪৪, ৩৪৫, ৩৪৬, ৩৪৭, ৩৪৮, ৩৪৯, ৩৫০, ৩৫১, ৩৫২, ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫৫, ৩৫৬, ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৫৯, ৩৬০, ৩৬১, ৩৬২, ৩৬৩, ৩৬৪, ৩৬৫, ৩৬৬, ৩৬৭, ৩৬৮, ৩৬৯, ৩৭০, ৩৭১, ৩৭২, ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৭৫, ৩৭৬, ৩৭৭, ৩৭৮, ৩৭৯, ৩৮০, ৩৮১, ৩৮২, ৩৮৩, ৩৮৪, ৩৮৫, ৩৮৬, ৩৮৭, ৩৮৮, ৩৮৯, ৩৯০, ৩৯১, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০০, ৪০১, ৪০২, ৪০৩, ৪০৪, ৪০৫, ৪০৬, ৪০৭, ৪০৮, ৪০৯, ৪১০, ৪১১, ৪১২, ৪১৩, ৪১৪, ৪১৫, ৪১৬, ৪১৭, ৪১৮, ৪১৯, ৪২০, ৪২১, ৪২২, ৪২৩, ৪২৪, ৪২৫, ৪২৬, ৪২৭, ৪২৮, ৪২৯, ৪৩০, ৪৩১, ৪৩২, ৪৩৩, ৪৩৪, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৩৭, ৪৩৮, ৪৩৯, ৪৪০, ৪৪১, ৪৪২, ৪৪৩, ৪৪৪, ৪৪৫, ৪৪৬, ৪৪৭, ৪৪৮, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫১, ৪৫২, ৪৫৩, ৪৫৪, ৪৫৫, ৪৫৬, ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৫৯, ৪৬০, ৪৬১, ৪৬২, ৪৬৩, ৪৬৪, ৪৬৫, ৪৬৬, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৬৯, ৪৭০, ৪৭১, ৪৭২, ৪৭৩, ৪৭৪, ৪৭৫, ৪৭৬, ৪৭৭, ৪৭৮, ৪৭৯, ৪৮০, ৪৮১, ৪৮২, ৪৮৩, ৪৮৪, ৪৮৫, ৪৮৬, ৪৮৭, ৪৮৮, ৪৮৯, ৪৯০, ৪৯১, ৪৯২, ৪৯৩, ৪৯৪, ৪৯৫, ৪৯৬, ৪৯৭, ৪৯৮, ৪৯৯, ৫০০, ৫০১, ৫০২, ৫০৩, ৫০৪, ৫০৫, ৫০৬, ৫০৭, ৫০৮, ৫০৯, ৫১০, ৫১১, ৫১২, ৫১৩, ৫১৪, ৫১৫, ৫১৬, ৫১৭, ৫১৮, ৫১৯, ৫২০, ৫২১, ৫২২, ৫২৩, ৫২৪, ৫২৫, ৫২৬, ৫২৭, ৫২৮, ৫২৯, ৫৩০, ৫৩১, ৫৩২, ৫৩৩, ৫৩৪, ৫৩৫, ৫৩৬, ৫৩৭, ৫৩৮, ৫৩৯, ৫৪০, ৫৪১, ৫৪২, ৫৪৩, ৫৪৪, ৫৪৫, ৫৪৬, ৫৪৭, ৫৪৮, ৫৪৯, ৫৫০, ৫৫১, ৫৫২, ৫৫৩, ৫৫৪, ৫৫৫, ৫৫৬, ৫৫৭, ৫৫৮, ৫৫৯, ৫৬০, ৫৬১, ৫৬২, ৫৬৩, ৫৬৪, ৫৬৫, ৫৬৬, ৫৬৭, ৫৬৮, ৫৬৯, ৫৭০, ৫৭১, ৫৭২, ৫৭৩, ৫৭৪, ৫৭৫, ৫৭৬, ৫৭৭, ৫৭৮, ৫৭৯, ৫৮০, ৫৮১, ৫৮২, ৫৮৩, ৫৮৪, ৫৮৫, ৫৮৬, ৫৮৭, ৫৮৮, ৫৮৯, ৫৯০, ৫৯১, ৫৯২, ৫৯৩, ৫৯৪, ৫৯৫, ৫৯৬, ৫৯৭, ৫৯৮, ৫৯৯, ৬০০, ৬০১, ৬০২, ৬০৩, ৬০৪, ৬০৫, ৬০৬, ৬০৭, ৬০৮, ৬০৯, ৬১০, ৬১১, ৬১২, ৬১৩, ৬১৪, ৬১৫, ৬১৬, ৬১৭, ৬১৮, ৬১৯, ৬২০, ৬২১, ৬২২, ৬২৩, ৬২৪, ৬২৫, ৬২৬, ৬২৭, ৬২৮, ৬২৯, ৬৩০, ৬৩১, ৬৩২, ৬৩৩, ৬৩৪, ৬৩৫, ৬৩৬, ৬৩৭, ৬৩৮, ৬৩৯, ৬৪০, ৬৪১, ৬৪২, ৬৪৩, ৬৪৪, ৬৪৫, ৬৪৬, ৬৪৭, ৬৪৮, ৬৪৯, ৬৫০, ৬৫১, ৬৫২, ৬৫৩, ৬৫৪, ৬৫৫, ৬৫৬, ৬৫৭, ৬৫৮, ৬৫৯, ৬৬০, ৬৬১, ৬৬২, ৬৬৩, ৬৬৪, ৬৬৫, ৬৬৬, ৬৬৭, ৬৬৮, ৬৬৯, ৬৭০, ৬৭১, ৬৭২, ৬৭৩, ৬৭৪, ৬৭৫, ৬৭৬, ৬৭৭, ৬৭৮, ৬৭৯, ৬৮০, ৬৮১, ৬৮২, ৬৮৩, ৬৮৪, ৬৮৫, ৬৮৬, ৬৮৭, ৬৮৮, ৬৮৯, ৬৯০, ৬৯১, ৬৯২, ৬৯৩, ৬৯৪, ৬৯৫, ৬৯৬, ৬৯৭, ৬৯৮, ৬৯৯, ৭০০, ৭০১, ৭০২, ৭০৩, ৭০৪, ৭০৫, ৭০৬, ৭০৭, ৭০৮, ৭০৯, ৭১০, ৭১১, ৭১২, ৭১৩, ৭১৪, ৭১৫, ৭১৬, ৭১৭, ৭১৮, ৭১৯, ৭২০, ৭২১, ৭২২, ৭২৩, ৭২৪, ৭২৫, ৭২৬, ৭২৭, ৭২৮, ৭২৯, ৭৩০, ৭৩১, ৭৩২, ৭৩৩, ৭৩৪, ৭৩৫, ৭৩৬, ৭৩৭, ৭৩৮, ৭৩৯, ৭৪০, ৭৪১, ৭৪২, ৭৪৩, ৭৪৪, ৭৪৫, ৭৪৬, ৭৪৭, ৭৪৮, ৭৪৯, ৭৫০, ৭৫১, ৭৫২, ৭৫৩, ৭৫৪, ৭৫৫, ৭৫৬, ৭৫৭, ৭৫৮, ৭৫৯, ৭৬০, ৭৬১, ৭৬২, ৭৬৩, ৭৬৪, ৭৬৫, ৭৬৬, ৭৬৭, ৭৬৮, ৭৬৯, ৭৭০, ৭৭১, ৭৭২, ৭৭৩, ৭৭৪, ৭৭৫, ৭৭৬, ৭৭৭, ৭৭৮, ৭৭৯, ৭৮০, ৭৮১, ৭৮২, ৭৮৩, ৭৮৪, ৭৮৫, ৭৮৬, ৭৮৭, ৭৮৮, ৭৮৯, ৭৯০, ৭৯১, ৭৯২, ৭৯৩, ৭৯৪, ৭৯৫, ৭৯৬, ৭৯৭, ৭৯৮, ৭৯৯, ৮০০, ৮০১, ৮০২, ৮০৩, ৮০৪, ৮০৫, ৮০৬, ৮০৭, ৮০৮, ৮০৯, ৮১০, ৮১১, ৮১২, ৮১৩, ৮১৪, ৮১৫, ৮১৬, ৮১৭, ৮১৮, ৮১৯, ৮২০, ৮২১, ৮২২, ৮২৩, ৮২৪, ৮২৫, ৮২৬, ৮২৭, ৮২৮, ৮২৯, ৮৩০, ৮৩১, ৮৩২, ৮৩৩, ৮৩৪, ৮৩৫, ৮৩৬, ৮৩৭, ৮৩৮, ৮৩৯, ৮৪০, ৮৪১, ৮৪২, ৮৪৩, ৮৪৪, ৮৪৫, ৮৪৬, ৮৪৭, ৮৪৮, ৮৪৯, ৮৫০, ৮৫১, ৮৫২, ৮৫৩, ৮৫৪, ৮৫৫, ৮৫৬, ৮৫৭, ৮৫৮, ৮৫৯, ৮৬০, ৮৬১, ৮৬২, ৮৬৩, ৮৬৪, ৮৬৫, ৮৬৬, ৮৬৭, ৮৬৮, ৮৬৯, ৮৭০, ৮৭১, ৮৭২, ৮৭৩, ৮৭৪, ৮৭৫, ৮৭৬, ৮৭৭, ৮৭৮, ৮৭৯, ৮৮০, ৮৮১, ৮৮২, ৮৮৩, ৮৮৪, ৮৮৫, ৮৮৬, ৮৮৭, ৮৮৮, ৮৮৯, ৮৯০, ৮৯১, ৮৯২, ৮৯৩, ৮৯৪, ৮৯৫, ৮৯৬, ৮৯৭, ৮৯৮, ৮৯৯, ৯০০, ৯০১, ৯০২, ৯০৩, ৯০৪, ৯০৫, ৯০৬, ৯০৭, ৯০৮, ৯০৯, ৯১০, ৯১১, ৯১২, ৯১৩, ৯১৪, ৯১৫, ৯১৬, ৯১৭, ৯১৮, ৯১৯, ৯২০, ৯২১, ৯২২, ৯২৩, ৯২৪, ৯২৫, ৯২৬, ৯২৭, ৯২৮, ৯২৯, ৯৩০, ৯৩১, ৯৩২, ৯৩৩, ৯৩৪, ৯৩৫, ৯৩৬, ৯৩৭, ৯৩৮, ৯৩৯, ৯৪০, ৯৪১, ৯৪২, ৯৪৩, ৯৪৪, ৯৪৫, ৯৪৬, ৯৪৭, ৯৪৮, ৯৪৯, ৯৫০, ৯৫১, ৯৫২, ৯৫৩, ৯৫৪, ৯৫৫, ৯৫৬, ৯৫৭, ৯৫৮, ৯৫৯, ৯৬০, ৯৬১, ৯৬২, ৯৬৩, ৯৬৪, ৯৬৫, ৯৬৬, ৯৬৭, ৯৬৮, ৯৬৯, ৯৭০, ৯৭১, ৯৭২, ৯৭৩, ৯৭৪, ৯৭৫, ৯৭৬, ৯৭৭, ৯৭৮, ৯৭৯, ৯৮০, ৯৮১, ৯৮২, ৯৮৩, ৯৮৪, ৯৮৫, ৯৮৬, ৯৮৭, ৯৮৮, ৯৮৯, ৯৯০, ৯৯১, ৯৯২, ৯৯৩, ৯৯৪, ৯৯৫, ৯৯৬, ৯৯৭, ৯৯৮, ৯৯৯, ১০০০, ১০০১, ১০০২, ১০০৩, ১০০৪, ১০০৫, ১০০৬, ১০০৭, ১০০৮, ১০০৯, ১০১০, ১০১১, ১০১২, ১০১৩, ১০১৪, ১০১৫, ১০১৬, ১০১৭, ১০১৮, ১০১৯, ১০২০, ১০২১, ১০২২, ১০২৩, ১০২৪, ১০২৫, ১০২৬, ১০২৭, ১০২৮, ১০২৯, ১০৩০, ১০৩১, ১০৩২, ১০৩৩, ১০৩৪, ১০৩৫, ১০৩৬, ১০৩৭, ১০৩৮, ১০৩৯, ১০৪০, ১০৪১, ১০৪২, ১০৪৩, ১০৪৪, ১০৪৫, ১০৪৬, ১০৪৭, ১০৪৮, ১০৪৯, ১০৫০, ১০৫১, ১০৫২, ১০৫৩, ১০৫৪, ১০৫৫, ১০৫৬, ১০৫৭, ১০৫৮, ১০৫৯, ১০৬০, ১০৬১, ১০৬২, ১০৬৩, ১০৬৪, ১০৬৫, ১০৬৬, ১০৬৭, ১০৬৮, ১০৬৯, ১০৭০, ১০৭১, ১০৭২, ১০৭৩, ১০৭৪, ১০৭৫, ১০৭৬, ১০৭৭, ১০৭৮, ১০৭৯, ১০৮০, ১০৮১, ১০৮২, ১০৮৩, ১০৮৪, ১০৮৫, ১০৮৬, ১০৮৭, ১০৮৮, ১০৮৯, ১০৯০, ১০







উৎপন্ন হয়ে সহজাতিক বৎসরে সময়ের হাত ধরে এগিয়ে চলেছে এই বাংলা ভাষা। এই ভাষাকে পৃথক স্রোতে প্রবাহিত করার চেষ্টা অব্যাহত। সাময়িকভাবে ভারতের বাঙালি এবং বাংলাদেশের বাঙালি এই কৃত্রিম বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টাকে সয়ে গেলেও, যথাসময়ে এই কৃত্রিম বিভেদকে ভারতের বাঙালি এবং বাংলাদেশের বাঙালিরা দু'ভারত সঙ্গ মুখে ফেলতে তৎপর হবে এবং সাক্ষাৎলাভ করবে।

বাংলা বানান, বাংলা লিপি এবং বাংলা বর্ণমালা নিয়ে সংস্কারের চেষ্টা এককভাবে যদি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা অথবা বাংলাদেশের বাঙালিরা করে তবে তা হবে বাংলা ভাষার পক্ষে ক্ষতিকর। সংস্কারের সব চেষ্টা এবং সব সিদ্ধান্ত নিতে হবে যৌথভাবে। বাংলা ভাষার এই যৌথ দায়িত্বের কথা আমরা যত বেশি করে স্বরূপে রাখব, ততই বাংলা ভাষার স্বাস্থ্য এবং সন্মুখি করায়ত হবে। বাংলা ভাষা নিয়ে যৌথ দায়িত্ব

বহন সহজতর হবে যখন আমরা সকলেই বাংলা ভাষার সার্বভৌম অধিকারকে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের উপরে স্থান দেব। আমরা সেই সুদিনের অপেক্ষায় আছি। বাংলা লানান, বাংলা লিপি এবং বাংলা বর্ণমালা সংস্কারের একটি সম্মিলিত প্রয়াস প্রয়োজন। সম্মিলিত প্রয়াসের ফলে যে সিদ্ধান্ত হবে, সে সিদ্ধান্ত শীঘ্রই থেকে ডায়ালগহারবার পর্যন্ত সর্বত্র সমন্বয়ে গৃহীত হবে। নইলে এখনকার অবস্থায় সর্বজনীন বলে কোনও সিদ্ধান্ত কার্যকরী হতে পারবে না। এখনকার অবস্থা কী? এখনকার অবস্থা হচ্ছে 'অনিত বাঙালি বানান'ের নিয়ম' সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা অবহিত যেমন নয়, তেমনই বাংলাদেশের বাঙালিদের কাছে কার্যকরী নয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধি। এই টনাপোড়নের মধ্যে মার খাচ্ছে বাংলা ভাষা। এ অবস্থা চলতে থাকলে একসময় বাংলা ভাষা তো বরফদী হয়ে ছড়ত্ব হয়ে যাবে।

চতুর্থ-এর পরবর্তী বর্ষ ৬৫ সংখ্যা ১

প্রকাশিত হবে আগামী জানুয়ারি ২০০৬-এর প্রথমার্ধে

চতুর্থ-এর দপ্তর খোলা থাকে

প্রত্যেক মঙ্গল আর শুক্রবার বিকাল পাঁচটা থেকে রাত নটা পর্যন্ত

গ্রন্থসমালোচনা

## বাংলায় অর্থনীতির স্ট্যান্ডার্ড অভিধান হয়ে উঠুক

সৌরীন ভট্টাচার্য

গোড়াতেই একটা কথা পরিষ্কার বলে নেওয়া ভাল। বর্তমানের আলোচ্য বইটি নানা কারণে খুবই উল্লেখযোগ্য। বিষয়-অভিধান হিসাবে অর্থনীতির অভিধান যে এই একেবারে বাংলায় প্রথম তা নয়। এর আগেও অন্য অভিধান বেরিয়েছে। কিন্তু ১৬ + ৮৫২ পৃষ্ঠার বর্তমান বইয়ের তুলনায় সে সব বই অবশ্যই ছোট মাপের। যদিও বইয়ের আয়তন দিয়ে ওণাওণের তিয়ার হয় না। তবুও বাঙালিপাঠককে এত বড় একটা অর্থবিদ্যার অভিধান উপহার দেবার জন্য প্রকাশক নিঃসন্দেহে আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করায়। ভাষাঅভিধান ছাড়াও অন্য নানা বিদ্যার অভিধান প্রকাশ করায় এই প্রকাশনা সংস্থার ব্যাতি সুবিধিত। আর এই অভিধানের প্রণেতা আমাদের দু'জন অত্যন্ত ব্যতিক্রম শ্রীশ্রী অর্থনীতির অধ্যাপক। শ্রদ্ধেয় যীশেনচন্দ্র ভট্টাচার্য এই ব্যাসেও যে এরকম কাজের সঙ্গে নিজেই জড়িয়ে পেরেছেন সে কথা বেশ সোয়াল করে লুক করার মতো। আর যীশেনচন্দ্র রায়ের মতো দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন শিক্ষক যে এই কাজের দায়ভার এতটা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন তাও আমরা স্বতজ্ঞচিত্তে স্বকর্য কবন। সেই কারণে স্বাভাবিক যে এই বইয়ের বিষয়ে আমাদের প্রত্যাশা খুব উঁচু তারে ঝাঝ থাকবে। প্রকাশকের দ্বার্বর্বে আমাদের সেইভাবে ভাববার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। 'সামগ্রিকতার বিচারে বইটি অর্থবিদ্যা বিষয়ে একটি প্রামাণ্য এনসাইক্লোপিডিয়ার মানদণ্ডে বিচার্য' আমরাও তাই মনে করি। যদিও 'প্রামাণ্য' কথাটির প্রয়োগ প্রসঙ্গে সোয়াল করা ভাল যে নেহাতই আকীর্জা তথ্যের ভুলভ্রান্তির কথা ছেড়ে বিনেও এ কথাটির আর খুব বেশি মানে থাকে না। সম্ভবত যে কোনও বিদ্যায়, অর্থনীতির মতো সমাজমানবিকী বিদ্যায় তো টেটেই-মতান্তর মূলত দেখা যায় দৃষ্টিকোণ কিংবা তাত্ত্বিক অবস্থান নিয়ে। তাহা ভুল যাকে বলে সে তো পারম্পরিক সহযোগিতায় শুধরে নিলেই চলে। দৃষ্টিকোণ এবং তত্ত্ব-অবস্থানের কথাটিই আসল। এখানেও তা নিয়ে কথা বলার অবকাশ আছে। সে কথায় পরে আসছি।

প্রকাশকের কথা মেনে নিয়ে দেখা যাক বইয়ে কী কী জিনিস আছে। বইয়ের প্রথম ভাগে আছে বর্ণনামূলক বিন্যস্ত বিভিন্ন

মুখশব্দের ব্যাখ্যা ও বিবরণ। দ্বিতীয় ভাগে অর্থনীতিবিদদের জীবনী। এই পর্যায়ের আবার দুটি অংশ—ভারতীয় ও আন্তর্জাতীয় অর্থনীতিবিদ। আর তৃতীয় ভাগে আছে পরিভাষিক শব্দাবলি। স্বাভাবিক যে প্রথম ভাগটিই বইয়ের প্রধান অংশ ভুজ্জ থাকবে। তাই আছে। ৬৫২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত রয়েছে মুখশব্দের বিবরণ। বাকি প্রায় দুশো পৃষ্ঠার মধ্যে রয়েছে জীবনী অংশ আর পরিভাষিক শব্দাবলি। তার মধ্যে জীবনী ৬৫৫ থেকে ৮১৮, অর্থাৎ মোট ১৬৩ পৃষ্ঠা। তার মধ্যে ভারতীয় অংশ ২৪ পৃষ্ঠা এবং আন্তর্জাতীয় অংশের জীবনী ১৩৫ পৃষ্ঠা। পরিভাষিক শব্দাবলির পরিসর ৩১ পৃষ্ঠা। পরিভাষিক শব্দের বা শব্দগুচ্ছের বিন্যাসে বর্ণনাক্রমে ইংরাজি পরিভাষা অনুসারে সমাজভানো হয়েছে। বইয়ের বিন্যাস বাংলা মুখশব্দ অনুসারে। ব্র্যাকেটে ইংরাজি পরিভাষা দেওয়া আছে সেখানে। এ রকম বিন্যাসের একটা যুক্তি নিশ্চয় এই যে, এখনও পর্যন্ত আমাদের পাঠকদের একটা বড় অংশ অর্থনীতির মতো বিদ্যা আয়ত্ত করার জন্য মূলত ইংরাজি ভাষার ওপরে নির্ভরশীল। কাছেই ইংরাজি পরিভাষিকগুলিই তার কাছে বেশি পরিচিত। সেই পরিচিতিকে স্বীকৃতি দিয়েই বর্তমান বিন্যাস। এ পর্যন্ত যুক্তি গ্রহণযোগ্য। তবে এ কথাটিও এই প্রসঙ্গে মনে রাখা ভাল যে আমাদের মাতৃকল্পের ছাত্রছাত্রীদের একটা বেশ বড় অংশ ইতিমধ্যে এইসব বিদ্যা বাংলাভাষাতে চর্চা করায় মোটামুটি অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। হয়ত সে অভ্যাসের পেছনে তাদের অনেকের ক্ষেত্রে ইংরাজি ভাষায় যথোপযুক্ত দক্ষতার অভাব একটা বড় কারণ। তা হোক। বাংলা ভাষা যে ব্যবহৃত হচ্ছে এই অবকাশ কাজে লাগানো চলে। সেখানে এনসাইক্লোপিডিয়া-জাতীয় গ্রন্থের বড় ভূমিকা থাকে। প্রকাশকের প্রশ্রায়ে এবং বর্তমান অভিধানপ্রণয়নের মাধ্যমে কথা মাথায় রেখে আমরা 'পার্শ্বিত ভাবনাই ভাবতে চাই। অর্থনীতির চর্চা যিনি মূলত বাংলা ভাষাতেই করতে চাইছেন তিনিও এ বই থেকে বল পেতে চাইতে পারেন। সেখানে স্বাধীনভাবে বাংলা পরিভাষিকের ব্যবহারসম্ভাবনা তাঁর কাছে বড় সম্ভল। তাই মোটেও ৩১ পৃষ্ঠার ব্যাপার। এত বড় বইয়ে আর না-হয় দু'খরমা মতো। কলেবর বৃদ্ধি হত। যদি



পারিভাসিকের তালিকাটি একবার বাংলায় গোড়াতে দিয়েও দেওয়া যাক।

এবার জীবনী অংশ সম্বন্ধে একটা কথা বলে নিই। ভারতীয়-অভারতীয় এই বিভাজন নিয়ে একটা প্রশ্ন তুলব, কিন্তু সেটা একই পরে। তার আগে বোঝা করা যাক যে সকলেন-নীতি হিসাবেই একমাত্র অমর্ত্যকুমার সেন ছাড়া ভারতীয় অংশে আর কোনও জীবিত অর্থনীতিবিদের স্থান হয়নি। অমর্ত্যকুমারের বিজ্ঞান নোবেল পুষ্টি পুরস্কারের সুবাদে। এই নীতি মেনে নিচেন ভারতীয় অংশে দু'একজন উল্লেখযোগ্য অর্থনীতিবিদ বাস গেছেন। কৃষ্ণা ভরদ্বাজ ও অশোক রুদ্রের নাম তো মনে পড়বেই। রামাক্ষর মুখোপাধ্যায় আছেন। অন্য দুই মুখোপাধ্যায়, রামাক্ষর ও ধৃষ্টিপ্রসাদও কি থাকতে পারতেন না? আর ভি. এম. ডাডেকর? আরও অনেক নাম তো ভাবা যেতেই পারে। এর মধ্যে কেউ কেউ নিশ্চয় পরবর্তী সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন। কিন্তু এ ছাড়াও তারের আরও কিছু নাম আমাদের মাথায় আসে যাঁদের কোনো একটা প্রশ্ন উঠতে পারে যে তাঁরা তাঁদের জীবৎকালে শিক্ষক বা অনুরূপ কোনও পরিচয়ে যতটা পরিচিত ছিলেন, গবেষণাকর্ম তাঁদের তত বড় পরিচয় না থাকায় উত্তরদেশে তুলনায় সংক্ষেপে বিবৃত। আর গবেষণাকর্মের অভাবে তাঁদের অর্থনীতিবিদ স্বীকৃতিও অনেকটা সংশয়াপন্ন। সি. নন্দিন্দ্র পাল নামা বনাম গোপাল সেন কিংবা রানাদে, এর পিছনে কি আধুনিক কালে আমাদের সুবৃহৎ মুশকিলে ফেলে? এই থেকে এই জীবনী অংশে ইতিমধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছেন এমন দু'একজন যারা শিক্ষক পরিচয়ে এবং তাঁদের পাকিস্তান পরিচয়েই পরিচিত। এই অন্তর্ভুক্তি নিয়ে অভিযোগ তুলছি না তো বটেই, বরঞ্চ সেই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে ওই তালিকা আরও বিস্তারিত করার আশা করি। কামিশিত গ্রন্থের বা রচনার হিসাববিন্যাস করে শুধু গবেষণাভিত্তিক পরিচয়ে বিকল্পভাবে শাস্ত্রমন্ত্রে মনে করার পরিবর্তে ওয়াজ প্রকৃষ্ট বৃহৎ বেশি পরিচয় নয়। বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক গবেষণাপত্রের ওপরে জোর দেবার যে মানসিকতা তার থেকে অনেকাংশে গড়ে উঠেছেই বটে। অথচ আমাদের জ্ঞানবিদ্যার চর্চায় এমন অনেক শ্রদ্ধায় নাম আমরা স্মরণ করতে পারি যাঁদের বিদ্যা প্রকাশের প্রদান ক্ষেত্র প্রকৃষ্টতায় গবেষণাপত্র বা গ্রন্থ নয়। ছাত্র ও সেক্ষেত্রীদের সঙ্গে সুস্থ বিদ্যা-বিনিময় যে চর্চার একটা প্রশস্ত শুদ্ধ হওয়া সম্ভব, এই স্বীকৃতি বর্তমান অভিজ্ঞানগ্রন্থের কাছে প্রত্যাপ্য করতে আমাদের বুঝে আছে। সেই জন্যই যেমন পঞ্চদশ চক্রবর্তী নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তেমনই আরও কোনও কোনও নামও নিশ্চয় অন্তর্ভুক্ত হতে পারত। কোনও বিশেষ নাম আছে বা নেই তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছি না। আমি প্রস্তাব পেশ করছি

সাধারণভাবে, অভিজ্ঞান সকলনের নীতি হিসাবে। বস্তুত যথেষ্ট সাংগঠনিক সমার্থক থাকলে এই ধরনের অভিজ্ঞানের পক্ষে নিজস্ব গবেষণার ভিত্তিতে এমন অনেক নাম তুলে আনা সম্ভব বা সাধারণত অপরিচিত থেকে যায়। প্রশংসা ভিত্তিক পরিচয় যাঁদের খুব ব্যাপক নয়, যাঁদের পরিচয় অনেকাংশে লোকপ্রসিদ্ধিতে সীমাবদ্ধ তাঁদের জন্য এরকম গবেষণার বিশেষ প্রয়োজন। জানবিনা চর্চার লব্ধি ধারার সন্ধান এই ধরনের বড় মাপের অভিজ্ঞানের কাছে আমরা আশা করাই পারি।

জীবনী অংশের ভারতীয়-অভারতীয় বিভাজন কতটা জরুরি? বিশেষত, ভারতীয় অংশে একটি ব্যক্তিকর্ম বাসে শুধুমাত্র প্রয়াতদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার যুক্তিই বা কতটা গ্রহণযোগ্য? এইসব প্রশ্ন উঠতে পারে নানা কারণে। একটা প্রকারে ভারতীয়-অভারতীয় বিভাজন নিতান্ত ভৌগোলিক বা নাগরিকত্বের বিভাজন। এ বিভাজন করা বা না করার খুব কিছু এসে যায় না। আর এক প্রকারে বিভাজনের ভিত্তি হবে পক্ষে শৈলীর বিচার। অর্থাৎ গবেষণা প্রসঙ্গের বিচার, দৃষ্টিভঙ্গির বিচার, সিদ্ধান্তের রাস্তাকৌতবিক বা জাতীয় অভিমুখের বিচার ইত্যাদি। সব বিচার প্রাসঙ্গিক। এ রকম ভাবে বিচার করলে ভারতীয় অর্থনীতিবিদ বলে যদি কোনও বর্ণ কল্পনা করা হয়, তাহলে তখন তার একটা দৃষ্টিভঙ্গিও মাত্রাও থাকতে পারে। দৃষ্টিভঙ্গির সমতার কথা নয়, কিন্তু রাস্তাকৌতবিক-সামাজিক অবস্থানের কারণে ভারতীয়দের একটা ন্যায্য মানে তখন হারত ভাবে নেওয়া সম্ভব হতে পারে। এরকম অবস্থায় জাতীয়তার বিচারে ভারতীয় এই পবিত্রভাজন তবু বানানো অসম্ভব হয়ে ওঠে। কিন্তু সেই পদ্ধতিতে দিক থেকে শৈলীর বিচার করতে গেলে আমাদের সমসাময়িক কালের অর্থনীতির চর্চায় ভারতীয়দের মানে আরও অস্পষ্ট হয়ে যায়। জাতি বা নাগরিকত্বের পরিচয়ে যিনি ভারতীয় তাঁর অর্থনীতিচর্চার পদ্ধতি প্রকরণগত অবস্থানে উল্লেখ আছে আর ভারতীয় বলে শনাক্ত করা অনেকসময় অর্থনীতি হয়ে পড়ে। আজকের ভারতীয় অর্থনীতিবিদের চর্চা অনেকাংশে উই হার্বিকোয়াল্ট, সেই অর্থে হয়ে থাকেনাশে। হার্বিকোয়াল্টের ভাষ্যমত বিচারের কথা এখন তুলছি না। বিশ্বতোষাণী বলে তা যে সর্বস্বই বিশ্বজনীন তাও হয়তো নয়। সে কথাও এখন থাকা। আমি লক্ষ করতে চাই শুধু এটুকু যে কমকর্মান্বিত 'ভারতীয়ত্ব' এর আবহে জীবিত - প্রয়াত ভেদনীরতি ব্যবহার করলে গোড়া থেকেই 'ভারতীয়' অর্থনীতিবিদদের কিন্তু বানানটা ছিটানো বিচারে অসম্ভব পরিণত করা হচ্ছে। অথচ শুধুমাত্র বিচারের তা হারত সব সময়ে সম্মীচন হবে না। সহজ প্রসারে যিহ আমরা সমকালীন প্রকৃত গ্রন্থ করতে পারতাম, তাহলে ভারতীয় অংশে এমন অনেক অর্থনীতিবিদের পরিচয় পাওয়া যেত, যাঁদের কাজের গুরুত্ব

অভারতীয় অংশে অন্তর্ভুক্ত অনেকেই তুলনায় কিছুমাত্র কম নয়।

এবার মুখপত্রের অংশে আসি। এটি তো একটি বড় মাপের বিষয় অভিজ্ঞান। এখানে ছোটোটা ক্রটিবিচারের চেয়ে আমরা মনে হয় দৃষ্টিভঙ্গিগত বা নীতিগত আলোচনা অনেক বেশি জরুরি। ছোটোখাটো তুলনাক, অন্তত আমার চোখে যা দু'একটা প্রশ্ন উঠেছে, সে কথা পরে বলা যাবে। প্রয়োজনে গবেষণা নেওয়া যাবে। কিন্তু নীতিগত বা অবস্থানগত প্রশ্ন আমার মনে হয় অনেক বেশি দরকার। কাজটা যে বড় মাপের সে কথা আগেই বলেছি। প্রায় ১৬০০ মুখপত্রের এই অভিজ্ঞানে অর্থনীতির আধুনিক ছাত্র-গবেষণার প্রয়োজনে লাগে এমন বহু প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। কোনও কোনও প্রসঙ্গ বেশ বিস্তারিতভাবে আলোচিত। এমনকি অনেক জায়গায় রেখাচিত্র বা সমীকরণ ব্যবহার করে ধারণাগুলোকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয়েছে। প্রকৃত বস্তুনিষ্ঠতাপ্রিয় ছাত্রদের অভিজ্ঞানে তাইতো হবার কথা। অর্থবিশার বিভিন্ন শাখা থেকে মুখপত্র নির্বাচন করা হয়েছে। ধ্রুপদী অর্থনীতি, ন্যায্য ধ্রুপদী অর্থনীতি, প্রান্তিকতাবাদী অর্থনীতি, গাণিতিক অর্থনীতি, পরিসংখ্যান তত্ত্ব, অর্থনীতি, জন অর্থনীতি, কল্যাণমূলক অর্থনীতি, উন্নয়নের অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, শোয়ার বাজার, ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা, মুদ্রানীতি ইত্যাদি বহু ক্ষেত্রের বহু প্রশংসই পাওয়া যায় এসে। তা সত্ত্বেও নিশ্চয়ই সংস্করণের প্রয়োজন যেটাবার মতো সব শব্দ এই অভিজ্ঞানে এখনই মিলবে না। একই বলাছি, কেননা আশা করা যায় যে এই বইয়ের চতুর্থ ভাগ হবে। এবং রুদ্র নতুন সংস্করণের প্রয়োজন দেখা দেবে। তখন আরও প্রসঙ্গ যোগ হতে পারবে। এরকম পরিমার্জন ও পরিবর্তনের আশা থেকে আমি দু'একটা নীতিগত প্রশ্ন তুলছি।

অর্থনীতির 'বিভাজন' চরিত্র নিয়ে একটা প্রশ্ন আছে। তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে অর্থনীতির বিশ্বজনীনতার প্রশ্ন। অর্থনীতির তত্ত্ব বা সুত্রাবলি কি দেশশেষের অভিজ্ঞানসাপেক্ষ? না কি দেশেকাতারেকী বিশ্বজনীন প্রয়োজনসত্ত্বানামক অমোঘ সত্ত্ব? এতটা বিশ্বজনীনতার দাবি অনেকেরই মনে নে। অর্থনীতির দেশেকাতারেকীসত্ত্বকে অস্বত্ব কিছু পরিমাণে মানতে গেলেও আমাদের নিজস্ব অভিজ্ঞানপ্রস্তুত দৃষ্টিভঙ্গির কথা উঠবে। এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্নের তাৎপর্য এতই সুসূরপ্রসারী যে তার বিস্তৃত আলোচনায় এখানে এখানে উঠে রিভিউ নিবন্ধে সম্ভব নয়, উচিত নয়। আমি তাই বর্তমান অভিজ্ঞানে দু'একটা উদাহরণ নিয়ে একটা সম্ভাব্য আলোচনার সূত্রপাত শুধু করতে চাই। 'তৃতীয় বিশ্ব' (Third World) এই মুখপত্র লেখা হয়েছে ৭৩ টি পৃষ্ঠায়। বলা হয়েছে দেশের পরে OECD, কিনা ধনতাত্ত্বিক দেশগুলির গোষ্ঠী অথবা প্রাক্তন সোভিয়েত জোটের অন্তর্ভুক্ত নয় তাদের শনাক্ত করার জন্যই এই পদটি ব্যবহৃত হয়। এই পদটি ঠিক আছে।

মাত্র এই ক' টি শব্দে আর কতটুকু বববই বা দেওয়া যাবে। এই মুখপত্রটি দেখলেই বোঝা যায় যে বর্তমান অভিজ্ঞানের তত্ত্ববিশেষ 'তৃতীয় বিশ্ব' ধারণাগতভাবে বৃহৎ বেশি মাপিয়ার জায়গা নেই। এখানেই দৃষ্টিভঙ্গির কথাটা তুলছিলাম। তৃতীয় বিশ্ব যে অর্থনীতির ক্ষেত্রে আমাদের চিন্তার একটা বর্ণ হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে, এবং কখনও কখনও তা হয়েও থাকে, আর হলে যে তার সাহায্যে আমাদের অন্যাকম দৃষ্টিভঙ্গির সম্ভব হয়, এই সব সন্তাননাও এখানে উল্লেখ হয়ে গেলে। অথচ এই বর্ণনার সন্তোষ হিসাবেই, তৃতীয় বিশ্বের বাসিন্দা আমরা। আমাদের সে দায় ছিল এই ধারণাটিকে হুঁসে থেকে যতগুলো দরজা খোলা যায় তার ততো কটা। এমনকি 'তৃতীয় বিশ্ব' ধারণাটার 'উৎপত্তি' 'পলন' ও 'অবসান'-এর একটা ইতিবৃত্ত হাতে পেলে তাত্ত্বিক বর্ণের সঙ্গে সৈন্যবাহিনীর যোগসাজশের কথাটাও আমরা বুঝে নিতে পারতাম। এটাকেই বলছিলাম এনসাইক্লোপিডিয়ায়ী অভিজ্ঞানের তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি। এই দৃষ্টিভঙ্গির ওপরে নির্ভর করে তৃতীয় বিশ্বকে আমরা নিশ্চয় মানচিত্রের মাধ্যমে বিচার করব, না কি তার ধারণাগত মাত্রায় আশ্রয় নেব।

এ রকমই আর একটা প্রসঙ্গ 'বিশ্বায়ন' (Globalization)। এটা খুব ছোট লেখা নয়। সেটুকু কলাম বিস্তারে আলোচিত হয়েছে প্রসঙ্গটি। কিন্তু সম্ভবত ওই দৃষ্টিভঙ্গিগত অবস্থানের সমস্যাটির জন্য আলোচনার চেহারা কেমন একটা গা-বিকড়ে চলা গাছের দাঁড়িয়ে। প্রসঙ্গটি প্রথমত কালের ক্ষমায় চিহ্নিত হয়নি। বর্তমান পর্বের বিশ্বায়নপ্রক্রিয়া মোটামুটিভাবে বিংশ শতকের নব্বই দশকের ঘটনা। ওই সময়ের ঐতিহাসিক বিশিষ্ট সোভিয়েত শিবিরের পতনের সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িত। এমন কথা খোলা না করলে বিশ্বায়ন নামের সাম্প্রতিক প্রক্রিয়াটিকে বোঝা শক্ত। সামাজিক নামা ব্যাপারের বিশ্বপ্রসার এর আগে ঘটেছে। কিন্তু তার থেকে তফাত করে বিশ্বায়নকে নির্দিষ্টভাবে শনাক্ত করতে চাইলে আলোচনার ঐতিহাসিক মাত্রা প্রয়োজন। আর সেই নির্দিষ্টতায় সেখানে পারলে টেনে পাওয়া যায় এর সব সূক্ষ্ম-কৃষ্ণতা কোনও মনুষ্য একমাত্রিক ধারণা না। বিভিন্ন দেশের ক্ষেত্রে তার ফলাফল যেমন ভিন্ন হতে পারে, তেমনই একই দেশের মধ্যেও স্তরভেদে তার ফলাফল ভিন্ন ভিন্ন রকমের হতে পারে।

এ বার অন্য দু'একটা ছোটোখাটো কথা তুলে লেখা শেষ করি। আচ্ছা, ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং ব্যাঙ্ক অব ইংল্যান্ড আলাদা মুদ্রাপত্র হিসাবে আছে, কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বড় ইন্ডিয়া কেন? সাধারণভাবে এ ধরনের যে কোনও ইংলিশ এটা কোন আছে আর ওটা কোন নেই, এমন প্রশ্ন তুলে খুব লাভ হয় না। তবুও তুলছি এই অভিজ্ঞানের কাছে আমার প্রস্তাবনা



জন্ম। দৃষ্টিভঙ্গিপাত অবস্থান বিষয়ে আধিক্জ্ঞাসা আরও প্রথর হলে এই অসামান্য বিষয়ে অধিক্তিও আমাদের ভাবাবে। এই অভিজ্ঞান আমাদের রিজার্ভ ব্যাক নিয়ে সামান্য দু'এক কথা আছে 'কেন্দ্রীয় ব্যাক (Central Bank)' এই মুদ্রাশব্দের আলোচনায়। সেখানে ব্যাক অব ইল্যান্ড এবং ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম বিষয়েও আলোচনা আছে। তা সত্ত্বেও ওই দুটি কেন্দ্রীয় ব্যাক আলোচনা মুদ্রাশব্দের মর্যাদা পেয়েছে। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাক কিন্তু নয়।

'দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ (Dialectical Materialism)' মুদ্রাশব্দ মোটাটুটি বড় করেই লেখা হয়েছে। কিন্তু এই ধারণাটি নিয়ে যে সব সাম্প্রতিক অর্থস্তির সৃষ্টি হয়েছে তার কোনও ছাপ এখানে পাওয়া যায় না। সংশয়ের সম্ভাবনা একটু আভাসে থাকলেও ভাল হল। 'পছন্দের প্রাকৃতিকতার (Axioms of Preference)' মুদ্রাশব্দে 'স্বকৃতি' ধর্ম সম্বন্ধে বলা হয়েছে। 'স্বকৃতি বা যনির্ভর অঙ্গীকারটি একেবারেই তুচ্ছ।' (পৃ. ৩০৩) তা কিন্তু নয়। সন্দেহের ধারণার যে-আঙ্গিকে এই স্বার্থওলার সূত্রায়ণ সেই আঙ্গিকে দেবেল এ-ধর্মকে আর তুচ্ছ মনে হবে না। 'বিচ্ছিন্নতাভাব' (Alienation)' এই মুদ্রাশব্দে মার্কসীয় তত্ত্বের প্রসঙ্গে ৫১টি শব্দে যেটুকু বলা হয়েছে তাতে ধারণা যেমন পরিষ্কার হবার কথাও না, হয়নিও। মার্কসীয় তত্ত্বের অনুরূপে এই ধারণার মান আরও একটু বেশি শব্দ বরফ করলে ধারণাটির প্রাণ ওস্তরের প্রতি স্বাচ্ছন্দ্যিক মর্যাদা দেওয়া যেত। অতএব এই প্রসঙ্গে আদিপর্ব ও উত্তরপর্ব, এই দুই-মার্কসের সমস্যা নিয়ে

কিছু কথা বলা খুবই প্রত্যাশিত ছিল। তাতে করে মার্কসের মূল গ্রন্থসমূহ পড়ার দিকে পাঠকের একটু সন্দেহকভাবে এগিয়ে দেওয়া সম্ভব হত। 'ন্যায্য দর (Just Price)' এই ধারণার আলোচনায় মূল্যের ধারণা ব্যবহার না করায় ধারণাটির ভাবস্ফেট চিত্রকল্পে স্পষ্ট করা যায়নি। ৬৬৩ পৃষ্ঠায় 'সমস্যাশ্রিত দর প্রসঙ্গে আছে,' এছাড়া তিনি স্বর্ণপেত্র, রামায়ণ ও মহাভারতের ইতরেজী অনুবাদও করেছিলেন। এই ব্যাকটিকে ভুল বোঝার সম্ভব সম্ভাবনা। স্বর্ণপেত্রের অনুবাদ যে বাংলায় যে কথাটা কি এখানে থেকে পরিষ্কার হবে? কিছু কিছু বিশেষ নামের প্রতিষ্ঠাকরণে আরও একটু সাবধান হতে হবে। ছাপার ভুল বেশি না হলেও 'ব'একটা আছে। সকলের চোঁয়ান এ জাতীয় বই নির্ভুল ছাপা দেখলে খুব ভাল লাগে।

সব শেষে আর একবার বই, এরকম একটা কাজ যে হতে পারল তার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। আমি বইটিকে কোনো মানে খাপড় জানাচ্ছি। 'ব'একটা প্রশ্ন তুলেছি। তা বাংলায় অর্থনীতিচর্চার সামর্থ্যের সম্ভাবনা ভেবেই তুলেছি। এই মাপের একটা অভিধান গ্রন্থ হাতে পেয়েছি বলেই এসব কথা তোলার ভরসা পাচ্ছি। ধারণাশব্দের কাছে আবেদন তাঁরা অভিধানটির নিয়ত পরিচর্যার আয়োজন করুন। কালে কালে এটি বাংলায় অর্থনীতির স্ট্যান্ডার্ড অভিধান হবে উটুক।

সংসদ অর্থনীতি অভিধান- হীরেন্দ্রনাথ রায় ও ধীরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য/সাহিত্য সংসদ/ জানুয়ারি ২০০৫/২৫০.০০

## প্রাচীন বাংলার টেরাকোট

সুধীর চক্রবর্তী

না হার ঘোষমানুষের জন্ম ১৯৫১ সালে, নেশাতি তিনি চিত্রশিল্পী। চিত্রবিদ্যার ব্যাপারে তাঁর আকাজেচিকি তিনি নেই কিন্তু নেতার টানে ঘুরে বেড়িয়েছেন সারা দেশ, চেত করেছেন মন্দির মসজিদ অগণন, তার নক্সা বা অনুদ্বন্দ্ব অলসবন্ধ। ফটোও তুলেছেন দরকারে। এখন বসবাস করেন উত্তর চিলিপ পরগণার হুদাপুরে। অবস্থা বিপাকে ২০ বছর বাসেই চাকরি নিতে হয়েছিল কিন্তু প্রথম সুযোগেই ৫০ বছর বয়সে স্বেচ্ছায়ের নিয়ে নিয়েছেন— লেখালেখি, গবেষণা, আকাংক্ষিত কাজ স্বাধীনভাবে করবেন বলে। ব্যতিক্রম মানুষ নিঃসন্দেহে, বিশেষত এই জন্য যে ইত্যাকসরে লিখে ফেলেছেন 'দু'খানি বই প্রাচীন বাংলার টেরাকোট শিল্প এবং মধ্যযুগের বাংলা ইসলামী স্থাপত্যকলা বিষয়ে, ইংরেজি ভাষায়। বই দুটি বেরিয়েছে যথাক্রমে ২০০৩ ও ২০০৪ সালে, কলকাতা

বইমেলায়। এই পর্যায়ের অন্ত-মধ্যযুগের টেরাকোট শিল্প সংক্রান্ত তৃতীয় খণ্ড গ্রন্থ্যম্যান কিংবা হযাত প্রকাশিত হয়েছে। যাইহোক সরেজমিনে জানি এই শিল্পেরসিক ইতিহাসময় মানুষটির বই দুটি বেশ নবর কাছে বিশেষত তাঁর অঁকা অঙ্ক স্ফেরে জন্য এবং বিষয়গত আগ্রহের গভীরতা দেখে। যদিও বই দুটির চেহারা বইই ম্যানুসক্রে— শিল্প সংক্রান্ত বই বেশ খাঁচকতে হওয়াই উচিত। হালের কম্পিউটার প্রকৌশলের যুগে ফটোগ্রাফ মুদ্রণের অনেক মানিমা বেশ দৃষ্টিকটু। ফলত বই দুটি যতটা বিষয় গোঁরা ততটা নানমালোভন নয়। তাই ভবিষ্যৎ বিপণন সম্পর্কে সারা স্বাভাবিক।

সে যাইহোক, নীহার শোখ তাঁর বিখ্যাত বইয়ের ডুমকায় যে কম্পলিট করেছেন তা নানা কারণে উদ্বাহরণীয়। লিখেছেন।

I have never received any assistance from any

Government department or agency or institution in any form or kind whatsoever at any point of time. I did not also contemplate for any degree necessary for the sake or career or considered it a career achievement. The entire expenditure had to be budgeted from my salaries and by now also I have left the job for the sake of the work. Extensive travel, photography, drawings, purchase of books and materials, literary and reference works, processing of dates and informations in fact involved sizeable costs, time and energy. Moreover the costs of publication partially borne by me for both the works also aggravated the situation without scope for return.

লেখকের অসহায়তা ও আন্তরিকতা আঘাবিবৃত্তিতে স্পষ্ট, কিন্তু নিরপেক্ষ মানুষদের এমনও মনে হতে পারে যে সরকার বা প্রতিষ্ঠান কেনই বা তাঁকে আগ বাড়িয়ে অনুদান দেবে— যেখানে তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা বা বিষয়গত বিশেষজ্ঞতা নেই?

কাজেই লেখকের খেদ বা ক্ষোভকে পাশ কাটিয়ে আমরা বই দুটি পড়তে পারি এবং একে সিদ্ধান্ত করতে পারি যে কাজটি তিনি ভালই করেছেন। শ্রম ও হেদের চিহ্ন এবং বিন্যাসের যত্ন লেখার মধ্যে স্পষ্ট। বই দুটিকে descriptive বলাই উচিত, সেই অর্থে এর মূল্য তথাগত। অবশ্য ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির মানা বিশেষায় ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রথম বইটির একটি দায়সারা Preface সাতটি বাক্যবন্ধে সাঙ্গ করেছেন। বইটি তাঁকেই উৎসর্গ করা অঙ্ক তিনিও প্রকাশনা লিখেছেন— বিখ্যাত অভিনয়। যাই হোক তাঁর দ্যোতক বক্তব্য হল বইটি প্রাচীন বাংলার টেরাকোট বিষয়ে 'an artist's interpretation' এবং 'The most interesting part of the monography consists of handdrawings of terracotta figures and panels'— মনসী ইতিহাসবেত্তার বক্তব্য একেবারে লক্ষ্যকেন্দ্রী।

এবারে আলোচনায় আসা যাক। নীহারবাবুর প্রথম বইয়ের নাম 'Art of ancient Bengal terracottas'— দ্বিতীয় বইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গের, নাম 'Islamic Art of Mediaeval Bengal Architectural Embellishments'। বই দুইয়ের বক্তব্য বিন্যস্ত হয়েছে ৬টি অধ্যায়ে এবং যথেষ্ট ভাষায়। প্রথমটি ইতিহাসময় ও টেরাকোটায় বিষয়বৈচিত্র্যের কারণে মূল্যবান। লেখক-শিল্পী নিজের হাতে লাইন ড্রইং করে ৪০৫টি টেরাকোট মোটিভ একেছেন এবং তার বিষয়গত পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর অঁকা স্কেচগুলির মূলরূপ পাওয়া গেছে প্রধাত চন্দ্রকল্যাণ, তমলুক, আদিত্য, পাহাড়পুর ও ময়মনসীরিতে। এগুলির অনুমানিক সময়কাল নির্দেশিত আছে। পাণ্ডুরাজার চিহ্ন

মহাহানগড় প্রভৃতি স্থানের উৎখননেও পাওয়া গেছে বহু নমুনা। টেরাকোট বাংলায় নিম্নর শিল্পমাধ্যম এবং এই কাজে সুপ্রখ্যারদের ভূমিকা খুব উল্লেখযোগ্য ছিল। এসব বিষয়ে নানা সময়ে 'মর্যাদী কাজ করে গেছেন নীহাররঞ্জন দাস, সরসীকুমার সরস্বতী, বিনয় শোখ, অমিত্যকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেভিড ম্যাকান, মাদিনেকাল সিংহ বা ভাদ্রাপদ সীতারদার মতো দিল্লিপাল ব্যক্তি। তবে নীহার শোখ উল্লেখ পাওনে একটা নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে পূর্ণাঙ্গ বই আকারে বিষয়টি সার্বিক আলোচনা করেছেন বলে।

বস্তুত আমাদের এই নবীমাতৃক দেশে, রূপসী বাংলায়, পলিমাটির আর দে-মাতো মাটির দক্ষিমে মুক্তিক-নির্ভর শিল্প যেন বনজ সম্ভারের মতো স্বভাবগত গড়ে উঠেছে। সেই পেরে কাঁচামাটি শিল্পী হাতের চাপে বা বাঁশের কেয়ারির সুন্দর ব্যবহারে সজীব শিল্পরূপ পেয়ে গেছে কিন্তু তাকে এক চিরনয়না মিতে লেগেছে অরি'স্পর্শ বা সৌন্দর্য ওজস্ব। রাঙের পাথরের মতো মাটি টেরাকোটের পক্ষে আদর্শ। লেখক চমৎকার ইতিহাসবোধের পরপরা। মেনে আমাদের বঙ্গবন্ধুর চোঁয়ান টেরাকোটায় বিষয়গত শ্রেণিকরণ ও তার বিবর্তনরেখার কথা। টেরাকোট সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা আছে এবং তার প্রস্তুতি ও সময়কালের পরিচিতি আছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে টেরাকোটায় বিষয়গত শ্রেণিকরণ ও তার বিবর্তনরেখার কথা। তৃতীয় অধ্যায়েই বিশেষ আকর্ষণীয় কারণ তাতে আছে টেরাকোটায় থিমোটিক পরিচয়— পত-পাখি-মাকড়সী-ব্রাহ্মণ সংস্কৃতি দৃষ্টান্ত দেবেন্দ্রীমূর্তি। এর পাশাপাশি নানা ভাব ও যাদববোধের রূপায়ণ, যেমন রাক্ষস, উড়ন্ত প্রাণী, যক্ষ-গন্ধর্ভ-কিয়ার-কিয়ার-কিয়ারের কল্পিতরূপ। দেবদেবী পরিকল্পনাতেও অবশ্য আমাদের anthropomorphic চিত্রার ছাপ প্রবল। হিন্দু সংস্কৃতির পাশে বৌদ্ধ দেবমূর্তির রূপায়ণও বাংলা টেরাকোটায় আছে কিন্তু জৈনমূর্তি নেই। অবশ্য টেরাকোটায় একটা সমৃদ্ধ অংশ হল লৌকিক দেবদেবী। এছাড়া টেরাকোটায় নানা সজাং চিত্র, ফুল, মাটির পুতুল এবং মিশ্র মূর্তি— নীহার শোখের চোঁয়ান সর্বস্ব। চতুর্থ অধ্যায়ে লেখকের লক্ষ্য সমাজ ইতিহাসের ও ধর্ম ধারণার চিহ্ন টেরাকোটায় কতটা— নির্ণয় করা। এরপরে দুটি অধ্যায়ে টেরাকোটায় শিল্পীপরিচিতি ও এই শিল্পের নন্দনাত্তিক মূল্যায়ন আছে।

মধ্যযুগের বাংলার ইসলামী যুগপতের নির্ভরযোগ্য দলিল নীহার শোখের দ্বিতীয় বই 'Islamic Art of Mediaeval Bengal Architectural Embellishments'। বলা যাচ্চা স্ব স্ব উল্লেখ মূল্যমান শাসনের সূচনা মধ্যযুগে। এই সন্ত এটাও উল্লেখযোগ্য যে ইসলামী ধর্মশাসনের একটা প্রাচীন স্তম্ভ হল সমবেত নামাজ, যার প্রকৃষ্ট স্থান মসজিদ। কাজেই দেশবাণী



মসজিদ অব্যাহতি নির্মিত হয়েছে এবং তার নির্মাণকৌশল ও অলঙ্কার একটা নতুন বিষয়। তাছাড়াও নানা অলঙ্কৃত স্তম্ভ, তোরাশ, দরোজা, পৃথক এই ধর্মীয় স্থাপত্যের অঙ্গ। এ ধরনের সরবক স্থাপত্যকে ভাগ্য করা হয়েছে পাঠান পর্ব, মোশল পর্ব এবং নবাবি পর্ব—এই ত্রিধা পর্ব। এ ধরনের শিল্পকৃতির ভূগোল গৌড়বঙ্গ, ঢাকা, চট্টগ্রাম, কালনা, ঝগলি, দিনাজপুর, মেদিনীপুর, নওগাঁ, মালদহ, হাওড়া, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি সর্বত্র বিস্তৃত এবং এগুলির নির্মাণকাল ১৪৭৫ থেকে আঠারো শতক পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ের। বঙ্গত মুসলিম শাসনপর্ব থেকে বসীরা স্থাপত্যে যে রূপগত নানা পরিবর্তন এসেছিল নীহারবাবু তা তথ্যসংগ্রহের বিশ্লেষণ করেছেন। তবে মনে রাখতে হবে এই তথ্যও যে সর্বভারতীয় ইসলামি স্থাপত্যে যতটা বিশেষগত বিজ্ঞারী জাতির আভিজাত্য ও নিজস্বতা আছে বাংলার ধর্মাত্মিত মুসলিমদের সৃষ্টিতে ততটাই সমন্বয়চেতনা কাজ করেছে অর্থাৎ তা একই সঙ্গে বয়স্ক শিল্পদ্বারা এবং ইসলামি বিশ্বাসের যৌথ প্রকাশ। তার মধ্যে বৈচিত্র্য শিল্পকলার প্রভাবও খুব দৃষ্টব্য নয়। কিন্তু অলঙ্কারের ক্ষেত্রে ও বিষয়বস্তুতে বিস্তর পার্থক্য। পার্শ্বের কার্য এটাই যে ইসলামি বিশ্বাসে শিক্ষকতা কেনে—যেবৃত্তি, পণ্ডপাতি বা জীবিত বিয়ের হান নেই। সেই অভাব অলঙ্কারের ক্ষেত্রে লতাপাতা, নওগা, ফুল বা নানা ডিজাইন দিয়ে ভরাণো

হয়েছে। মুসলমানরা অশৌভলিক তাই হিন্দু মন্দিরের মতো তাতে ফুটে তো নেই—ই, উপরন্তু কিম্বদন্তি অঙ্গরদের অম্লকরিত রক্তোত্তা বা গিরপীরীদের কাননিক অবয়ব নেই। কিন্তু আছে অত্যন্ত চমক আরবি কলিপি বা ক্যালিগ্রাফি যা অনেক সময়ে বোহিদিত এবং অপর্য দৃষ্টিনন্দন। নীহারবাবু বইয়ের শেষে ২৬ থেকে ৩০ সংখ্যক আলোকচিত্রে নানা ধরনের ক্যালিগ্রাফি সৌন্দর্য করে পাঠকদের সম্মোহিত করেছে। বলা যায় এছাড়াও নানা আলোকচিত্রে ও স্কেচে ভিজিটিং, অলিন্দ, জাফরি ফুলগুলি নানা সুন্দর কাজের নমুনা সংযোজন করে চমৎকারভাবে উল্লেখ্য করেছেন মুসলিমমানসের কল্পনাসক্তি ও চিত্রশ্রমের মুশিয়ানা। এসব কাজ স্থাপত্যের অচ্ছেদ্য অংশ এবং জাতীয় সম্পদ। তবে শোচনীয় কথা এটাও যে কি মন্দিরস্থাপত্য বা কি মুসলিম স্থাপত্য সবই কালের প্রবাহে পাণ্ডু এবং বহুক্ষেত্রে অলঙ্ঘনীয়।

নীহার বাহের বই দু'খানি আমাদের শিক্ষক করে, ঐতিহ্যকে চিহ্নিত করে। তাই আমরা এর চর্চাও বিপণন চাই।

Art of ancient Bengal Terracotta—Nihar Ghosh/  
Suchetana, Kolkata-9/150.00  
Islamic Art of Mediaeval Bengali Architectural  
Embellishments—Nihar Ghosh/Suchetana, Kolkata-  
9/200.00

## বিদ্যাসাগর জীবনকেন্দ্রিক তৎকালীন বঙ্গসমাজের ইতিহাস

### দেবেরত বন্দ্যোপাধ্যায়

বিদ্যাসাগরকে তাঁর জীবদ্দশায় চিরকাল কুংসা নিপা হিসেব ও ঘোষের শিকার হতে হয়েছিল। যে-কর্ম স্বসমাজকে উনি শোষণারতে চেষ্টা করেছিলেন এবং বেশ কিছু পরিসরে সফলকার হয়েছিলেন, তাতে উনি অনেকের স্বার্থে আঘাত করেছিলেন। তাঁরা যে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেন এবং তার জন্য তাঁকে মারিতকি অস্বাভাবিক ভূগতে হবে সেটা অস্বাভাবিক নয়। এটা উনি অনেকটাই সয়ে নিয়েছিলেন তাঁর কাজের স্বাভাবিক ঝগড়া হিসাবে। কখনোনি প্রতিদ্বন্দ্ব শক্তির বিরুদ্ধে এবং লী দুর্ভাগ্য সাহস ও নৈতিক দৃঢ়তা নিয়ে তিনি একা লড়াই করেছিলেন তা একদা বছর পুর অমরা বড় যে হায়দরম করতে পারছি তা মনে হয় না। সেই জন্য শ্রীখানিকুমার সামন্ত রচিত 'বিদ্যাসাগর—ওপনিবেশিক সমাজে বিদ্যাসাগরের অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা' শীর্ষক বইটি এই প্রজন্মের শিক্ষিত নবদলীয়ের সেই মনো প্রবোধী পুরুষকে হরণ করিয়ে দিয়ে এক বিরাত শূন্যতা পূর্ণ করেছে।

হেলেগোয়া বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়'র মাধ্যমে বর্ণ পরিচিতি হওয়ার ফলে আমাদেরকে হতে বিদ্যাসাগরের মন জানেন।

কিন্তু অদ্বা কিছুটা যুক্তিবাদী, কিছুটা কুসংস্কারমুক্ত বাঙালি সমাজকে গড়ে তুলতে ওঁর যা অপরিসীম অবদান তার কথা অনেকেই জানেন না এবং জানার ক্ষেত্রেও প্রচেষ্টা করেন না। যেমন হয় কালের ধুরভার বিদ্যাসাগরের ছবি জনমানসে প্রায় মারা হয়ে মুছে গেছে। অথচ এই সমাজকে প্রাতিশীল করতে, এর উন্নতির সর প্রতিকল্পকতা হাঙতে, একে কুসংস্কার থেকে মুক্ত করতে উনিবিশ শতাব্দীতে যা দুই মহান বাঙালির মনো প্রকাশ ও প্রচেষ্টা ছিল তা যদি আমরা ভুলে যাই তাহলে সবারকম বৈদুতিক যন্ত্রপাতি ও তার পারদর্শিতা নিয়ে সমাজ যে শেখনের বিকশিত পথাননা হবে তার বহু নিদর্শন তা আমাদের প্রাতঃহর জীবনে সর্বমামা দেখতে পাচ্ছি। পল্লের জন্য বৃহৎহা, কন্যা বৃহৎহা, নানা রকমের নারীনিগির, শিশুশ্রমিক নিরোগ্য, নারী হোতানোর কত খবর রোজ কাগজ খুলেই দেখা যায়। এগুলো কি সমাজের এগিয়ে যাওয়ার লক্ষণ না পিছু হারি নিদর্শন? এই পরিবেশকিতে অমিয় সামন্ত মহাশয়ের ক্রিয়াসাগর বইটি শুধু সময়োপযোগী হয়েচে তা নয়, এক পরনিবেশিকার কাজ করেছে।

আজকের শিশুসমাজে বিদ্যাসাগরকে নিয়ে দু'বকসের প্রক্রিয়া চলছে। পূর্ব ও বর্তমান প্রজন্মের নৈতিকমান সর্বাঙ্গিক শিক্ষিত সমাজে বিদ্যাসাগর আজও এক পূজনীয় ব্যক্তি। তাঁদের মন আকৃষ্ট করার জন্য এক সরকারি দপ্তর কর্তৃপক্ষ তাঁদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য চিরহায়ী টিকা নিয়েছেন বিদ্যাসাগরকে। এবং বিদ্যাসাগর যেন তাঁদেরকে গমিতে চিরহায়ী করতে চেয়েছেন এরকম একটা ভাবনা নিয়ে একটা শালীনতাহীনতা দেখিয়ে বিদ্যাসাগরকে জনমানসের সামনে আনার চেষ্টা করছেন। সেই অশিষ্ট আচরণ প্রকাশ্য ব্যাপ্য প্রতি শীতকালে রবীন্দ্রসদনে সামনের মাঠে হেলেভাজা, ঝালফুটি, ফুলুরি 'চাও' ইত্যাদির সেকান খুলে বিদ্যাসাগর মেলা করে। বিদ্যাসাগরমশাই গ্রামের মানুষ তাই হয়ত তেলেভাজা খেতে পছন্দ করতেন। কিন্তু তাঁর আমলে 'চাও' ছিল না। তাঁকে মধ্যশ্রেণীর চীনা খাবারের আদ্যমণ সেওয়ার জন্য 'চাও'-এর ব্যবহার করে মেলার প্রতীকভাষ্য—এই প্রচেষ্টাকে সাধারণ্যে না দিয়ে কোনও উপায়ে সেই শীতের পড়ন্তবেলায় কিছু মুরগোয়াক ব্যবহার করে দু-একটি চটকপরি entertainment item দেখে কিছুকালের জন্য জীবসুখের কটোরতা ভুলে যাওয়ার ব্যবস্থা করার নিশ্চয়ই একটা সামাজিক মূল্য আছে।

আর একদিকে হচ্ছে "বর্ণপরিচয়"-এর ভেঙ্গেশা বছর পুঁঠিতে রাষ্ট্রপতিত-এর কবিবন্দো"। (শ্রীবিবরণন চট্টোপাধ্যায়: নৈনিক ভেঙ্গেশা-মহান-এ আগস্ট ২০০৫)। কিছু গড়া রেলিং বুদ্ধিজীবী ভেঙ্গেশা বছরের পুরনো 'বর্ণপরিচয়'-এর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় একবারে দেয়ে দেয়ে রাগেগিয়েছে উদ্বাহ হয়ে বিদ্যাসাগরকে গালমন্দ করছেন। যা হচ্ছে তা স্বাভাবিক। এটা রুটি রাগেগিয়ের ব্যাপ্য। ভেঙ্গেশা বছরের পুরনো বর্ণপরিচয়-এর সঙ্গে ত্রিক্রিয়ায় এদের অধুনাভূত 'পবিত্র' ভাষায় ও বানানমুগ্ধ বইগুলো ছেলে মার খাচ্ছে—সেটা তা রাগের কথা হবেই। তবে বলাগে পারেন একই রাজনৈতিক গোষ্ঠীর হয়েও একদল বিদ্যাসাগর মোহন করছেন এবং আর এক অংশ সেই উনিবিশ শতাব্দীর পঙ্কিল বঙ্গসমাজের হিংসা, কুংসা ও ঘেহ ছড়াচ্ছেন এটা কি করে হয় এর একটা তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা আছে। তা হচ্ছে হেলেস সাহেবের 'ভালেকোটি'। মোহনকারীরা হচ্ছেন থিনিস। হিংসুকরা হচ্ছেন 'অ্যান্ডি থিনিস'। এবং এর সঙ্ঘর্ষে যে গভীর ঘৃণিতক হয়েচে তার পরিণতি সিনিথিনিস প্রকাশের সমতলে যাবে না নীল আকাশে উদ্ভুক্ত উচ্ছ্বাস হয়ে দেখা দেবে সেটা বুঝি চিন্তার বিষয়। এই অবস্থায় নথ পত্রপত্রের জন্য 'বিদ্যাসাগর' বইটির প্রয়োজন প্রয়োজন।

প্রস্তাবনা ছাড়া বইটিতে ছয়টি অধ্যায় আছে। অধ্যায়গুলি বিষয়ভিত্তিক, সময়ভিত্তিক না। বইটি বিদ্যাসাগরমহাশয়ের সাধারণ জীবনী নয়। এটি তাঁর জীবনভিত্তিক উনিবিশ শতাব্দীর বঙ্গসমাজের সমাজতন্ত্রিক ইতিহাস। লেখক বিদ্যাসাগরকে কেন্দ্রে রেখে গভীর গবেষণা করে তৎকালীন সমাজের অতি মূল্যবান ও প্রামাণ্য ইতিহাস লিখেছেন। এতে এত তথ্য আরহে যা সচরাচর কোথাও পাওয়া যাবে না। তা ছাড়া বেশ কিছু অজানা তথ্য নিয়ে বইটিতে সমৃদ্ধ ভুলেছেন।

প্রথম অধ্যায় 'বিদ্যাসাগর ও ঔপনিবেশিক প্রশাসন' পড়তে পড়তে মনে হতে পারে যে বিদ্যাসাগরের মতো এক নির্ভীক ব্যক্তি এতটা সমঝোতা করে চলেছিলেন কেন? লেখক দেখিয়েছেন যে তাঁর এই সমঝোতা ছিল tactical adjustment। এটা কোনও strategic concession নয়। সে যুগে নারীকে উচ্চ সমাজসংস্কার করে গেলে প্রশাসনের সাহায্য ছাড়া কোনও উপায় ছিল না। প্রশাসনের সঙ্গে বিবাদ বাচিয়ে, ঝগড়া করে তিনি তাঁর Strategic Goal থেকে বিচ্যুত হতে চাননি। তবে যেখানেই তাঁর আদ্যসংসান আঘাত লেগেছে—সেখানেই ভয়েশোশীন হয়ে রুখে দাঁড়িয়েছেন।

লেখক যে কত গভীর গবেষণা করেছেন তার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় প্রতি অধ্যায়ের শেষে সূত্রনির্দেশ। অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বিষয় যত হ্রদয়গ্রাহী, সূত্রনির্দেশের টাকটাকি তার চেয়ে কোনও অংশে কম চিত্তকর্ষক নয়। অনেক অজানা তথ্য এই সূত্রনির্দেশের ভেতর পাওয়া যায়। লেখকের আশাশ্রয় পরিচয়ের সাক্ষ্য বহু করছে এই সূত্রনির্দেশ ও পরিশিষ্টগুলি।

বিদ্যাসাগর কি শুধু সংস্কারক না বিরোধী? লেখক বিদ্যাসাগর কি খাটি কোথাও ব্যবহার করেননি। তখনকার নারীবিরোধী ও নারী-নিপেক্ষকারী সামাজিকের সঙ্গে একটি পরিচিত না হয়ে বিদ্যাসাগরকে কী অপরিহার্য মধ্যা অতিক্রম করে তা হলেছিল তা আজ বোঝা সম্ভব নয়। বিদ্যাসাগর বালাবিহারের বিরোধিতা করেছেন, কিন্তু তিনি নিজেই এই প্রকার শিকার হয়েছিলেন। সেকালে অনেক সমাজসংস্কারক ব্যক্তি এই কুপ্রণালী ভুক্তভোগী ছিলেন তার নিদর্শন নীচের তালিকায় পাওয়া যাবে।

পাড়ের নাম	বাস	পাড়ার বয়স
১. দেবেপ্রনাথ ঠাকুর	১৪	৬
২. কেশবচন্দ্র সেন	১৮	৯
৩. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১১	৫
৪. জ্যোতিব্রন্দনাথ ঠাকুর	১৯	৮
৫. ভূদেব মুখোপাধ্যায়	১৬	১১







sight to be hold the Native children sitting side by side with the Sons of Europeans.' ধর্মতলা একাডেমির পরীক্ষা ও পুরস্কার বিতরণী উৎসবে দেশি-বিদেশি ছাত্ররা সমানভাবে নিজস্বের সাক্ষ্য প্রদর্শন করত। সেখানে উপস্থিত থাকতেন গণমাণ্ডা ব্যক্তিরা। ক্যালকাতা জার্নাল, বঙ্গল হেরাল্ড, বঙ্গল হরকরা, বঙ্গদূত, সংবাদকৌমুদী প্রভৃতি পত্র-পত্রিকারা পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে ধর্মতলা একাডেমির শিক্ষক ও ছাত্রদের নানা সংবাদ। ডিরোজিও নিজেও ধর্মতলা একাডেমিতে ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে পরীক্ষাকে হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, 'The most pleasing feature in this institution is its freedom from illiberality.'

ড্রামন্ডের স্কুল ছিল কলকাতার সেরা বিদ্যালয়তম। আর তিনি, শক্তিসাধনের ভাষায়, 'সুপণ্ডিত, সুভদ্র, প্রগতিসাহিত্য, গণিত ও অধিকাংশ দর্শনে বিরাগদ ও সু-অধ্যায়ী, বাচিক সমালোচনার পাণ্ডরশী'; প্রাচীন শাস্ত্রাকরকার জ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত এবং স্বাধীন চিন্তাশক্তির অধিকারী।' ডেভিড হিউমের সংশয়বাদে ছিল তাঁর গভীর আস্থা। সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া তিনি মানতেন না কিছুই। এই দর্শন-চর্চার মধ্য দিয়েই তাঁর মনো যে যুক্তিবাদী মন তৈরি হয়েছিল তার ফলশ্রুতিই হচ্ছে 'নিরপেক্ষ' নিবন্ধ, যেখানে বলেছেন, 'there was not such thing as genius.' এবং এই তত্ত্বের মধ্য দিয়েই প্রকাশ পেয়েছে তাঁর বিশ্বমানবতাবাদ। 'ড্রামন্ড বর্ণ ও জাতি দিয়েই বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি মনে করতেন সব মানুষই তা সে যে জাতির, যে বর্ণের, যে দেশেরই হোক না কেন—একই রকম, মেধা, যোগ্যতা ও সম্ভাবনার অধিকারী। উপন্যুত পরিবেশে, শিক্ষণ ও কর্মের মধ্যে থাকে রাখলেন সে পূর্ণ বিনশিত হয়ে উঠতে পারে।' এই উদার মানবতাবাদের প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর একাডেমিতে। আর সেখানেই সৃষ্টি হয়েছে ডিরোজিওর মতো মানুষ, স্বাক্ষর, প্রতিভার আধার। তাঁর মৃত্যুর পরেও যখন অহেতুক বৃন্দা রটনো হচ্ছে তখন তাঁর মাস্টারমশায় ড্রামন্ড 'উইলিয়াম এঞ্জলমিনার'—এ লিখেছিলেন, 'ডিরোজিও ও তুলু যুগের শিক্ষক, যুবকদের চোখের মণি, স্বাধীন চিন্তার প্রচারক। তাঁর নামে অকাল বৃন্দা বহু হোক।'

ড্রামন্ড ধর্মতলা একাডেমির শুধুমাত্র শিক্ষক বা মালিক ছিলেন না। গোটা সমাজের শিক্ষণ-প্রচার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তিনি কবি ছিলেন। দর্শনে পণ্ডিত ছিলেন। সমাজ সচেতন লোক ছিলেন। সাংবাদিকতা করেছে মন দিয়ে। নিজের পত্রিকা ছিল 'উইলিয়াম এঞ্জলমিনার'। পরে বঙ্গ হয়ে যায়। বঙ্গল হরকরাকে লিখেছেন শেষ পর্যন্ত। তখন 'লেখার ওপর নির্ভর করেই তাঁর জীবনধারণ।'

শেষ জীবনে তিনি কঠিন শীড়ায় অক্লান্ত। আর্থিক দীনতায় বিপর্যস্ত। থাকতেন একা, অসহায়ক পরিবেশে। 'মৃত্যুর ঠিক আগের দিন তাঁর এক প্রিয় ছাত্র এই বি গার্ডনার তাঁকে জোর করে তুলে নিয়ে গেলেন নিজের বাড়িতে। কলকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষক শেষপর্যন্ত ছাত্রের বাড়িতেই ত্যাগ করলেন শেষ নিশ্বাসে।'

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় পরিশ্রম করে ড্রামন্ডের জীবনী লিখেছেন। শুণু জীবনের ঘটনাপঞ্জির উল্লেখ তাঁর এই কন্ঠার উদ্দেশ্য নয়। এবং তা কাকিত্বও নয়। ড্রামন্ডকে ঘিরে অনেক কাহিনি, দেশি-বিদেশি অনেক চরিত্র এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিহিতির সমাবেশ ঘটেছে যার মধ্য দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ সামাজিক ইতিহাসের পরিচয় পাওয়া যায়। বৃহত্তর পরি ইংরেজ ল আন্দোলনের শিকড় কোথায়। আন্দোলনের নেতৃত্ব ছিলেন ডিরোজিও। আর ডিরোজিও তো ড্রামন্ডের হাতেই তৈরি। ড্রামন্ডের মানস পুত্র। শক্তিসাধনের নিপুণ লেখনীতে তা ফুটে উঠেছে। ডেভিড ড্রামন্ড যে সত্যিই কলকাতার আদি আচার্য ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। এই সত্যি শক্তিসাধনের রচনায় প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

এই বইয়ের দ্বিতীয় পর্বটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে জীবনী প্রথম পর্বের বিষয় তার ভিত্তি দ্বিতীয় পর্বে নিহিত রয়েছে। দ্বিতীয় পর্বটিতে সংকলিত হয়েছে ডকুমেন্টস। 'ওরিয়েন্টাল ম্যাগাজিন'-এর জুন ১৮৪৩ সংখ্যায় প্রকাশিত 'A Brief Memoir of the Late Mr. David Drummond' রচনাটি এই বইতে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। এটিই ড্রামন্ড সম্পর্কে দীর্ঘ নির্ভরযোগ্য রচনা। বোধ হয়, তাঁর সম্পর্কে জানার অন্যতম উল্লেখযোগ্য উপায় এই লেখাটি। ড্রামন্ডের লেখা কয়েকটি কবিতাও এই পর্বে সংকলিত হয়েছে। সন্নিহিত হয়েছে ধর্মতলা একাডেমির অনেক নথি। ১৮১৭ থেকে ১৮৩১ পর্যন্ত ক্যালকাতা গেজেট, গভর্নমেন্ট গেজেট, ক্যালকাতা জার্নাল, সান বুল, ক্যালকাতা মাস্ফিল জার্নাল, বঙ্গল হরকরা, বঙ্গদূত, বঙ্গল হেরাল্ড, ইন্ডিয়া গেজেট প্রভৃতি পত্রিকা থেকে Report of the Annual Examination সংগ্রহ করা হয়েছে। এই রিপোর্টগুলি থেকে ধর্মতলা একাডেমি সম্পর্কে অনেক বিষয় জানা যায়। তাছাড়া ড্রামন্ডের একমাত্র বই Objection to Phenology থেকে বিশেষ বিশেষ অংশ উদ্ধৃত হয়েছে ড্রামন্ড-এর The Weekly Examiner and Literary Register থেকে অনেকগুলি লেখা দ্বিতীয় পর্বে স্থান পেয়েছে। 'বঙ্গল হরকরা'য় প্রকাশিত তাঁর পত্র-নিবন্ধ 'Appreciation of the Hindoo Character' এবং ১০ মার্চ ১৮৪০-এ বেকানির ইনস্টিটিউট

প্রদত্ত তাঁর শেষ বক্তৃতাটি এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। সেডুশো পৃষ্ঠার উপরে সংকলিত ডকুমেন্টস বইটির মূল্য বাড়িয়েছে। এত যত্নে এত পরিমাণে তৈরি বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

কলকাতার আদি আচার্য : ডেভিড ড্রামন্ড (Teacher of Derozio)—শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়/ডিরোজিও স্বাক্ষর সমিতি পুনর্মুদ্রা, কলকাতা/২৫০.০০

## হিমালয় নামক নগাধিরাজ ভবানী-প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

একটা সময় হিমালয় অরণ্যের কাহিনি লেখার খুব একটা জোয়ার এসেছিল। তখনই তখন শিবরাম চক্রবর্তী কে-সব অম্বা কাহিনির লেখকদের দুটি শ্রেণিতে ভাগ করতেন। প্রথম, যারা হিমালয় অম্বা-কাহিনি লিখে সেই টাকায় হিমালয় অম্বা করতে বেরতেন। তারা সং লেখক। আরেক শ্রেণিতে ছিলেন যারা অম্বা লেখক। তারা তার পরেও যেতেন না।

অম্বা এ অপদার আদার বিশ্বাস করি না, তবে এ কথা ঠিক, শুধু হিমালয় কেন, অনেক জায়গার অনেক অম্বাকাহিনি পড়ে মনে হয়, এই লিখবার জন্য, সেখানে যারা দরকার ছিল না। পাঁচজনের পাঁচখানা অম্বাকাহিনি পড়ে-এরকম একখানি বই বাছা থেকে না বেরিয়েই লেখা যায়।

সুখের বিষয়, এই-বইখানি তেমন নয়, এর পাতায় পাতায় হিমালয়ের অসীমতার মধ্যে পাঠক তাঁরই মতো হাবিশাস সীমাবদ্ধ গুটিকয়েক মানুষের বিষয় ও আনন্দ উপলব্ধি করতে পেরে যুগ্মি হয়ে ওঠেন। যে এনা তৈলের সর্দাই হয়ে ওঠেন, ওই যে সর্বভাষী মানুষটি, যিনি এই কাহিনির লেখক, অম্বা উল্লেখই কেনও এক অমোঘ আকর্ষণ পথের বিপদ অগ্রাহ্য করে চললে, ইচ্ছে করে আমিও যেন তাঁর হাত ধরতে পারি; ওই যে মহিলা, রোগাশুণ, অশ্বকেশ, যিনি মনে করেছিলেন, 'পাহাড়ে আর এখন উঠতে পারেন না' নিজের চোখে দেখতে ইচ্ছে করে তিনিও পাহাড়ে উঠতে পারেন। সী করে পারলেন? পারলেন না যদি না তার হাত ধরতে এগিয়ে আসতেন এক যুবক, যিনি থাকেন বিদেশে, চক্রর দিয়ে বেড়ান সারা পৃথিবী।

তিনি বহলিঙিয়ে, 'না বাপু, অত দিন পাহাড়ি জায়গায় আমি ঘুরতে পারব না।.....মধ্যযুগে না মালিন্যটি ম্যালেরিয়ার পর থেকে আমার শরীর কেনম ভেঙে গেছে।' তাঁর ভাইপো বললেন, 'বই জানোই তো তোমার আরো বেশি পাওয়া দরকার।'

'মুর্তিমান সবকুড়ের মত খোঁকন এসে হাজির হল একদিন'। সবকুড় না হলে হাত ধরে আর কে নিয়ে যাবে হিমালয়ে, সেবতাদের আলোড়ন? হিমালয় আমাদের মাউন্ট অলিম্পাস। যেনে সুখিলা আমাদের দেশ, তেমনই দিল্লিপাণ্ডববিন্দু আমাদের

দেবভূমি, হিমালয় নামক নগাধিরাজ।

দেবতাদের কথা কালিদাসই বলতে পারতেন, আমরা যা দেখি, তা হল, লেখকের ভাষায়, 'মন্দির আর মন্দির, হিমালয়ের উত্তর-পূর্ব-পশ্চিম যে দিকেই যাও, দেবেউল ছড়িয়ে আছে পথে পথে।' পূর্ব হিমালয়ে অবশ্য মন্দির তত দেখা যায় না। সোনকাল নামভোগেও অনারক। দেবকোণ, রূপপ্রাণ্য, হরিদ্রার তামির বদলে, দার্জিলিং, কল্যাণী ইত্যাদি। তবে মন্দির বেশিই থাক আর কমই থাক, জায়গার নাম যেনই হোক, দেবতারা তার শিরের শিখরে বিরাজ করুন আর না করুন, মানুষের স্পর্শ এখানে এসে একটা মাথা নিচু করলে ভাল হয়। টুরিস্টদের ভিড় ছাড়িয়ে একটা দূরে যান, কেনও ডালপালা দিয়েই হিমালয়ের উজ্জ্বল শৃঙ্গাধির বিকে একবার চোখ তুলে তাকান, বুঝতে পারবেন, মানুষের পিকনিক-স্কেজ করে, তার পরিত্যক্ত আবর্জনা বহন করবার জন্য এর সৃষ্টি হয়নি। তবে মানুষ যে এখানে থাকে না তা নয়। বহু মানুষের মুখ মাঝে মাঝে দেখতে পাই, মানুষ মাঝে মাঝে একটা সামনে এগিয়ে আসে বারই তার পেছনে হিমালয়ের চিরতুষার, নিরবধি কালের আসে, আমাদের চেতনাকে এমনভাবে নাড়া দেয়। অশোক বিজয় রাসের কলকটি অবিশ্বরণীয় লাইন আবার মনে পড়ে যায়, 'তাহলে দেখছে তুমি/দূরে সেই ধবলশিখর/ নিরবধি কাল।'

একটি ডায়েরি লিখেই যোগাড় হয়ে:

'পর দিন ২৮শে যে ঘুম ভাঙতেই দেখি সকালের নরম রোদ পাহাড়ের পশ্চিমে পর্বতশ্রেণীর উপর, উত্তরে পশ্চিমে সৌন্দর্যী উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। আকাশ পরিষ্কার, উপত্যকার শস্যক্ষেত্রে গম ও যবের শীর্ষে সোনালী রঙের বিলিক। পাকা যবের ফল কটা গুঁড় হয়েছে। গম উড়িয়ে পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট ফল সাধা আর যুবর রঙের প্রভাষে পরিণত। শস্যসুলভ চঞ্চলতা। পূব দিকের বিস্তীর্ণ পর্বতশ্রেণীতে পাইনের বনানী গাঢ়



সবুজের রঙ মেললে ধরিয়ে। ...দেখে দেখে আশ মেটে না। প্রকৃতির রূপসাগরে ভুল দিয়ে মনটা প্রসন্নতায় ডুবে ওঠে। সত্যিই মন ভরে যায়।' লিখেছেন 'জিতির সবুজ প্রকৃতির ওপর বসে মজ্জা গিলিয়ে যে এখানে একদিনের জায়গার দু দিন কেটে গেল।'

একদিন, দু'দিনের কথা কী বলছেন? হিমালয়ের পাহাড়ি রাস্তায় যে-কোনও এক বীকে যদি গাড়ি কেনেও কাশতে একটু পাঁড়ায়, যে-কোনও ভ্রমণকারীর মনে হতে বাধ্য, আর অন্য কোথাও কখনো কী হবে, এইখানেই ওই পাথরটি ওপর বসে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিই না। তবে শুধিই প্রসন্নতা নয়। লোককে হিমালয়ের অন্য মুখও দেখেছেন, 'গা ছমছম করছে ভঙ্গসলের মধ্যে। একুনি এখান থেকে চলে যেতে মন চাইছে। আবার মনে হচ্ছে আর একটু থেকে যাই। হিমা কাটিয়ে আমরা মিনিট দশকে জলপ্রপাতের আওয়াজ শুনি। সেই সঙ্গে নালার কুলকুল ধ্বনি। দীর্ঘ নিশ্বাসে যেমন কোন মিশ্র রাগশাস্তীভের মন্থনায় আঁবির হই, একই ছন্দে একই লয়ে বয়ে চলেছে জলপ্রপাত। সবুজ সবুজ এই

মহা বনানীর যে মহাসমারোহ বাইরে থেকে এই Inner Seraj উপত্যকার জিজিগাসের ওপর পাড়িয়ে, কুলুর পর এখানে এসে অবিরামের করেছি, তাকে মনে মনে শান্তির দ্বিতীয় স্বর্গ বলতে বাধ্য হইনি। কিন্তু এই মুহূর্তে একটা অবরুদ্ধ আবেগদীর্ঘ মধ্যে গিয়ে অরসোয় রূপ প্রত্যক্ষ করে এখান থেকে বাইরের আলোয় ভাসা দাঁড়াবার বাসনা জেগে উঠেই যে কোনকমে বললাম, ঢালা বোঝান আর এক মুহূর্তে এখানে থাকব না।'

বেশ বিখানি। সুন্দর ছাপা, সুন্দর কাগজ, যকবকে ছবি, চমৎকার বীথি, হাতে নিতে ভাল লাগে। পড়তে ভাল লাগে। হিমালয়ের অপরিমেয় বিষয় তো আছেই, তার সঙ্গে মানুষ আছে তার নিজেকে অতিক্রম করে যাওয়ার, তার বাহরে আবেগদীর্ঘ যাকে ধরতে পারে না, তার দৃষ্টির সীমা যার শেষ বুঁজে পায় না, তাকে ধরবার, তাকে জানবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। এই বই পাঠককে হিমালয়ের দিকে আকর্ষণ করবে।

**পূর্ণিমা হিমালয়ের কোলে**— নীলরতন মুখোপাধ্যায়/রূপসী বাংলা, কলকাতা-৩/২০.০০।

## ‘ধ্রুবপুত্র’-র দেশ নিছক ভাবের বা স্বপ্নের নয়

কুমার রায়

আমরা কি আমাদের ধারণাগুলিকে একটা সমগ্র সমাজজিহাদসায় বা চিন্তার নকসাতে পরিণত করতে পারি? সকলে পারি না— কেউ কেউ পারে। আমরা মিত্র পেরেকেনা। ভূয়োদর্শন না থাকলে— আমার বিশ্বাস, কারও রচনা— তা সে উপন্যাসই হোক কিংবা কবিতাই হোক সময়ের কঠিনপাথরে তা যাচাই করা যায় না। কবি কথাকার কোনওটাই হওয়া যায় না। একসময় অস্পষ্ট সমাজচেতনা অনেকেই লেখায়েই পাওয়া যায় বটে— কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সে বেশির ভাগেও ভাবোচ্চারণের নামান্তর। শ্রেণি বিরোধের ফর্মুলা দিয়ে বৃথকতে চেয়েছেন সমাজজিহাদের অনেক— অথচ বেশির সমাজজী কী সোটা বোধহয় তাঁরা জানতেন না বা বুঝতেন না। অথচ সমাজচেতনাদাতা যদি বাস্তব অবস্থাতা অবজ্ঞা করে তবে প্রাগ্‌জীল সাহিত্যবস্তুটি— ধরতাই বুলির সমাপ্তি হয়ে ওঠে। শ্রীঅমর মিত্র গ্রামবালার অর্থাৎ ভারতের দরিদ্র মানুষের পরিচয় ঘনিয়ে হয়ে জানার সুযোগ পেয়েছেন— সোটা তাঁর অন্য কয়েকটি সেবার জগৎ অমায় পেয়েছি তাইবটে। সোটা আমাদের সময়ের চোজনাল গল্পই। কিন্তু ভারতীয় সভ্যতা ও চিন্তাধারার মূল ভূগর্ভস্থ বৃত্তকে কাহিনিকার যদি প্রাচীন ভারতের পটভূমিকেই বেছে নেন—

তাকে বর্তমানকে বৃথকত অসুবিধা হবে কেন? অমর মিত্র-র ‘ধ্রুবপুত্র’ উপন্যাসে সেই প্রাচীন ভারত এসেছে— সেই কালিদাসের সোটা। সেই সভ্যতার একটা ধারাবাহিকতা বুঁজে নিতে অসুবিধা হয় না এ উপন্যাস।

‘ধ্রুবপুত্র’ যখন থেকে শেষ অবধি পড়ে— শেষ পাতায় এসে একটা বিশ্বয় অপেক্ষা করছিল। চিরকাল তো জেনেছি কালিদাসের ‘মেঘদূত’ ফানট কাব্য। ‘অলংকারশাস্ত্র’ তা ‘খণ্ডকাব্য’ বা ‘মহাকাব্য’ যাঁহি হোক না কেন। কবি বাক্য হিসাবেই বিকসে আমরা জেনেছি, যিনি ‘বন্ধনবিহীন নবযমে পঙ্কপের করিয়া আসীন’— পাঠোচ্চ চেয়েছিলেন অক্ষরপাণ্ডর্য প্রেমের বার্তা। কল্পরাজ্যের অপরাধেয় কলাকুশলী কবি যে অনবদ্য লিপিতের একে রেখেছেন তাঁর এই কাব্যে তার সূচনা পঙ্কটিকিত শ্রীঅমর মিত্র ‘কাব্য’ না বলে বলেছেন ‘মন্ত্র’। কাব্যকে ‘মন্ত্র’ হিসাবে ব্যক্ত করেই তিনি কান্ত হানি— বলেছেন, ‘মন্ত্রপাঠ আরম্ভ হলো, ভিনদেশী না উজ্জয়িনীর— কে পড়ছে সেই মন্ত্র রাজ্য বৃথকত পড়িয়েছিলেন না। তাঁর মনে ছিলল অক্ষরকার অত্যা থেকে স্কটের উঠে আসেন। তাঁর মনে ছিলল অক্ষরকার অত্যা থেকে স্কটের নামে আসছিল। গাছের পাতারা পাঠ করছিল সেই আশ্চর্য মন্ত্র।’

কী সেই কাব্যের শ্লোক যা অমর মিত্রের উপন্যাসে হয়ে উঠেছে মন্ত্র। সেই তো পরিচিত কাব্যরত্নের শ্লোক—

‘কশিৎ কাব্য বিরহওকথা যথিকার প্রবৃত্ত:

শরণপান্তাংগমিত মহিমা বর্ষভাগেণ ভর্তুঃ

কেন অভিশপ্ত লগেছে পৃথিবীর মানুষের যে বৃষ্টির বিরহে ভূমি কখনো হয়ে গিয়েছে। রাজা এবং ভূমিপুত্রের দল উভয়েই যে শাপপ্রদ। গ্রাম এবং জনপদের মানুষেরে এর্থ হারানোর কেননা মূর্ত—এ উপন্যাসে। ‘ধ্রুবপুত্র’-র নির্মাণ প্রাচীন ভারতেরই পটভূমিতে— উপন্যাসে প্রাচীন ভারতেরই জীবন বর্ণিত। উজ্জয়িনী নগর, শিনান্দীর পটভূমি সময়ের ধূপছায়া হারিয়ে যাবনি বর্তমানের পটভূমি। তাই ‘ধ্রুবপুত্র’ অনাবৃষ্টির মধ্যে নতুন কল্পনা নিয়ে আসে— আবার রাজা ভর্তুহরির ক্ষেত্রে অনাবৃষ্টি স্থিতিবিষয়ের কারণ খটাচ্ছে, রাজার বিচারবোধ নষ্ট করে দিচ্ছে। ধ্রুবপুত্রের মুখে রাজা ওনচ্ছে— ফলহীন, জলহীন, আতঙ্কপাতুর মরুক্ষেত্রের কথা— সে মরা ভারই দেশ। সেখানেই তাম্রধ্বজ আর পঙ্কবতী আশ্রয় নিয়েছিল এক প্রাচীন বটের নীচে— নিয়ামের গন্ধবতী দেখতে পায়— অরুদ্রতী আর— দু’জন মিলিত হয়, বৃষ্টি হোক, ফলল হোক, নারী পুরুষের মিলন হোক, মানবশিশুর জন্ম হোক। এই প্রার্থনা তো মন্ত্রই। কিন্তু এ অনাবৃষ্টি যে সমস্ত নারীকে প্রেমিতভর্তুক করে তুলেছে— সমস্ত পুরুষকে কয়েছে নির্বাসিত। নির্বাসিত যুদ্ধক্ষেত্রে, বন্দিশালায়, জনশূন্য প্রান্তরে। কেনও এক কবি কেনও সুদূর অতীতে বৃথকতে পেরেছিলেন বৃষ্টির মেঘই পারে এই নির্বাসনালয়ের অবসান ঘটাবে। তাই ‘মেঘদূত’। তাই— আশ্রয়ের প্রথম দিনটিতে ‘উজ্জয়িনী প্রাসাদ-শিবির/কি না জানি ঘনঘটা বিদ্যুৎ উৎসব উপলব্ধ বনবলেণ ওরু ওরু রংগীর নির্বোধ এই মেঘ সঘর্ষে/জাগিয়ে তুলিয়াছিল সহস্রবর্ষের/অশ্রুতী কলপাল্প বিহেঙ্গ-ক্রন্দন/একদিনে।’ তাই অমর মিত্র তাঁর এই ধ্রুবপুত্র উপন্যাসে উজ্জয়িনীর কবির কাব্যের শ্লোককে বিধায়িনীভাবে বলেছেন মন্ত্র। উপন্যাসের সূত্র রাজ্যও যেন বৃথকত পারছে— তাই এই মন্ত্রের অপেক্ষায় ছিল প্রকৃতি, উজ্জয়িনী নগর— তাই বা কেন, এ অপেক্ষা তো মহাকাব্যের। বৃষ্টিতে ভেজমাটির গন্ধ নাকে আসছিল এরা এবং পাঠক হিসাবে আমাদেরও। কবি যেন বৃষ্টির মন্ত্র রচনা করলেন— সেই মন্ত্রই বৃষ্টি নামাতে পারে তুম্বাকত এই মাটির বুকে। আর এইখানেই এ উপন্যাস হয়ে উঠেছে দেশজ ভঙ্গিতে রাঁচত মাটির উপন্যাস। অবশ্যই সে উপন্যাস ঐতিহাসিক নয়— কিকবুটি থেকেই উপাদান সংগৃহীত করেছেন অমর মিত্র। এখানে রানি ভানুমতীর চরম উচ্চারণ কথা আছে। মন্ত্রী বিসময়ের সঙ্গে স্বভদ্রমত আছে— তাকে সন্তোষের পথে চেনে নিয়ে গিয়ে রাজা ভর্তুহরির দিগন্তোন্মত্তিও আছে। বৈশা বিশ্বাসযোগ্য এক কিকবুটির কাহিনি।

উপন্যাসে এসেছে একজন রমণীর কাহিনি— যার স্বামী নির্বোধ যুদ্ধে। কোনোকে নিয়ে, সে অপেক্ষা করে নির্বোধ স্বামীর জন্য। তার নাম রেবা আর তার কন্যা গন্ধবতী। রেবার ধারণা কেউ যেন নির্বাস দিয়েছে তার স্বামীকে— তাই সে ফিরিয়ে না। সেই নারী মেঘদূতের কল্পনা করে যে তার স্বামীর বার্তা বহন করে নিয়ে আসবে। তার সে উদ্দি, দশমি করে মেঘের জলনো বসন্ত আঁখি।

আর ধ্রুবপুত্র যেন এ উপন্যাসের ধ্রুবপত্র। উপন্যাসে সারাক্ষণই ধ্রুবপত্রের উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। কেউ না কেউ তার কথা বলছে— ভাবিয়ে— প্রতীকীভাবে তের জন্ম। উপন্যাসের মাঝামাঝি সময়ে এক ভবদূতের চরিত্র আসে যে ভক্তির মন্ত্র রচনার কাজ করছে। সেই তো উপন্যাসে বৃষ্টির পক্ষে, সূত্রির পক্ষে দাঁড়িয়েছে। সেই তো কবি ‘অনাবৃষ্টির দিনে বৃষ্টির মন্ত্র রচনার চেষ্টাটুকু করতে পারে।’ রাজার কাছে সে যেন ভিনদেশি— রাজার চোখ বুজে গিয়ে এসেছে। সেই তো বলে, নিয়ামের আসছে তাদের রাজ্যকে দিল্লির দেশ দেখাতে, নিতে আসছে— তারা মেঘ, মুক্তিকা, অক্যা, নীলী, মানুষের দুঃখ, মানুষের সুখ, বেঁচে থাকা, শ্রেম, প্রেমহীনতা, সম্ভ্রতা, ব্যর্থতা সব চেনোতে। ভিনদেশি বলে, রাজা যদি সজাগ থাকত তবে অনাবৃষ্টির ভয় এমন ভয়ানকভাবে ছেয়ে ফেলত না, দশমি দিত। শূরপতীর মানুষগুলি জলের সন্ধানে ঘুরছে। এসে যাচ্ছে দেশে এক ভাঙর অজমার দিন, মানুষের জন্মও হবে না, মানুষ ভুলে যাবে মানুষকে জন্ম দিত। ধ্রুবপুত্র তাই তো বলে— ‘আমি তখন মানুষের জন্মের কথা ভাবতে লাগলাম, মনে পড়ে যেতে লাগল সেদিনকের মহাপবনের কথা, তপস্বী উমার কথা, তাঁদের মিলনের স্মৃতিগুলির কথা, কান্তিকের জয়কথা।’ অমর মিত্র আলোর কালিদাসের ধার— কুমারসম্বৎসর কাব্য। আলোয় গন্ধকাব্য এ কাহিনি শেষ করলেন আর এক চিরসন্তোর উদ্দেশ্যে— বৃষ্টিতে ভেজমাটির গন্ধ নাকে আসছিল— যখন নদীতীরে আমাদের নীচে পঙ্কবতী তাম্রধ্বজের শরীর গ্রহণ করেছিল। তখন আকাশে পঙ্কবি, অরুদ্রতী অশ্রু নায়ে গেছে— আকাশের সব তারা রাঁচত হয়ে ছেয়ে যাচ্ছে মেঘে। তাম্রধ্বজ কিসফিস করে বলে, ‘মেঘ এল গন্ধবতী, বৃষ্টি আসছে, কী আশ্চর্য, বৃষ্টি তা হলো এ।’ ওরা দু’জন তখন যেন হয়ে ওঠে অনন্তকালের প্রকৃতি। রমীন্দ্রনাথ তো একেই বলেছেন, ‘আকাশ-পৃথিবীর বিবাহমন্ত্রওজন— যার মধ্যে কবি শুনেছিলেন— নববর্ষা নামক আমাদের চিরবিহঙ্গের পুরে।’ ভিনিহি তে লিখেছেন, ‘আবার বন্ধ আজ শ্যাম হোক তোমার এই শ্যামল ফর্মটর মতো’।

শ্যামাল পৃথিবীর আকাশজলে যে অপারম সাধারণ মানুষের।

সে তো কেল প্রাচীন উজ্জয়িনীতে— তার— আভ্যন্তর ভারতের সাধারণ মানুষের। উপন্যাসিক তাঁর জানা আজকের চেনা



ভূতাকেও যেন অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন তাঁর এই আখ্যানে। আর নরনারীর মিলনকেও আশ্চর্য দক্ষতায় পুরিস্কৃত করার ব্যাপারে শ্রীমন্ত ব্রজ নিয়েছেন আখ্যানভাগে। বারোপরেই মেলাতে চেয়েছেন সেই মিলনকে জন্মির উর্বরতার সঙ্গে। বারবনিতা সময়ে সস্তান নেই—সে মিলন নিখুঁত। লোককথা বিস্তারিত হয়েছে মেঘ-নির্ভর ভারতবর্ষের হৃদয়ের কথায়। যা আজও সত্য। লেখক অবলম্বন করেছেন এক কিংবদন্তিকে কিন্তু তাকে প্রসারিত করেছেন আশ্চর্য দক্ষতায়, প্রাচীন ভারতের আদি না থেকে আরম্ভের অন্তল। এসেছে দেবদাসী, বারবনিতা, রাজা, রাজরানি এবং সেই সঙ্গে অবশেষে সামান্য গৃহপুত্র, গ্রামবালিকা, শূদ্র-শূদ্রাণী, নিম্না। প্রাচীনের ছায়াপাত ঘটেছে আজকের সমাজ-বিন্যাসে। দরিদ্র মানুষের আকাঙ্ক্ষা যে একই আছে। অবশেষে একটা সময়ের চিহ্ন বহন করে আছে এ কাহিনি। চরিত্র, জনপদ, ভূগোলের চরণচিহ্ন ধরে ধরে আধুনিক কালও ধীরে ধীরে উপন্যাসের ব্যবহারে উঠে আসে। ভাষার ব্যবহারও সেই প্রাচীনকালের ধরিয়ে দিয়েও আজকের কষ্টস্বরও শোনা যায়। সে ক্ষেত্রে যত্ন কোথাও কোথাও সাধু ও চলতি ভাষার সমন্বিত গৃহ ঘটেছে। কবিতার মতো হয়ে উঠেছে কোথাও। খুব কি ধাপা পেয়ে পড়তে পড়তে? মনে হয় না।

পড়তে পড়তে এসব কথারও যেমন মনে হয়েছে— তেমনই এও মনে হয়েছে যে আমাদের জীবনের 'ধ্রুব' যেমন মাঝে মাঝেই হারিয়ে যায়— এ কাহিনিতে ধ্রুবপুত্র নির্বাসিত। সেই নির্বাসনে সব কিছই যেন অন্ধকার হয়ে যায়। আবার তার আশ্রয় প্রত্যাবর্তনে জলভর্তি মেঘের আনাগোনা। সেই সৈনিকের প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় যে নারী রেবা— যার কন্যা গন্ধবতী সেও তাই ভাব পেয়েছিল ধ্রুবপুত্রকে। সেও তেই ধরেই নিয়েছিল ধ্রুবপুত্র আর ফিরবে না। তার জীবনে কি তাৎক্ষণিকই ফিরে এসেছিল ধ্রুবপুত্র হিসাবে। সে তো ভেবেছিল তার প্রেম নষ্ট হয়ে গেছে। সে এমন ভালবাসতে তাৎক্ষণিক। সেই রেবা মা অপেক্ষা করে থাকবে এই দন্ধনগরীতে স্বামী প্রত্যাবর্তন-আশায়। রামগিরি থাকতে তার স্বামী নির্বাসিত। আর জলভরা আকাশের মেঘের দিকে তাকিয়ে তার মনে হয় দশান, কেবলটি পরা হয়ে উজ্জয়িনীর দিকে সেই মেঘ চলেছে স্বামীর কাছে। ব্যাপারটা উলটে দিয়েছেন অমর মিত্র। অন্য দিকে এ কাহিনিতে রাজসেনাপতির লব মতো দেশের দরিদ্র মানুষের সোনার কলস এনে দিতে পারে না— যে কলস পাতালসমূহে অক্ষুণ্ণ জল নিয়ে ভেঙে যায়। দরিদ্র জনতার বিশ্বাস যে ওই সোনার কলস আনতে পারলে অন্যাবৃত্তির কাল শেষ হবে। উজ্জয়িনী, অবন্তী শিশু নদীর জলে ভেসে যাবে। সেই জলভরা মেঘ প্রোথিততরুকা বিরহিণীর কাছে তার স্বামীর খবর নিয়ে আসবে।

নাটকের পর নাটক তৈরি করেছেন অমর মিত্র এই উপন্যাসে।

বর্তমান আলোচ্য— এ উপন্যাসে নাটক বুজছে— পেয়েওচ্ছে। অন্তত দুটি নাটকের বীজ আছে এই উপন্যাসে।

মেঘ-বৃষ্টির সঙ্গে অনুর্বর মাটি, দয়িতর সঙ্গে দয়িতার মিলনালাপ, কিংবা কুমারীকম্মার ফলবতী নারী হয়ে ওঠা পুরুষসঙ্গে— এ সব কাহিনি সেই রামায়ণ, মহাভারতের কাল থেকে আমাদের কাল পর্যন্ত উপমা, উপমানের মধ্যে বার বার এসেছে। অমর মিত্রও তাঁর এ উপন্যাসে কাহিনী দিয়ে। এর আগে বাংলা উপন্যাসের কাহিনিতে অনেকেই কাহিনীসেবকে এনেছেন— সে সব অহরহ সুখপাঠ্য-সীমানায় আটকে থেকেছে। নিমিটি মিলে সে সব গল্প কাহিনী বলা হয় রোমাঞ্চিক। কিন্তু আলোচ্য উপন্যাসে শ্রীমন্ত তখনকার সময়ের মাটির গন্ধ, শ্বাস, সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, নিরাশা, যুক্তা, অভাব-অভিযোগ, ওপেক্ষা সময়ের সব কিছুকে বুনে দিয়েও আজকের সময়কেও উপেক্ষা না করে যথাযথ ধ্রুপদী সাহিত্যে উজ্জীবিত করে নিয়েছেন তাঁর কাজকে।

চান্দায়েভেরইনীয়, একমুখী রোমাঞ্চিক প্রেমের উপাখ্যান নির্মিত পুত্র যে অন্যীয়া সৌত্র প্রেমাবির স্পষ্ট করে দিয়েছেন। কালের হান্দপন্দন ধরা পড়ছে এই উপন্যাসে। সেই 'পন্দন' এবং হান্দপের তাপ আজকের পাঠকের কাছে ধরা পড়বেই বলে আশা করি। অনুভব মনে হবে— এ যে এক মহাকাব্যের উপাখ্যান। নানা চরিত্র, ঘটনা, যৌনতা, ভালবাসা, বিশ্বাস-অবিশ্বাস-বিশ্বাসঘাতকতা, স্বভাব, এ সবই ব্যক্তি হয়েছে যে যে খোঁজটা চলিত গেলেন। সেই খোঁজার উৎসটা হাত সে-ই প্রাচীন কালেকও অন্তর্নিহিত ছিল— কিন্তু আমাদের কালেক কাহিনির তারকে আচ্ছন্ন নিপুণতায়— সেসব কিপুর সঙ্গীতায় ঘটিয়েছেন। মানবিক এবং আকৃতিক উপাখ্যান একই করে আমাদের দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন এক অন্য অভিজ্ঞতার।

যখন এই আলোচ্য 'ধ্রুবপুত্র' উপন্যাস-পাঠের প্রতিক্রিয়া জ্বলতে কাগজকলম নিয়ে বসেছে, তখন সংবাদপত্রের এবং দুর্দশপত্রের পদ্য পর্যায়ক্রমে— নারী-নিগ্রহের বিরুদ্ধে অবন, মেয়েদের সারকর্ম বিষয়ক আলোচনা। গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের কর্মসংস্থানের বিলটি পাশ করা হল আমাদের সংবিধান রক্ষকদের সত্য লোকসভায়— তখন এ উপন্যাস ওলি অন্য একমাত্রা পেয়ে যায় বা তাৎপর্যও কেন না উপন্যাসে দেখছি— সেই সুদূরকালেও, এই ভারতে শিশুনারী-স্ত্রীর উজ্জয়িনী কিংবা বিন্দিয়ার সামাজিক অবস্থাটা খুব একটা ছিল না। শূদ্র ও নারী দুই-ই সে সমাজে নির্বাক, সমাজেরই অনুপাসনে। পুরুষ সে সমাজে কোনও কালেই অস্বচ্ছ হয় না— তাদেরই ত্রোপের একধর অধিকার। অন্তত্ব হয় একমাত্র মেয়েদান। কিংবা যুবতী নারী। আর শূদ্রের ওপর বলপ্রয়োগ সে সমাজে গ্রায। নারী ও শূদ্রের ইচ্ছা-অনিচ্ছার দায় নেই। এসব সামাজিক অবস্থার কথা

নিপুণভাবে এবং দরদ দিয়ে বলেছেন কাহিনিকার এ উপন্যাসে। লোকসভায় আলোচনা এবং সাম্প্রতিক আইন কিন্তু 'স্পর্হই ইন্দি'ত দিচ্ছে যে এদেশে আন্ডার আমলের আজকের সমাজেও অব্যাহত আছে। এই সব বিধি-বিধানেরে বসব প্রাচীন কাহিনির এই উপন্যাসেও আছে ছলে ছলে পাওয়া যাবে— গ্রাণ ও নারীর মেয়েদের অবস্থানের ভিন্নতর আভাসও। তখনও রাজরানি, পতিতা দেবদাসী-সামান্য গৃহপুত্র, গ্রামবালিকা, শূদ্রনারী এবং নিরাশদের সমাজে যখন মর্যাদা নির্ধারিত হত বিবেচ্যে তারসঙ্গে। এইসব গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক চিহ্ন দিয়ে 'ধ্রুবপুত্র' উপন্যাসের আকাশ খচিত হয়েছে। এই উপন্যাস অতীতকালের ছুঁয়ে আছে নিশ্চিতভাবেই— কিন্তু সেই ছুঁয়ে থাকাটা কেবলই 'স্পর্শমাত্র' নয়— প্রসারিত হয়ে এসেছে সেই 'স্পর্শ' আজকের সময়ের স্তরে— কিংবা বলা যায় হাত বা ভবিষ্যতের বুকেও। তাই বিবেচনা করা যেতে পারে এ উপন্যাস চিরকালের উপন্যাস। প্রবৃত্তান্তিকের মতো অতীত বনন করতে করতে খোঁজ পেয়েছেন যে সমাজের, যে সময়ের, যে মানবের তার সামনে দাঁড়িয়েই দেখে নিজেদের কপালী তাঁর নিগ্রহের সময়কে, মানুসকে এবং সমাজকেও। মিল-গরমিলের চিহ্নও বুজ নিতে চেয়েছেন— এবং তাঁর সেই খোঁজের খল উপহার দিয়েছেন আমাদের। আর তখনই এ উপন্যাস চিহ্নিত হয়ে যায় মহাকাব্যিক গঠনে। মহাকাব্যের মতোই অজস্র চরিত্র, অসংখ্য ঘটনাবলী বুনোটা। মাঝে মাঝে যেন যেই হারিয়ে যায়— স্বর্গিকের অমনোযোগী পাঠ। দেখতে হয় পাঠা উলটে ফেলে আসা অংশে। এ-ভারতভূমিতে বুজ পেতে লাগা যায়— অশ্রম সত্যে নববস্ত্রের বিভিন্ন কীরকমাত্রার কাহিনি। চিরকালের ভারতবর্ষ। এ কেবল মেঘমুড়ের ছায়া নয়। বৃষ্টি-বিন্দী এক তীর সঙ্কটময় অবস্থার কনি আছে— আছে অহিরতা ক্রান্তি, ধনসে। সেই নিদারপতির বর্ননা— যেখানে বিরাট প্রকরবস্ত্রের ওপর চোখ আঁকা-নিদুর লেপা। সেই আরম্ভ মানুসগুলি জগতকে কদে বলে ওঠে— 'তুমি কি আকাশের জলের খোঁজ জান?' আকাশ মেঘ এনে বৃষ্টি নামাবে মাটিতে— এমন কালইবে তারা বুজবে যে। ভারতবর্ষের আবহমানকালের দরিদ্র মানুষের আকৃতি এবং অপেক্ষা। তাদের কার, 'বৃষ্টি' হয়ে উঠতে পারে জলের সত্ত্ব।' লোভা সেই ধ্রুবপুত্র। সমগ্র কাহিনিতে যে হয়ে উঠেছে একটা মিল। সে যে আছে, সে যে ছিল। বর্তমানে সে অনুপস্থিত। তার অনুপস্থিতিই যেন এই দুর্বস্থার হেতু। সবাই এই ধ্রুবপুত্রকে বুজছে। মেঘ যে সৃষ্টি ও উর্বরতার প্রতীক। তবুটি ভিন্ন মতকের কার্ড মনে পড়ে এই উপন্যাস পড়তে পড়তে। টি এস এলিগটরে 'মার্ভার ইন দি ক্যাথিড্রাল', ব্রুসেলসে 'তপস্বী ও তারঙ্গিনী' এবং গিরিশ কারনভের একটি সাম্প্রতিক নাটক। ক্যান্টোরাবেরির মেয়েদের কষ্টে সেই কোরাসের পঙ্খুটি— 'We wait, we wait/And the saints and martyrs wait for

those who shall be martyrs and saints.' তপস্বী ও তারঙ্গিনী শুধু হোসে গোঁয়ের মেয়েদের কৈরাসে— 'অদ রাজা' বলে করেছি কোন পাপ। এ কোন অভিশাপ লাগলো! জননী বসুমতী ভুলো না আমরাও তোমারই গর্ভের পরিণাম। হে দেব, এ দেশে মহান। মেঘনাদ। এবার দয়া করে বৃষ্টি দাও বৃষ্টি দাও।' অদসেমে প্রণও বরা। এই বরায় দূর হয়েছে পৃথিবীর উর্বরতা, সেই সঙ্গে নারী হয়েছে জলা। কন্যাসুদের সঙ্গে যেদিন রাজকুমারী শান্তার বিবাহ হল, সেদিন দিনাকারি বরায় অবনস ঘটেছিল। পৃথিবী, নারী উভয়েই হল উর্বরা। উর্বরতা আনবার জন্যই তো আকুর্ প্রার্থনা। গিরিশের নাটকটিতে সেই ভয়ানক অনুবৃষ্টি বরা। আর বিদেশে সেই নাটক যার নাম 'রোইন মোকার'। সেখানেও সেই একজন যে বৃষ্টি আনতে পারে। এ কাহিনিতে ধ্রুবপুত্রের ভূমিকাও প্রায় তাই। রাজা ভর্তৃহর, রানি-ভানুমতি, চতুর্বিধা, উত্তবনরায়ণ, শ্রেষ্ঠী, সুদভ, দহ, গণিকা সেবেত্রা, গন্ধবতী— এসব চেনা চিরকালের চরিত্র। এরা অনেক সময়ই এ উপন্যাসে যেন বাঙালির চেনা মনে নিতে গড়ে উঠেছে। সৌ কি দুর্লভা চরিত্রচিত্রণের— নাকি সেটা প্রেমের ছোঁয়া? এ কাহিনিতে পুরোহিতরা যেন আজকের রাজনীতি-পু বণিক বা রাজা চালকদের আড়ালের শক্তি। শ্রেষ্ঠী সত্য এবং প্রাণ পুরোহিতের চক্রান্ত কিংবদন্তি হলও পুত্র প্রত্যক বুজ প্রবৃত্ত কিংবদন্তি। এখানে রাজা ভর্তৃহর শূন্যাস কন্য, বলা যায় বেগমগিরী, রানি ভানুমতী চরম উচ্চকারণ। সে মন্ত্রী বিক্রমাদিত্যকে সন্তোষের পথে টেনে নিয়ে এসে ভর্তৃহরকে সিংহাসনচ্যুত করে। ছকটা চেনা কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য। অন্যবৃত্তির পর বৃষ্টি— তুমি ভূমিকে উর্বা করে। ভারতীয় সবুজটিতে তার সমস্ত দ্বিগত হয়েছে বন-নারী মিলিয়েও। ফসল উপদানই আসল লক্ষ্য। কিন্তু এ সেই রাজ্যের উপাখ্যান যেখানে সিংহাসন খণ্ডেও লক্ষ্যবস্ত্র। উদ্দেশ্যে সিদ্ধিতে যে কোনও পথে এখানে অনুসরণ করা যায় বিশ্বাসযোগ্য। কিছু একটা যায় না পথ-নির্বাচনে। এখানে 'দিনমানে নগরের রাজপুত্র শূণ্য হেট যাক, শূদ্র নমে আসক। কুটপোত যাক, যুগ্মহেরী কী' কথা অপেক্ষা করুক মৃত্যুর, রাজকুমারী উৎকল্য গ্রন্থক-কান্ডি ব্যক্তি উপর অভ্যুত্থার করক, আওনে পড়ে যাক শূদ্রপদী— এইসব ঝগড়িত করবে রাজা ভর্তৃহরর রাজাকালের সমাধি। এ যেন এক মূলপত্র।

অমর মিত্র এ উপন্যাসে এক জারগায় লিখেছেন, 'কবি বলছেন, সৃষ্টির রহস্যটাই জানে না মানুষ, যে সৃষ্টি করে সেও জানে না, গড়কল টাই শ্রোক চরনা কবিতা।' আজ এও কবি নয়, পারিষদ। এ কবি গিরিশ কারনভের একটি সাম্প্রতিক নাটক। ক্যান্টোরাবেরির মেয়েদের কষ্টে সেই কোরাসের পঙ্খুটি— 'We wait, we wait/And the saints and martyrs wait for



‘এর চেয়ে বড় সূজনকর আর নেই, শতশ্রেয় শ্লোক রচনা করেছে ওই সন্তানের কাছে আমি পৌঁছতে পারব না।’—ভানুমতি জিজ্ঞাসা করলেন—“জান আগে না সৃষ্টি আগে?” কবি এবং রাজা তর্কহরি ও রানি ভানুমতির কথোপকথন কখনও কখনও এমনই দার্শনিক হয়ে ওঠে। যেমন রাজা বললেন, ‘এই প্রশ্নাত্মক, আকাশ, মহাবিশ্ব সবই সত্য, অসত্য কোথায় তা জানি না।’

এবারে এর চিত্রাচলন সমাপ্তি ঘটবে—কেননা এখানে মনে হচ্ছে আমি কি ‘ধ্রুবপুত্র’-র সাহিত্য-বিচার নিম্নে ব্যক্তিগত আখ্যানের ওপর ভর করে করতে পারি। রীতিপদ্ধতির সূত্র কি জানা আছে আমার। কেবল আখ্যানের ওপর ভর করে কি

সাহিত্য নিয়ে কথা বলার অধিকার জন্মায়। জানি না। তবে এটা বুঝি, হৃদয় ব্যক্তিমাণীয় আলোচনার দ্বার খোলা গেল না। কিন্তু একটা শব্দ আবেগ দিয়ে পাঠ-প্রতিক্রিয়া তো জানানো যায়। অমর মিত্র রচিত ‘ধ্রুবপুত্র’ আমাকে আলাড়িত করেছে। এর নাট্য-সম্ভাষনা আমাকে উদ্দীপিত করেছে। কল্পনাপ্রবণ এই লেখক বাস্তবকে, বাস্তবতার মধ্যেও যে ইচ্ছাজাল আছে, তাকে সামনে এনে দিয়েছেন। ধ্রুবপুত্রের হঠাৎ হঠাৎ উপাধি হয়ে যাওয়া এবং তার প্রত্যাহ্বান তৈরি আলৌকিক নয়। আমাদেবই আকাঙ্ক্ষা। আমাদেবই মন্ত্রণাট।

ধ্রুবপুত্র—অমর মিত্র/কল্পনা প্রকাশনী, কলকাতা-৯/২০০.০০

## নিবিড় পাঠের মধ্যেই পুনঃপাঠের দরজা খোলা

তাপসী বন্দ্যোপাধ্যায়

বহুকাল আগে কাব্যসমালোচক রাজশেখর তাঁর ‘হকারীমাসো’ বইতে লিখেছিলেন, সাহিত্য কেবল শব্দ ও অর্থের সহজবোধ্য নিয়ে আলোচনা করে (‘শব্দার্থরোচ্যাব্যবহ সাহচর্যে সাহিত্যবিদ্যা’)। দেখা যাচ্ছে, আধুনিক এমনকী উত্তর-আধুনিক সাহিত্যসমালোচকেরা রাজশেখরের ভাবনা থেকে মুগ্ধ বেশি দূরে গিয়েছেন। তবে অবশ্যই তাঁদের চিন্তার প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা রয়েছে। যেমন আজকের সাহিত্যবিচারকেরা দেখ এবং ভাষা নির্বিশেষে যখন উপন্যাস কিংবা কথাসাহিত্যের সমালোচনা মনোযোগী হন, তখন সমালোচক রচনার কাব্যবস্তুর থেকে Narration বা আখ্যানসমূহের কৌশলের অনুসন্ধান করে বেশি উৎসাহী হয়ে ওঠেন। যেহেতু এখন সমালোচকেরা লেখক-নির্ভর একমুখী ভাষার উপস্থাপনার ওপর আত্মশঙ্কী নন তাই সেই সমালোচকের হাত ধরে এগোনের পাঠকও text-এর চিত্রাচলিত রূপটি ভেদ করে অবশ্যই আর একটি অস্তরকে দেখতে সক্ষম হন। লেখক যে ইচ্ছাক্রমে তাঁর ব্যবহৃত শব্দ বা বাক্যগুলি গড়ে তোলেন, আজ তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে পাঠক বা সমালোচক সেই প্রয়োগের মধ্যে কী ইনটেনশন খুঁজে পাচ্ছেন। এভাবেই এখন প্রত্যেকটি text-এর মধ্যে একটা নতুন পাঠের সম্ভাব্যতা দেখতে পাওয়া যায়।

ড. কর্ণালী ঘোষ (গাদুলি) তাঁর ‘উপন্যাসের গঠনবিধান: নরেন্দ্রনাথ মিত্রের উপন্যাস’ বইটির মধ্যে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের দশটি প্রতিনিধিত্বময় উপন্যাসের বহিরাঙ্গিক গঠনকৌশলের বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে textগুলির প্রাপ্তির সীমা থেকে পাঠকের প্রত্যাশাকে আরও বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করেছেন। ড. ঘোষের

এই বইটি একটি গবেষণা অভিসন্দর্ভ। প্রথম অধ্যায় ‘উপন্যাস প্রকাশ সম্পর্কিত তথ্য’-তে লেখক তাঁর গবেষণাপ্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পাঠককে অবহিত করেছেন। প্রথমেই তাঁর স্বীকারোক্তি হল, তাঁর গবেষণা অভিসন্দর্ভটিতে শৈলীবিজ্ঞানের ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণকে গ্রহণ করে শৈলীগত ব্যাকবর্ণ নির্মাণের চেষ্টা করা হয়নি। তিনি মূলত নরেন্দ্রনাথের সমালোচনা দশটি উপন্যাসের বাহ্যিক গঠনগত তাল্পের অর্থাৎ অধ্যায় বিভাজন, কাহিনীর গতিমুহূর্ত, সময়েতেভনা, চরিত্রসংস্থাপন নন প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি এবং বর্ণনা অংশের নটকীয়তা, সলাপ ও চিত্রকল্প নির্মাণের ভাষাগত বিশেষণ আলোচনাতেই নিবিষ্ট থেকেছেন। যেহেতু তিনি শৈলীবিজ্ঞানের ধারণা বিশ্লেষণের আশ্রয় গ্রহণ করেননি তাই তাঁর পুণীত পদ্ধতির সঙ্গে শৈলীগতের পার্থক্য কতখানি—এই অধ্যায়ে সে সম্বন্ধেও আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু সেই আলোচনা শৈলীবিজ্ঞানের ধারণা তত্ত্বগুলি অনেকখানি জায়গা নিয়েছে যা সাধারণ পাঠকের কাছে অবশ্যই অর্থহীন। কিন্তু একই সঙ্গে সাধারণ পাঠকের এ জাতীয় তত্ত্বালোচনা থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকার সম্ভাবনায় রয়েছে। অন্য দিকে তাত্ত্বিক পাঠকের কাছে এই অংশটি অতিরিক্ত কখন মনে হবে পারে। তবে অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কাছে প্রথম অধ্যায়ে বিবৃত নরেন্দ্রনাথের সর্বকটি উপন্যাসের প্রাথমিক সম্পর্কিত পরিচিতি অবশ্যই কার্যকরী। প্রসঙ্গত, প্রদত্ত পৃষ্ঠা একটি তথ্য সম্পর্কে একজন সাধারণ পাঠক হিসাবেই আমার কিছুটা বিভ্রান্তিকর কৌতূহলকে মধ্য দিয়েছে। যেমন, ‘দেহময়’ উপন্যাসটি কী আলোকে ‘রবি রবি’ নামাশয় ছোট গল্পটির বৃহত্তর পরিমার্জনা? একটি

ভিন্ন তথ্যসমূহে দেখছি ‘গোমূলি’ উপন্যাসটিরও প্রথমে ১৩৫২-এ ‘সমুদ্রী’ পত্রিকায় ‘গোমূলিলগ্ন’ নামে গল্পাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। ‘মহানগর’ কেবল ‘অবতরণিকা’ গল্পেরই উপন্যাস রূপ? নাকি ‘মহানগর’-এর মধ্যে মিশে রয়েছে ‘আকিঞ্চন’ গল্পের তুলনামূলক বর্ণনা চক্রবর্তীর চরিত্রটি? আরতির শব্দরশ্মাই মিশ্রোপালাদের ওপর বিশিষ্ট চক্রবর্তী আনন্দিক্যের আয়োগ্যিতি? কি বসন্ত নরেন্দ্রনাথ মিত্রের পুত্র অভিজিৎ মিত্র কর্তৃক তাত্ত্বিকবিদ্যায়ের বাংলা বিভাগে একটি আমন্ত্রিত বক্তৃতায় এই তথ্যগুলি জানিয়েছিলেন।

ড. ঘোষ যে দশটি উপন্যাসকে গঠনকৌশল বিচারের জন্য নির্বাচন করেছেন, সেগুলি হল—‘চেনামহল’, ‘তিনিদিন তিনিরা’, ‘দেহময়’, ‘দূরভাষিণী’, ‘সন্দিগ্ধ’, ‘অনুগামিণী’, ‘সহায়তা’, ‘গোমূলি’, ‘সেতুবন্ধন’ এবং ‘মহানগর’। গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে উপন্যাসগুলির আয়তন বা অধ্যায় অনুচ্ছেদ বিভাজনের সঙ্গে কাব্যবস্তুর সম্পর্ক নির্ধারণ করা হয়েছে। যা মূলত আখ্যানগুলির গতিমুহূর্তকে তুলে ধরে। তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচ্য উপন্যাসগুলির সময়ভেদনা। সময়ভেদনা বলতে এখানে চিত্রারতির কাহিনীবৃত্ত নির্মাণ সময়ের এক্ষরপাক্ষর কৃৎজীকরণকে দেখানো হয়নি বরং প্রতিটি উপন্যাসে কীভাবে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের মধ্যে কাহিনীর পরস্পরা ধরা পড়েছে তা নির্ধারিত হয়েছে। কালগত বিভিন্নতা কীভাবে আখ্যানগুলিকে সমৃদ্ধ করেছে। তা সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণে তুলে ধরা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে চরিত্র সংশ্লিষ্টকরণ বৈশিষ্ট্য আলোচিত। আলোচ্য দশটি উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে বাস্তববাহী, জটিল এবং রোমাণ্টিক—

এই তিন শ্রেণিতে ভাগ করেছেন ড. ঘোষ। কিন্তু কীসের ভিত্তিতে এই বিভাজন তা স্পষ্ট হয়নি। এই অধ্যায়ে শিরোনাম যদিও ‘উপন্যাসে চরিত্র সংস্থাপন’ কিন্তু কেনা আদিকম কিংবা পদ্ধতিতে চরিত্রগুলি উপন্যাসে গ্রহিত হয়েছে, তা অধ্যায়টিতে আলোচিত হয়নি বরং প্রতিটি উপন্যাসে বিধৃত আখ্যানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত হয়েছে। সে ক্ষেত্রে উপলব্ধত সিদ্ধান্ত হল, নরেন্দ্রনাথের অধিকাংশ উপন্যাসই মধ্যবর্তী জীবনের চলচ্ছবি এবং আলোচিত দশটি রচনার মধ্যে নাট্যি বিশ্লেষণ প্রেমের আখ্যান।

গ্রন্থের পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম অধ্যায়গুলিতে যথাক্রমে বর্ণিত অংশের নটকীয়তা, সংলাপের প্রয়োগগত বৈশিষ্ট্য ও ‘প্রতিমা’ বা ইমেজ নির্মাণে অন্তর মুগ্ধিয়ারার স্বপ্নান, যদিও গ্রন্থকার নটকীয়তার বিচার যখন করেন তখন চরিত্রের আচরণ বিশেষত সলাপের দৃষ্টান্তই তুলে ধরেন। স্বভাবতই ষষ্ঠ অধ্যায়ে সলাপের প্রায়োগিক বৈশিষ্ট্যের আলোচনায় তার পুনরাবৃত্তি

গবেষণার সংঘেতিকে যেন বিস্তৃত করে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে সংলাপের প্রয়োগগত বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ চিত্রারচিত্র ভাষা-সংলাপের আলোচনা থেকে অবশ্যই ভিন্ন স্বভাবশালী। প্রচলিত ডিকশনারে কিতাব এখানে করা হয়নি বরং উপন্যাসে বিভিন্ন ভাববহনকারী শব্দগুলি চরিত্রের কোন মনোভঙ্গির প্রতিফলন তাকেই সমালোচক প্রতিটি উপন্যাসের উদাহরণযোগ্যে উপস্থাপিত করেছেন। কণ্ঠস্বর, হাসির ভঙ্গি, চোখের চাহনি ইত্যাদি দৈর্ঘিকভঙ্গিগুলিরও কীভাবে কখনশৈলীর সহায়ক হয়েছে তা পৃথানুপৃথভাবে উদ্ধৃত।

তাত্ত্বিক এবং রসিক দু’ধরনের পাঠকবৃন্দে কাছেই এই অভিসন্দর্ভটির সবথেকে উপভোগ্য অংশটি হল সপ্তম অধ্যায়ের ইমেজ বা প্রতিমার আলোচনা। লেখক রবিন স্কেলটনের ‘দি প্যোটিক প্যাটার্ন’ গ্রন্থের ইমেজের শ্রেণিভিত্তিক বিভাজন অনুযায়ী নরেন্দ্রনাথের দশটি উপন্যাসের প্রধান প্রধান চিত্রকল্পগুলিকে বিন্যস্ত ও বিশ্লেষণ করেছেন। তবে নিরুত্তর চিত্রকল্প অপেক্ষা ইন্ড্রিয়গ্রাহ্য প্রতিমার আলোচনাই বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। দৃশ্য প্রতিমার প্রভৃতি অনুভূতিভিত্তিক ছবগুলি এই অধ্যায়ে য় সরসতা অর্জন করেছে তা গবেষণাগ্রন্থের তাত্ত্বিক কাঠিন্যকে সহজেই পেরিয়ে যেতে পেরেছে।

গ্রন্থারম্ভেই লেখক যিনিও জানিয়ে দিয়েছেন নরেন্দ্রনাথের দশটি উপন্যাসের গঠনকৌশলের বিশ্লেষণ কঠোর ঠাঁর একমাত্র অভিশ্রয়, ভাষাতাত্ত্বিক শৈলী আলোচনা সেখানে সম্পূর্ণ বর্জিত তবু একথা বলছি বাস্তব যে, যে-কোনও উপন্যাসই শেষোক্ত উচ্চারণ সমবায়। সেখানে আখ্যানের সমস্ত বৈচিত্র্যই ধরা পড়ে কবনের উচ্চাকৃত্য। অন্তঃ ও যখন নির্মাণ প্রক্রিয়ায় তখন গল্পের প্রণালীর বিবরণসমূহ ও লিখনশৈলী নিয়ে সমস্তাংশেই ভাবিত থাকেন। ভাষাতত্ত্বের সঙ্গে শৈলীগতের নিবিড়তাকে যেমন অস্বীকার করা যায় না তেমনই একেবারে সত্যি যে ভাষার তাত্ত্বিক কাঠামোর মধ্যেই রচনার শৈলীর সীমাবদ্ধতা নয়। দু’এর মধ্যে একটি নান্দনিক অম্বয় করে বিশেষের দু’জন তাত্ত্বিক Rene wellek এবং Austin Warren উক্তির ‘Theory of Literature’ বইটিতে একটি বিকল্পীয় স্তরে করেছেন যা এ প্রসঙ্গে অবশ্যিক হয়ে উঠেছে—‘Linguistic study becomes literary only when it serves the study of literature, when it aims at investigating the aesthetic effects of language—in short, when it becomes stylistics.’ ড. ঘোষ আলোচ্য বইটিতে সন্তুষ্ট এই উদ্দেশ্যকেই সিদ্ধ করতে চেয়েছেন।

Text-এর নিবিড় পাঠোত্তর এ ধরনের সাহিত্যসমালোচনা পুনঃপাঠক্রিয়ায় অন্য দিগন্তের সন্ধান দিতে পারে। তবে



গবেষণা অভিসন্দর্ভটি যখন গ্রন্থাকারে সূর্যের মুখ দেখল তখন গ্রন্থ পরিকল্পনায় লেখক এতদূরনি প্রাতিষ্ঠানিক রীতিনির্ভর না হলেই পারতেন। গ্রন্থশেষে 'উপসংহার' যেন বড় বেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের গল্প এনে দেয়। সমালোচকও তো সারস্বত,

## বিষ্ফুদ্ধ সমকাল হাজির শান্তসমাহিত রূপে

### শুভময় সরকার

৯ টি নির্বচিত গল্পের সঙ্কলন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পটভূমি উত্তরবঙ্গ। কিম্বা হিসাবে প্রায় সবক্ষেত্রেই এসেছে মধ্যবিত্তের জীবনকথা। লেখকের পূর্ব প্রকাশিত চারটি গল্প-সঙ্কলন থেকেই এ সংখ্যার গল্পগুলি নির্বাচিত। চারটি সঙ্কলন যথাক্রমে—'হাস্যে ক্লিষ্ট', 'আকাশযাত্রা', 'কর্ণেলে ও যন্ত্রের জাহাজ' এবং 'কর্ণেলের দ্বিতীয় মৃত্যু'।

উত্তর-আধুনিক বাংলা ছোটগল্পের অন্যতম একজন স্রষ্টা, পঞ্চদশক, সমকালী বাংলা সাহিত্য আলোচনের এক বন্যমান্য ব্যক্তিত্ব অজিতেশবাবু, তাঁর সৃষ্টিগুলিতে হয়ত কিছুক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গের পটভূমি ব্যবহৃত হয়। তবু তা বাংলারই। শুকুয়েই তাই তাকে আমাদের সমকালীন বাংলা ভাষার প্রিয় গল্পকারের তালিকাতেই ফেললাম। জানি না তিনি কোন অভিমুখের বেশি বর্ণিছেন—সম্পাদক নাকি সাহিত্যিক? যদিও এ দু'য়ের মধ্যে কোনও দ্বন্দ্বের ব্যবধান নেই। লিটল ম্যাগাজিন আলোচনের সূত্রে তাঁকে আগেই চিনেছিলাম। গল্পের আদিকে তাঁর সৃষ্টিশীলতার প্রকাশ দেখে মুগ্ধ হলাম।

তাঁর চরিত্রের প্রত্যেকেই এক অনিন্দ্যবরণ জগতের বাসিন্দা। বিষ্ফুদ্ধ সমকাল যেন কোন মাদুরটির ছোঁয়ায় তাঁর সৃষ্টিগুলিতে হাজির হয়েছে শান্ত-সমাহিত রূপে। ক্ষেত্রেতনা এখানে লেখকের জীবনকথানাও অসম্ভব।

'কি গল্প লিখি' শীর্ষক মুখবন্ধটিতে লেখক কিছু জবাবদিহি করেছেন প্রণয়নভাবে। 'হয়ত এ অপটর্ট প্রয়োজন খুব বেশি ছিলো না সঙ্কলনটিতে। যদিও এই অংশটি সবেমাত্রের কারণ হিসাবে রয়েছে গল্পকারের একরূপ অভিমত। 'গল্প তো আজকাল সহজে কেউ পড়ে না। গল্পের ওপর চোখ বোলায়।' জানি এ অভিমত দু'র করার মত আরও ভাল পাঠক তৈরি করা। এক অত্যাশ্চর্য সাফল্যের প্রসঙ্গই গল্পকার করে আমাদের দীর্ঘ ৩০ বছরের বেশি সময় ধরে। যদিও 'বঙ্গদেশ এখন পসংখ্য গল্পকারের ভরে পূর্ণ' বলে তাঁর এতটা গভীর আশঙ্কা কেন তা স্পষ্ট হল না। আসুক না আরও গল্পকার। তৈরি হোক না কেন আরও 'হওয়া' আর 'না-হওয়া' গল্প। কারণ 'সময়ের সম্বাদিনী' তো

সুতরাং গবেষণার প্রাঙ্গণি গতির বাইরে পা রেখে বিতুদ্ধ ষ্ট্রটার মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হওয়াই নিশ্চয় কাম্বিকৃত।

উপন্যাসের গঠনশিল্প : নরেন্দ্রনাথ মিত্রের উপন্যাস—ড. বর্ণালী ঘোষ (গাদুলি)/দ্রৌপদী, কলকাতা-৩৬/১৯০.০০

রয়েছে।—এ সাহস্য বাধ্য স্বপ্নেও অজিতেশবাবু পূর্ণনাট্যায় অবগত। তবে বাংলা গল্পের সচেতন পাঠকগুলি যে গল্প পড়তে গিয়ে আজ আর আনন্দ না পেয়ে চটে গেছে—এত নিশ্চিত প্রত্যয় অজিতেশবাবুর মনে কেন এল? আর 'গল্প পড়ার আনন্দ'ের কথাটা অজিতেশবাবুর মতো ক্ষমতাবান সাহিত্যিকের কাছে না বললেও পারতেন। কারণ সেটা আমরা বলব এবং অবশ্যই উচ্চস্বরে।

সাম্প্রতিক সাহিত্যের আঙ্গিক নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা গবেষণা, ভাড়াগড়া অজিতেশবাবুর মনোপুত নয় কি? অথচ তাঁর সৃষ্টির মধ্যে প্রতি পদক্ষেপে কিন্তু সেই পরীক্ষাই তিনি করে চলেছেন। আর অবশ্যই তা সঙ্গোনা তা নিশ্চিতভাবেই বলা চলে। যে-পূর্বসূরীদের কথা তিনি প্রদ্রবক্ষেই উল্লেখ করেছেন—'তাঁরা প্রত্যেকেই কিন্তু তাঁদের সৃষ্টিতে সেই নতুনত্বই এনেছেন—যা পূর্বধারা অনুগামী নয়। এবার তাঁর কয়েকটি গল্পের বিষয়ে সামান্য উল্লেখ করি।

এক চূড়ান্ত আশাবাদের গল্প 'কর্ণেলে ও যন্ত্রের জাহাজ'। যে জাহাজ অস্ত্রের সমুদ্রবরষে যুদ্ধযোজনা করেছে। সব কিছুর ঝড়ে ভেঙে যাওয়ার পরেও যাত্রী ও নাবিকদের চেষ্টায় যা ভেসে চলেছিল একের পর এক প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে। শুধু যুদ্ধ জয়ই নয়, কর্ণেলকে প্রতিহত করতে ছিলল সর্দার সামান্য-অনদের দাফাও। এ এক বিরোধের গল্প। কর্ণেল ছাড়া অন্য চরিত্রের মধ্যে রয়েছে সুমিতা, সুমিতার মা সুজাতা। গল্পের শেষে এক নারী তার বিয়ে মানুষ জয়ন্তকে শোনাচ্ছে মজলুভাড়া জাহাজের কথা। যে-জাহাজ কর্ণেলের প্রতীক। যাকে পৌঁছেতে হবে এক নিশ্চিত, মুক্তজীবনের উপার উপকূলে।

'আত্মবৈবর্তন' নিশ্চিতভাবেই এক 'প্লটভাড়া গল্প'। এক বিশ্লেষকের বেড়ে ওঠা, বৌনতার অনুভব, স্বীকারোক্তি, ব্যঙ্গসঙ্গির চেতনা গল্পের শীর্ষক জুড়ে রয়েছে। যেখানে আশাভাঙার মোহের এক দাঁড়িয়ে অজ্ঞাতব্য করতে হয়ে সামান্যবিরতির অনুসন্ধানের জন্য। 'আকাশযাত্রা' এক শিশুর গল্প। শিশু হয়ে ওঠার গল্প। এ গল্পেও রয়েছে আঙ্গিক নিয়ে গল্পকারের পরীক্ষা। গল্পের চরিত্র

হিসাবে এসেছে প্রসন্ন আর হাতী। বাকিমসৃষ্ট চরিত্রকে অসাধারণ দক্ষতায় পুনর্নির্মাণ করেছেন অজিতেশবাবু। 'হোমিয়ার দ্বিতীয় মৃত্যু' গল্পে। এ গল্পকে কী বলব, জীবন আর সাহিত্যের মেলবন্ধন? নাকি জীবন ছেনেই সাহিত্যের সৃষ্টি। বিগত শতাব্দীর চরিত্রটিকে বর্তমানের আলোয় সমকালীন এবং সম্পূর্ণ বাস্তব করে তুলেছেন গল্পকার।

শব্দী, পিনাকী আর সুকলকে কেন্দ্র করে রচিত 'গ্রেম নেই'। একমাত্রায় কবিতাও, সহযোগিতা পিনাকীরজন লড়াই থেকে সরে আসা সুবিধাভোগী একজন মানুষের পলিত। তার সহবর্ণিত শব্দীর মন থেকে এমনও কিন্তু সেই স্বপ্ন মুছে যায়নি। শব্দীর লড়াই ভালো। সে এখনও আশা করে সমস্ত বার্ষিকতাকে ভালো পিনাকী আবার সমস্ত ডিক্সিয়ে লড়াইয়ের মাঝে ফিরে আসবে। 'গ্রেম নেই' আশুপ্ত প্রেমের গল্প। যেখানে এক নারী অপেক্ষায় থাকে তার ভালবাসার মানুষটি আবার মুক্তসমাজের জন্য বিরোধোৎসাহী করবে।

'চৈতন্য বৃষ্টি' বাসনা জয়ের গল্প। পুরোপুরি প্রেমের গল্প। হঠাৎ প্রেমকে মরতে না দেওয়ারও গল্প। প্রতিমা, সুবিনা ও আর পি-শর্মার আত্মা নিয়ে জমে উঠেছে 'বাঘ' গল্পটি। এককোঁটা বৌনতা গল্প। বৈঠকি গল্প এটি। 'কিন্তু মনি'তে রয়েছে উদয় মিশ্র, সরস্ব এবং অনিরুদ্ধ। এ গল্পের প্রতিটি অংশতে রয়েছে পরস্পার যত্না, অনুভব। অশ্বা প্রেমের ক্ষেত্রে 'পরকীর্তী' বলে সত্যিই কি কিছু নয়? প্রেম তে প্রেমই!

'রথী'তে নৈমি উৎসাহেরদ্বয়ের স্বপ্ন ঘোষণা, আর তার বিপরীতে দাঁড়িয়ে প্রতিদিনের লড়াই করা একজন 'অসামাজিক' মানুষ সর্বের্ষের মুখাণী। আজকের সময়ের 'সর্বজ্ঞানামা এই অভিসাধারণ প্রধাকে গল্পে তুলে ধরতে উপযুক্ত সঙ্গত হিসাবে

এসেছে নমিতা আর হোমস নন্দী। গল্পের চিত্রাচারিত 'প্লট' নির্ভরতাকে চ্যালেঞ্জ-জ্ঞানোনা আর একটি সৃষ্টি 'মায়ের নাম শোমোতা' যেখানে রয়েছে সামূল আপাত চাপলা। 'কিরোদা' নামী কিরপের হেহলালসা, ভালবাসার কাঙ্ক্ষাপনা, তৎপল চরিত্রগুলির অসহায়তা, ব্যঙ্গসঙ্গির সমস্যা সমসময়কেই তুলে এনেছে স্পষ্টভাবে। 'উৎসব' নিঃসন্দেহে নাগরিক প্রেমের গল্প। চরিত্র দুটি অর্ন্ত আর রীত। এক ইচ্ছাপূরণ আর সুখধর্মের গল্প 'আরোগ্য'। যেখানে দেখি করুণ বাবাব থেকে কয়েক মুহূর্তের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা শৈশবেয়র ডাক্তারের—কন্ডনার ডাক্তার। যার একটি ফুরিয়ে যাওয়া, ডাক্তারেরা মানুষের গল্প এটি। যার জীবনের কোনও আকাঙ্ক্ষাই পূর্ণতা পায়নি। আবার এরপরই রয়েছে নতুন হয়ে ওঠা, বৈঠে থাকার একটি গল্প। যার নাম 'বয়েস'। বিরহ বিচ্ছেদ মিলন আনন্দ সাহিত্যই রয়েছে একে। রয়েছে এক সুন্দর ছন্দময় পরিবার আমাদের বিষমতা কাটিয়ে ওঠার আর এককোঁয়েমি দু'র করার যাদুসমুদ্র।

সঙ্কলনের শেষ গল্প 'প্রতিপক্ষ' পড়তে পড়তে কেন জানি না 'রক্তকবীর' র কথা মাথায় এল। যদিও আপাতভাবে দুটির মধ্যে কাল আঙ্গিক বিষয় ষ্ট্রটার দৃষ্টের ব্যবধান। যেখানে রুমিও নশ্বীর মতো শুধু নারী হয়েই থাকতে চাননি। উম্মীহ কয়েক পূর্ণ মানুষের। 'রক্তকবীর'ে কিন্তু নশ্বীর, বলপাণল, রজন সবাই ভালবাসতে নশ্বীরে। কিন্তু নশ্বীরার ভালবাসনা পরেয়ে কে? এখানেও তেমনই মি. পরিয়ায়ল, অনিমেয়, শুভানন্দ, সত্যকিন্দ্রর সবাইয়ে আত্মকর্মির প্রতি। কিন্তু রুমি যুঁজে চলেছে কৌশিককে। যে অন্যদের কৌল-অন্তহীন।

নির্বাচিত গল্প—অজিতেশ ভট্টাচার্য/বইওয়ালা, শ্রীভূমি, কল-৪৮/৭৫.০০

## কবিতা : বিষ্ফুগত ও ব্যক্তিগত

### বুলবুল আহমেদ

বাংলা কবিতা একটা বিরাট সময়-পরিমি পর হতে এসেছে।

এবং আজ আর তা নিছক ব্যক্তিগত রোমাঞ্চিত্য বা কন্ডনাঝিলসের বাহন মাত্র নয়। কবিতা আমাদের ভাবারও সাহিত্যের সব চেয়ে পলিতও ব্যাপ্ত অংশ। সমসময়ের সামাজিক ও আন্তর্জাতিক জীবনের নানা ওঠাপড়া অনিবার্যভাবে এসে পড়ে তার পশ্চাৎপা। আর কবির ভালবাসা, ভাল লাগানাময় বিষাদ শোক বিক্ষোভ উচ্চারণের এই একমাত্র জায়গা। তাঁর দারামকুর কেনও পক্ষ বিধানের হাব বলে মনে হয় না।

পঞ্চম শতাব্দীপাধ্যায়ের নতুন কবিতার বই 'শোনে স্বপ্নকৃত, শোনে' জুড়ে রয়েছে তাঁর এই সময় যাপন, তাঁর সংগোণ, তাঁর

মনোবেদনা। অন্তর্গত এক যাতনা থেকে তিনি বলেন—'কবিতা হেঁফের শিলা। শব্দ দিয়ে কোনো উপববই/কবির আরাধ্য নয়; তার শুধু গাঢ় অনুভব/বোয়ের অত্যা থেকে বোধ তুলে আনা/অসংখ্যের বেদনার সঙ্গী হয়ে/ব্যথিত হবার সন্তকণ/ঘটে—একক শব্দ বিদ্যাসের/শিল্প গড়ে তোলা'। আজকের এই উপকৃত সময়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে উদীয়নি থাকতে পারেন না কোনও সচেতন মানুষ। আর এ অমোঘ সামগ্রার স্বপ্নেরেও কবি না রেখে যান এই কবি—'মর্ষিহারা দেখায় অম্ল/মুগ্ধেত কিংবা স্বর্গের মাটি/পৃথিবীর চেয়ে কাম্বিত। অমি/মিথো জেনেই ভিন্নপথে ইটি।'



স্বপ্নহীনতা আমাদের সময়কে গ্রাস করেছে, অনুসরণযোগ্য কোনও মানুষ বা আদর্শ না থাকার কষ্ট যুগপৎ ব্যক্তি করে। তিনি চুপ করে থাকতে পারেন না। এই সময়ের চালাচলি আমরা পাই তাঁর কবিতায়— 'মাঝে মাঝে মনে হয় বেঁচে থাকা বাড়া অর্থহীন।/যখন অদ্ভুত সূত্রে আমাকে নাচায়, আমি/শুধু অপরের ইচ্ছাধীন/একজন নর্তক/... আমার শিশুর দিকে তাকালে/সুপ্ত দেখি—' অন্তত আগামী/ যৌবন পা রাখলে সে তো জেনে যাবে—/ভবিষ্যৎ গাঢ় অন্ধকার/কেউ নেই, ভাল নেই হার দেয় পর করে দিতে/সুখ-বীচার ইচ্ছে অসুখ লাগে লম্বা/নিমিত্ত পাশ্চাত্যের অতঃপর ভাসেও নিজেকে/ আর ভাসতে ভাসতে সেই আগামী কোন অণুভবের সমীপবর্তী হবে আমার জ্ঞান না, না-জানার পাণ্টুকও বহন করতে হবে জেনে ভয়ে কঁপে কঁপে থাকি।

সংকলিত অধিকাংশ কবিতায় আমরা কবির হতাশা, ব্যর্থতাবোধ, ক্রোধকানিশিত হতে দেখি। কয়েকটি সন্তোষজনক সূত্রোপেয় পেশায় আমরা এই কবিতার বইতে। তবে পত্রিক মুখোপাধ্যায়ের সঙ্কলিত সন্টোগুলি খুব বেশি প্রত্যাশা জাগায় না পাঠকের মনে। কিন্তু বিভিন্ন কবিতায় তাঁর ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ ও শ্রেয় দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। ঈশ্বর টয়েটো চেপে এসেছেন, কলীন সময়ে এসে, মস্তকের উপরে যারা, ঘরে-ফেরা, হত্যাকাণ্ড ঘটে যায় ইত্যাদি কবিতায় পরিহাসের আড়ালে এক জীবন-সংলগ্ন সত্য বর্ণিত হয়ে।

একজন সং কবি, তিনি যে সময়েরই হোন না কেন, কেবল হতাশা, গ্লানি ও দীনতাবোধ বলা বলেন না। কবিই তো পারেন এক নষ্টমানুষ অতিক্রম করার আশার কথা শোনাতে। নাম কবিতায় এই কবিতকে বলতে গুনি— 'ইতিহাস ধরে হেঁটে ভূমি যতদূর যাবে/এই মিলিটার নিজে শরভদ্র, ঈশ্বর/পাশপাশি তুমি থাকে, থাকে।' অথবা 'মায়া-মায়ীকর মতো স্বপ্নবিশ্ব পনের পালক/ফেলে, উড়ে যায়নি কোথাও।' আর হাত-পা গুটিয়ে এসে থাকলে কোনও দেশবাসীই আমাদের জন্য সুমনস্ক হয়ে এনে পরমায় কড়া নাড়বেন না। তার জন্য তাড়না থাকা দরকার, দরকার উদ্যোগ। এবং কবিকে আহ্বান জানাতে গুনি— 'মাঠে নেমে এসে, খেলো। গ্যালারিতে নয় স্বপ্নকৃত।'

পারিপাশ্য প্রকাশিত পত্রিক মুখোপাধ্যায়ের এই কবিতার বইয়ের প্রচ্ছদ একেছে শ্যামাল দাস। আর তা গ্রহণমানে ডাকনার মূর্ত প্রকাশ।

অসীম রেজ-বৈ নির্বাচিত কবিতা 'সঙ্কলন ঠিক-এর বিপরীত সঙ্কলনে রেজ-বৈ শৌণ্ড আমদের কাছে। তাঁর অধিকাংশ কবিতাই ব্যক্তিগত চারপাশ ভাষা। এই ভাষায় বর্ণনা যতটা রয়েছে,

রচনাগুলি ততটা কবিতা হয়ে উঠতে পারেনি। কবিতা সঙ্কলনের পরিপ্রেক্ষিতে কখনো কবি জানিয়েছেন কর্মক্ষেত্রে তাঁকে নানা জাগ্রায় থাকতে হয়েছে এবং 'এক এক অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, জনজীবনের বর্নমা চালাচলি দেখার বিশেষ অভিজ্ঞতা প্রতিনিয়ত কবিতা লেখায় আমায় জাগ্রিত করিয়েছে।' এই কবিতাগুলি এই 'অনুপ্রেরণার ফসল।' পূর্ব প্রকাশিত তিনটি এবং অপ্রকাশিত একটি কবিতার বই থেকে এই 'নির্বাক'। একলা থাকার কথা, কথা না-রাখার কথা, প্রথমসংলাপ, স্মৃতিভারতের ইত্যাদি এসব কবিতার প্রধান উপজীব্য। তবে তার মধ্যে নানা হাস্য পুনরুক্তি কিছুটা একঘেয়েমির সৃষ্টি করে।

কবিতাগুলি পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে দু'একটি পঙ্কতি আমাদের স্পর্শ করে যায়, যেমন 'আকাশের শেষ তারা'য় কবি যখন এইভাবে বলেন— 'ওধু হাওয়া যাব সারারাত/পাতা নড়ে/ছায়া কাঁপে/তার ওঠ জুড়ে ভরে আসে জল/আর এরই মাঝে যাবের পাশাপাশি/শুয়ে থাকে মুক নদী/ওড়তা জুড়ে আকাশের শেষ তারা/একলা ঘুমায়।'— সমস্ত ভালোবাসার মধ্যেও এক দুরতিক্রমা নির্জনতা আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হয়। আবার 'আর এক বসন্ত' কবিতায় আমরা পড়ি— 'বাবা নেই/মা ছিরিছিরে মতো। শুয়ে,/দ্বী পূত্র কানা দূর দূরপাশে পড়ে থাকে./প্রত্যেকের স্মৃতি এক একটা চিত্রার মতো জ্বলে/চৈত্রের বৃষ্টির ভিতর।/... আমি উলোমত হয়ে শুয়ে থাকি ছাদের ওপর./দেখি বসন্ত আকাশ খেলা করে বিদ্যুতের তারে।'— কোনও এক ফায়ানের রাতে একান্ত ঝিমঝিমেরে হারিয়ে সমস্ত ভুবন জুড়ে আঁধার ঘনিষে আসার কথা মনে পড়ে যাবে কোনও একে পাঠকের। অথচ আমাদের জানি, এখানে কোনও ভাষা মানুষের জানা নেই যা দিয়ে ছন্দয় ঠুঁয়ে কোনো কথা জেগে উঠে... আমাদের অন্তর্গত মনোবৈদ্যকে ব্যক্ত করবে সকলের কাছে। অথচ শুধু ভাষা নয় সঠিক অনুভূতি ব্যতিক্রমে কবিতা হয়ে ওঠে এলোমেলো নিরাশ্রয় শব্দের কল্যাণ।

অসীম রেজ যদি তাঁর 'নির্বাক'ের আরও বানিতকি নির্মিহে হতেন, স্রষ্টার দুর্বলতা পরিহার করে, তারের আর একটি ভাল হত। বইতে কবিতাগুলি সাঙ্গার সময় পরিপাটি আনার আরও সুযোগ ছিল। ব্যবহৃত কাগজের মান ভাল নয়। এতদুপগ্রহাদ ইন্দ্রিয় মূর্খ কব চোখে পড়ে। আর তখন চক্রবর্তী অজিত প্রচ্ছদ আভ্যন্তর কবিতা পাঠকের জন্য যেমন ব্যঞ্জনময় হয়নি।

■ শোনা 'স্বপ্নকৃত', শোনা : পবিত্র মুখোপাধ্যায়/প্যাপিরাস, কলকাতা-৪, ৩০.০০

■ নির্বাক কবিতা : অসীম রেজ, দীপ প্রকাশন, কলকাতা ৬/৫০.০০

## স্মরণে

## সদ্যপ্রয়াত কবি ভাস্কর চক্রবর্তী

### তারাপদ আচার্য

একজন কবি বলতেন, এমন অভিজ্ঞতা আছে যেখানে দুখ আর আমাদের মধ্যে যেন কোনও দূরত্ব নেই, শুধু সুখ সুতার মতো একটা ব্যাধান। আর তাই, যতই 'বিদ্যাদ' বা 'আর্দান্দে'র কথা লিখুন, তিনি আমাদের বলবেন:

আমার জীবন একটা আর্দান্দ

যদিও তা আর্দান্দ আর গান আর মেয়েদের হাসি দিয়ে ঢাকা। সেই কবির, ভাস্কর চক্রবর্তীর, শেষ কবিতাবইয়ের একটি কবিতার এই লাইন।

আবার তিনিই অন্য একটি কবিতায় এই ব্যাপারটিকে হাওয়ায় ভাসিয়ে দিয়ে একেবারে ভুবনাতীরে পৌঁছে যেতে পারেন মাঝপাশায়। আমরা তখন মগ হয়ে যাই তাঁর এই সব কথায়:

বীচতে চাওয়া আর না-চাওয়ার মধ্যবিন্দুতে

কাপনের কাটা পাশতও একটুকরো সত্য হয়ে আমি হাওয়ায়

দুলিলাম

এভাবেই আমরা সদ্যপ্রয়াত এই কবিকে আয়ত্ত করবার চেষ্টা করি। কিন্তু এই জাতি হাতে পেয়েছি তাঁর কবিতার চাবিকাঠি, এবার খুলে ফেলব তাঁর 'দশবারোপেনেয়েতলা সমান একটি বিরক্তির বন্ধ দুয়ার, কিন্তু পরমুহূর্তেই তা শূন্যে মিলিয়ে যায়। আর তখন,

মানুষ যেমন জ্যামত পুড়ে যায়  
সেরকম মৃত কোনো চিত্রায়ও পোড়ে না।

একটা তুচ্ছতা আজ ঘটা দুই  
বিশ্বেলের নদীর ওপারে।

তবুও আওন একটা ছায়ে যায়  
কোথাও কিছু বা পোড়ে— নিশ্চিত মানুষ।

## ২

তাঁর প্রথম কবিতার বই 'নীলতাল কবে আসবে সুপর্ণা' (১৯৭১) পরিণত কবিতা-সঙ্কলন, যদিও ভাস্কর তা ভাবতেন না। তিনি বলেছেন, 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' নির্বাচন করার সময় দুর্বল কবিতাগুলি না কি বাদ দিয়েছেন। 'কবিতার বইগুলো থেকে অবশ্যই কবিতাগুলো সরিয়ে দিলে যাতে-বা আমার মনের মধ্যে একটা কবিতার বইয়ের দেখা পাতোয় যেতে পারে। এই বই, সেই বইয়ের দিকে যাওয়ার একটা প্রচেষ্টা মাত্র। আর কিছু নয়।' কথাগুলি অবশ্য সহজাত বিনয় থেকে বলা। আমরা কিন্তু তাঁর তথিল কবিতা থেকে চেষ্টা করেও কোনও অপ্রচ্ছদের কবিতা পাইনি। বরা ব্যাক, বাদ পড়া অথচ পাঠকের স্রিয়, একটি কবিতা, একেবারে প্রথম বই থেকে:

একলা থাকতে থাকতে থাকতে থাকতে  
আমার গায়ে সবুজ শ্যাওলা গজিয়ে উঠবে একদিন  
পোড়ো বাড়ির মতো, আমি অন্ধুরে দাঁড়িয়ে থাকবো

একদিন জঙ্গলের মধ্যে  
এরকমই সহজ আর গভীর কবিতা লিখতেন ভাস্কর। কবিতাগুলি তাঁর নিজেরই মতো। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সবই আত্মজীবনের কথা, সে সব কথার মধ্যে কোথাও দুর্যোগের কোনও চিহ্ন নেই। তাঁর বিষয়ে বলা যায় যে সহজ সরল মৌখিক শব্দ পাশাপাশি সাজিয়ে যে কত বড় মাপের কবিতা হতে পারে, যেন সেটাই তিনি প্রতিপন্ন করছিলেন। রহস্যময়তা এবং যথার্থ কবিতা হয়ে ওঠার সবটুকু উপাদান নিয়ে ভাস্কর পালককে মতো মসৃণ ও সুন্দর কবিতাগুলি লিখেছেন।

যে ট্রেনে

আমার শান্তিনিকেতন যাওয়ার কথা ছিল, সেই ট্রেনে হযোতা  
শান্তিনিকেতন পৌঁছে গেছে এখন— অশ্রুহীন ভবিষ্যৎহীন

এক মীল পারিগে

কলের পুতুলের মতো নিরুপায়, আমি ঢুকে পড়ছি আবার।  
পাশাপাশি কিছু শব্দ সাজিয়েও যে কবিতা হয় না তা জানেন  
ভাস্কর। তিনি জানেন কবিতা হতে হলে তার ভিতরে অতিরিক্ত

কিছু থাকা চাই। কীভাবে আসে সেই অতিরিক্ত কিছু? কবির মনের এক গভীর তলদেশ থাকে, এবং সেখানে থাকে এক জীবনব্যাপনের সারাগ্রন্থ। সেই সারাগ্রন্থের জড়িয়ে আছে তাঁর সমস্ত কবিতার শরীরে। নিজের চোখে যা লেখতেন পড়তে পড়তেন যাপনের অভিজ্ঞতায়, তাই হয়ে উঠত তাঁর কবিতার বিষয়। তিনি গান ভালবাসতেন, নিজের গহিতে পারতেন ভাল। রবীন্দ্রসঙ্গীতই প্রথম পছন্দ। তাছাড়া আছে ক্রসিকাল ও পুরাতন গান। রবীন্দ্রনাথ পড়েছিলেন কব কাষে। তবে বলতেন, আবার ধারাবাহিকভাবে রবীন্দ্রনাথ পড়ার ইচ্ছে হয় খুব। বার বার পড়তে ভাল লাগে 'ডাকঘর' নাটক। এই সব ভাললাগা একদিনে, আর সেই সঙ্গে তাঁর লেখা:

এইখানে মূর্খ এক তার  
অসুখী জীবন নিয়ে খেলা করছিল।

ছায়ে তার রঙিন পাঞ্জাম পড়ে আছে—  
ঘরে-বাগানে, তার

পড়ে আছে হাত ও পায়ের কসরত—  
এইখানে এখানে-ওখানে— রক্ত, আর

শুণি জলের দাগ



থেকে আছে কবকের ছিভিন্ন হাসি  
আপাতদৃষ্টিতে দেখলে মনে হবে, কী-ই-না আছে এতে? অথচ  
এই তে কবিতা। এমন সহজ কতকগুলি তুলির টান—আর  
সেই টানেই মুটে উঠল একটি আশ্চর্য প্রশংসা সত্তা। সজীব  
জানার শব্দ।

৩

সরু গিলা, রাষ্টা, তিনতলার ছোট ঘর। আরও আছে, আছে  
জানালো, আছে খোলা ছাদ। এ ছাড়াও আছে চায়ের সোপান,  
রেস্টোরা, কফি হাউস এবং অসংখ্য চেনা-অচেনা মানুষ। নির্মবিত্ত  
ও দরিদ্র মানুষ। তাঁর কবিতার ভিতর কলকাতা শহরের এইসব  
নিচুতলার মানুষ ও দরিদ্র অসহায় মানুষের প্রসঙ্গ ঘুরে ফিরে যাবার  
বার এসেছে। এই তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতার পৃথিবী। নিজের এই  
অভিজ্ঞতার বাইরে না গিয়ে তিনি ভুলিই করেননি। দেশ-বিশেষে  
ঘুরে বেড়াতে হবে, যেতে হবে, ‘বাগদান-রোম-চীন’—এমন  
কেনও বাধ্যতা নেই। বেনদা, হতশা, আনন্দ—বৈশিরভাণই  
অসংখ্য হতশা, ভাঙ্করের ভাঙ্করপ্রতিম কথা, শেষ পর্যন্ত কিন্তু হয়ে  
ওঠে সমগ্র পৃথিবীর দুখী মানুষেরে মলিন জীবনের ছবি:

পৃথিবীর যতো সরু গিলা আছে

এ বছর

সেখা শেষ হবে

অথবা, সরু একটা গলিতে দিবা লটকে আছি, অথবা, ‘আর  
এই যে একটা মুচুটি ঘরে’, অথবা, ‘রাষ্টায় দাঁড়িয়ে পড়া এক/মানুষ  
আমি, সুখ, সারা পৃথিবীটি/কবিতা দিয়ে তৈরি। আমাদের  
কলমদ্বারা মজদার মস্ত একটা কবিতা।’ অথবা, ‘তরুণ ছাড়া  
আমার কোনো মনোদলিত নেই।’

বাহিরটা সুখী, চাকচিক্যময়, কিন্তু ভাঙ্করের ভিতরটা একান্ত  
দুখী, হতশা ও ব্যর্থ এক মানবসত্তা। তাঁর সমগ্র সেই  
ভিতরশ্রুতিবোধ যেন ভূতীয় বিশেষ বর্ণিত মানুষের রিক্ততার  
সঙ্গে মেলাতো যায়।

যখন

আমার ঘুম পাবে আমি ভাবনালী

ভাঁজ করে রেখে দেবো মাথার পাশে—ওগুস্তা, বিশ্ব নেই  
এমন কোনো

মানুষ আমার কী আর খুঁজে পাবো না শহরে?  
কবিতার মধ্যে জীবনের যে-ছবি তিনি আমেরে তার আরম্ভটা  
সেই আশ্রয় বহর ব্যসেরে লেখায়। ‘প্রিয় সুভূত’ টিকভাঙেই  
ধরা পড়েছিল মনে হয়: ‘একটি বিশাল ভক্ত প্রতিদিন আছে  
আমাকে আমাকে গিলে ফেলেছে’—আমি বলিগেই যাই, ডান দিকে  
যাই—অথবা এখন কোনো দিকেই আর যেতে ইচ্ছা করে না  
আমার।’ জন্তুর এই গিলে খাওয়ার প্রতিমা আবার সর্বদাই অসং-  
বিশ অনুভব করতে পারি। কেনও উপায়েই যে এর থেকে  
মুক্তি নেই, তা আমরা ভালভাবেই বুঝি। পৃথিবীতে যিনি যেমন

ধরনের মানুষই হোন—না-কেনে, তিনি ঠিক তেমনভাবে এক অদৃশ্য  
জন্তুর গিলে খাওয়ার উপাদান থাকে।

‘সবুজ ঘুসোখাসকে যখন পেঁ থেকে ছেঁটে দিচ্ছে অংধরা  
একটা ব্রেড’, তখনই বোধহয় কীকটাকে ঠিক চেনা যায়। বোঝা  
যায়, পৃথিবীটা এরকমই বিবেচনারহীন এক ভুড়পার্শ্ব। আর  
সে জন্যই বোধহয় কবির আরও মনে হয়, ‘কীভাবে ঘুরি যে  
পথে পথে/কীভাবে মরি যে প্রতিদিন/মনে হলো/আজ লিখে  
রাখি’, এতাইই তিনি লিখে রাখেন কিছু অসংখ্য পঙ্ক্তি: ‘এ  
বছর শীতের সামান্য আগুন, কলহ ব্যাভাসে/খরা পাতাটির মতো  
ভেসে ভেসে গিয়েছি রাস্তায়।’

৪

‘তথাকথিত ছন্দ ছাড়া আমার কবিতাকে আমি ইটোতে  
শিখিয়েছিলাম। আমার নিজের কাজ আমার একটাই দায় ছিল,  
জ্ঞান্ড আর নতুন কবিতা লেখার দায়।’ ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’য়  
কবিতাকেই এই ভূমিকালিপি তাঁর আত্মবিশ্বাসের ভিত্তিটি চোঁয়েছে  
যে। মনে হয়, ভাঙ্করের এই মতবাদের মধ্য দিয়েই আমরা সেইসঙ্গে  
পারি তাঁর আদর্শনে, মনে রাখতে পারি যে কবিতায় গদ্যছন্দকে  
তিনি নতুন একটা মানে এসে নিয়েছেন। তার থেকে আমরা পাই  
যথার্থ এক ভালবাসার অনুভূতি। রিমিয়ে পড়া প্রত্যাহার থেকে  
আবার উঠে দাঁড়াতে শেখায়: ‘শোনাে ঘুলায় আমি মিশে  
গিয়েছিলাম মানুষেরে মধ্যে। এক টুকরো ঘরে, রাস্তায়, নদীয়ার  
ঘরে বসে আমি কাটিয়েছিলাম জীবন—দেখেছিলাম চায়ের  
সোপানে দেবুত কাপ-স্ট্রেট খুঁতে খুঁতে ঘুমিয়ে পড়ছে যাবার।’  
এই সেন্দূবত্বের দেহেতে পাওয়াই ভাঙ্করের কবিতা।

আমি অসুখ কিছুই ভাবিনি

দুটি কবিতা লিখতে চেয়েছিলাম আমি  
আর বেঁচে থাকতে চেয়েছিলাম

যত বছর

পেঁচা কাযা যায়

একদিনকে এধরনের স্বীকারোক্তি, যা যে-কোনও কবির চরিত্রস্বর্ধ।  
আবার, অন্য দিকে ‘শারনয়ান’ গদ্যগ্রন্থে আত্মবিশ্বাসের ধরনে যে  
হতশার ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন তা পাঠককে কবিতার আদ্য  
সেয়ে: ‘কেন লিখতে এসেছিলাম কবিতা? ছেলেবেলা থেকেই  
জীবন আমাকে যারপরনাই বিস্ত্রিত করত। মাঝামি এক আবেশ।  
আমার মতো গরীব বাড়ির এক পাঠবিমুখ ছেলের কাছে, কবিতা  
এসেছিল এক মুক্তির আশা নিয়ে। মহৎ কবিতা লিখতে পারলে—  
আরোহা-উনিশ বছর বয়সে বেশ কিছুই ভুলেই ভেবেছিলাম যে—  
ভাল চাকরি-বাকরি পাওয়া যাবে একটা নিরপেক্ষ কলমে, কোনও  
খবরের কাগজে।’ তারপর এই কথাগুলি আরেকটু এগিয়ে এসে  
অনভূত এক সত্যসূত্র নিয়েছে। অর্থ ও খ্যাতির ঘূর্ণি থেকে কবি  
কিন্তুকে যেন এক ঝটকায় সরিয়ে এসেছেন এবং বলছেন: ‘আকাশ  
ছোঁয়া খ্যাতির জন্য আমার একটা মোহ ছিল একসময়। কিন্তু  
কবিতার সঙ্গে তীব্রভাবে জড়িয়ে এমনভাবেই কেটেছে আমার

ত্রিশ-পাঁচশ বছর, এখন মনে হয়, বিখ্যাত বিখ্যাত আর বিখ্যাত  
হতে চাওয়ার মধ্যে একটা অসীলতা আছে।’—এখানেই  
ভাঙ্করের অন্তর্যাতন।

ওখু বেঁচে থাকা নিয়ে বেঁচে থাকা ওনতে পাই শিল্পময়  
খুব—

সে সব আমার জন্যে নয়

এক কবি লিখেছিলেন: ‘দেবি আমার সমস্ত খোলাখোলের  
ভেতর মুখী’ তার ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে আছে।’ ‘মৃত্যুর সেই  
ছায়াই কিন্তু ভাঙ্করকে আরও দীর্ঘকাল বাঁচিয়ে রাখবে বলে

### জীবনকথা

ওঁসের বিয়ে হয়। ১৯৩৩-এর ২৪ জুলাই একমাত্র কন্যা সোনামুখির  
(প্রতি) জন্ম। এখন সে বয়ঃপ্রাপ্তি ছাড়া।

এ পর্যন্ত প্রকাশিত ভাঙ্করের কবিতাবিশেষের সংখ্যা এগারো,  
খুবইয়ের সংখ্যা তিন।

১৯৪৪-এ সাহিত্য অকাদেমির (দিল্লি) একটি অনুদান পেয়ে  
ভাঙ্কর ‘শারনয়ান’ নামে আত্মকথাখণ্ডী একটি ইংলিশে। ‘লিঙ্গীত’  
পত্রিকার সম্পাদক কমল সুখোপাধ্যায় কবি হিসাবে ভাঙ্করচক্রতীকে  
সংগৃহীত করেন ১৯৪৪ সালে। ১৯৪৬ সালে শারনয়ানের ‘স্বাধীন’  
পত্রিকার পক্ষ থেকে ভাঙ্করকে ‘শরদারামাঘ ঘোষ (সেতুদা) স্মৃতি  
পুরস্কার’ অর্পণ করা হয়। ২০০২-এ ‘জিরাফ’ নামের পক্ষ থেকে  
‘জিরাফ পুরস্কার’ দ্বিবার্তা করা হয় তাঁকে। ২০০০-এ তিনি ‘সুভূত’সঙ্গে  
লিঙ্গিৎ বিচারালয়—এর সংকলন লাভ করেন। দিল্লির সাহিত্য অকাদেমির  
গোয়েন্দা জুরিগিল ‘সেলিব্রেশন’ গ্রামের চক্রতী বাড়িতে মনে।  
বাগবাঙ্করের ভাড়া বাড়িতে থাকার সময় বর্ধিষাচার নার্সিংহোমে  
ভাঙ্করের জন্ম। ওঁরা সাত মনে আর দু’ভাই। ছয় পিদির পর ভাঙ্করের  
জন্ম, তারপর এক মনে, সর্বশেষে এক ভাই। বাড়িতে সবাই ভাঙ্করকে  
‘খোদোদা’ বলে ডাকত। যখন বরানগরের ভাড়াবাড়িতে সবাই চলে  
আসেন তখন ওঁর বয়স পঁচাত্তর। কয়েকবছর পর ভাঙ্কর খুঁড়ায় হেলে  
হিসাবে বাবার হাত ধরে (বি টি রোড পার হওয়ার সময়, নইলে  
হাতছাড়া) বাবার খুঁসেই পড়তে আসতেন। ১৯৫৭ সালে বাবার  
তৈরি বরানগরের নিজেদের বাড়িতে চলে আসেন।

খুঁসে থেকে পাশ করে ভাঙ্কর ভর্তি হয়েছিলেন ব্রজানন্দ কেশব চন্দ্র  
কলেজ। কলেজ-জীবন থেকেই তাঁর দায় হয়ে ওঠে কবিতা। তখন  
চাকরি পেয়ে না-পেয়েই হাতছাড়া হয়ে যায়। আর শ্যামদাঙ্করের  
বাড়িটা ব্যঙ্কর চাকরির যখন কথাবাটাও চলছে, তখনই ব্যঙ্কর  
সেই খুঁসে ছাড়া আর কোনও কাজ নেই। ঠোঁটও করেননি আর  
কিছু। তখন থেকেই তিনি ছিলেন শ্রায় সর্বধর্মের কবি।

‘কৃতিদাস’ কবিতাখণ্ডীর সঙ্গে একময়রে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা  
করেননি। কিন্তু তারপর আবার সরেও এসেছেন নিজের জগত নিয়ে।  
একটি পুঁথি বারোই পাঁচবার কয়েক মনে। তাঁর শ্রী বাসবী রামাখ্যার  
প্রায় কবি গোবিন্দ চক্রতীর মতো। ১৯৮৮ সালে ১৪ ডিসেম্বর

### বই প্রসং

কবিতাবিঃ ১. শীতকাল করে আসবে সুপর্ণা (অনুদা ১৯৭১),  
(প্রতিভাস ১৯৮৭, দেশ ২০০৩) ২. এসে সুখদান এসে (অনুদা  
১৯৮৬) ৩. রাস্তায় আবার (গ্রন্থ ১৯৮৩), ৪. দেবতার সঙ্গে (ভূতর্পণ  
১৯৮৬) ৫. আকাশ অশ্রুতে মেঘলা থাকবে (প্রতিভাস ১৯৮৭) ৬.  
৪. ধর দেবার মড়া (অনুদা ১৯৮৩) ৫. দুনি আমার ঘুম (প্রতিভাস  
১৯৮৮) ৬. মীল রক্তের গ্রন্থ (জ্যেষ্ঠা ১৯৯৩) ৭. শ্রেষ্ঠ কবিতা  
(দেশ ১৯৯৩) ৮. কী বকবো আমায়েরা (প্যাপিরাস ২০০৫)  
৯. জিরাফের ডায় (প্যাপিরাস ২০০৫) ১০. প্রিয় সুভূত  
(উত্তর ১৯৮৭) ১১. বিবেকানন্দ (কিপারপার) জীবনী, ভাঙ্কর  
১৯৬৬) ১২. ‘শারনয়ান’ (প্যাপিরাস ১৯৮৮)।



## চিত্রপত্র

আপনাদের ৬৪ বর্ষের ২-৩ সংখ্যা যুগ্ম পত্র অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুর ১৯৪৭ খ্রি.-এর ডায়েরির অংশবিশেষ শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রকুমার দে-মহাশয় কর্তৃক সম্পাদনা করে সত্যিকার প্রকাশ করণা অভিনিমদ জানাই। দেশের এক ঐতিহাসিক সচিবস্বামী, এক ঐতিহাসিক পুরুষের এই দিনলিপি ভারতের ইতিহাসের এক অমূল্য দলিল।

তবে বুঝ সন্তুষ্ট চিত্রাকারের ব্যক্তিগত পরিচিতির অভাবে দৃষ্ট ভুল ও একটি অনিশ্চিততা রয়ে গেছে, যার উল্লেখ করছি:

১. ২১শে জুনের ডায়েরিতে সূতোরদেবী (কৃপালিনী) প্রসঙ্গে যে 'কৃষ্ণ'-এর কথা আছে, তিনি কৃষ্ণ মেনন নন। তিনি সূতোরদেবীর স্বামী আচার্য কৃপালিনীর নিকটাত্মীয় কৃষ্ণ কৃপালিন, সেই সময় আচার্য প্রতিষ্ঠিত Vidyā সাপ্তাহিকের সম্পাদনার জন্য ওখানেই থাকতেন। নির্মলদাসের সঙ্গে পরিচয়ের সুত্র তাঁর বিশ্বভারতীতে অধ্যাপক-জীবনে, কারণ ওই অঞ্চলে নির্মলদাস পলিমসংগঠনের কাজও করতেন। রবীন্দ্রনাথের পালিতা কন্যা নন্দিতার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে তিনি রবীন্দ্রনাথের নাতজামাইও। সুতথ্যে কৃষ্ণ কৃপালিন পরে সিম্রিতেই সাহিত্য অকাদেমিতে গুরুপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন।

২. এই আগস্টের চিত্রায় সোমপুর প্রসঙ্গে ক্রিষ্ণাচন্দ্রের আতিথ্যের বদলে তাঁর অগ্রজ এবং আশ্রম-প্রধান সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের নাম হওয়া উচিত ছিল। ক্রিষ্ণাচন্দ্র ও (The

Romance of Scientific Beekeeping প্রকৃতি গ্রন্থের লেখক) আশ্রমে সতীশচন্দ্রের সহকারী ছিলেন। কিন্তু আশ্রমের প্রাণপুরুষ ছিলেন সতীশচন্দ্র।

৩. ১৮ই ও ১৯শে জুলাই এবং এই আগস্টের ডায়েরিতে বিজয়দাস উল্লেখ আছে। ১৮ই জুলাই-এ 'বিজয়া'-এর পর বন্ধুরাি মধ্যে 'চেনা' যদি নির্মলদাসের নিজের হাতে লেখা হয়, তবে স্বীকার করব যে আমি এর সম্পর্কে জানি না। কিন্তু এই আগস্টে যখন বিজয়দাসের নাম আছে, তাকে সুস্পষ্ট যে তিনি হচ্ছেন হোয়াটার (দে ২৪ পরগণা) ও কল্যাণব্রাহ্মের (বর্ধমান) গাছীজির বুনীয়াদী শিক্ষার রূপকার বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় গাছীপন্থী কংগ্রেস নেতা বিজয়কুমার ভট্টাচার্য। হপলির স্বর্ণীয় ভক্তার আওতাধর দাশের সহকারী হিসাবে প্রমুখকল্প সেন, যৌরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রতনমণি চট্টোপাধ্যায় ও বিজয়দাসের মতো নির্মলদাস ও কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হওয়াও এঁদের দলের গণলি গৌটার কংগ্রেসি বলা হত। অতুল্য ঘোষ-মহাশয় এঁদের আরও একটি ব্যয়কতিহাসেও ওই গৌটার কংগ্রেসি রূপেই পরিচিত ছিলেন। ১৯শে জুলাই-এর 'বিজয়া'র দিনে বিজয়দাসের অবকাশ থেকে যায়।

শঙ্খা ও নন্দ্যরাস্ত্রে।—

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়  
কামডহরি, কলকাতা-৮৪

নজর কাডল 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় (৩০ বর্ষ ৩-৪র্থ সংখ্যা) স্বপ্নরঞ্জন সেনগুপ্তের লেখা 'ভাড়া পথের রাজা লসার'। নামটা চমৎকার। পুরনো দিনের ভুলে যাওয়া অনেক কথাই মনে পড়ত। ভড়তে ভাল লাগে। এই প্রসঙ্গে নিরঞ্জন হালদারের লেখা চিত্র পড়ে কালিকামণি নিয়ে লিখতে বসার প্রেরণা পেলাম। যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রসঙ্গে লিখেছেন: তিনি ছিলেন 'যুগান্তর' পত্রিকার প্রথম সম্পাদক। নীতিগত কারণে তিনি যুগান্তর ত্যাগ করেন যা তাঁর কলহে বাধা হয়। নিরঞ্জনবাবু আরও লিখেছেন, 'যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য যুগান্তর ছাড়ার পর ব্যঙ্গ্য-বাণিজ্য নামে (কোনও কোম্পানি নামই) একটি পত্রিকা বের করেছিলেন। পত্রিকাটির বড় জনপ্রিয় হয়। কিন্তু ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট কলকাতা শহরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় তাঁর পত্রিকা অগ্নিস্ফুট

হয় এবং পরবর্তী এক বছর কলকাতা শহরে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে চোরাগোষ্ঠা ঘুরি মারা চলতে থাকায় পত্রিকাটি বের করা সম্ভব হয় না।'

পত্রিকার নাম ছিল কিন্তু 'আর্থিক জগৎ', 'ব্যবসা বাণিজ্য' নয়। 'আর্থিক জগৎ'-এর অফিস ছিল ১২২নং পটবাড়ার স্ট্রিটে (বর্তমানে বিশিষ্ট বিহারী গান্ধুলি স্ট্রিট)। একতরফা ছিল প্রেস ও পত্রিকার অফিস, মোতালায় যতীন্দ্রনাথ দাশ-পুত্র-পরিবার নিয়ে বাস করতেন। আমি তাঁর পাশের বাড়ির এক দ্রষ্টাও থাকতাম। ১৯৪৬-এর দামামা সে অঞ্চলে কোনও হিন্দুর সম্পত্তি লুটপাট হয়নি। জানি না তারপর কতদিন 'আর্থিক জগৎ' বেঁচে ছিল। তবে সেই অর্থমিতিক পত্রিকা বন্ধ হওয়ার কারণ ছিল অর্থনৈতিক। যতীন্দ্রবাবুর শারীরিক অসুস্থতায় কারণ হতে পারে।

তিনি ছিলেন চেন-মোকার। স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ায়, ডাক্তারের পরামর্শে এক কথায় মুম্বাই হেঁড়ে সেন, কিংবা বলা যায়, হেঁড়ে দিতে বাধ্য হন।

অন্য ঘটনায় আমি। নিরঞ্জনবাবু লিখেছেন, '১৯৫৩ সালে ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন দমন করার সুবাদে পুলিশ কমিশনার সমাজবিরোধীদের দিয়ে (২) সাংবাদিকদের পিটিয়েছিলেন... এই ঘটনার প্রতিবাদে আন্দোলনকারী 'মাতৃগর্ভের লজ্জা' নামে এক জ্বালামারী সম্পাদকীয় ছাপা হয়। জনশ্রুতি ছিল ওটা মতেন মজুমদারের লেখা... আমি শুনেছিলাম ওটা সত্যেই মজুমদারের লেখা কিন্তু আন্দোলনকারী পত্রিকায় চাকরি নেবার পর জানতে পারি ওটা সম্পাদক চন্দ্রলাল ভট্টাচার্যের লেখা। চন্দ্রলালভট্টাচার্য সম্পাদক থাকাকালীন এক এক সপ্তাহ লিখে সেটি বোয়ারার মাধ্যমে প্রেসে পাঠাতেন। আমাকে বোয়ারা বলেছিলেন, ওটা বড়বাবুর লেখা।'

জঙ্কর সাক্ষী। ক্রিয়াপ্রণের শেষে সম্মানসূচক 'ন' লাগানো এবং বোয়ারার বক্তব্য ব্যবহার লক্ষ্যমণী।

নিরঞ্জনবাবু আরও মনে করছেন, 'বোয়ারার দেওয়া খবর অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য।'—ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম?

সুখ নিউজ বার করার জন্য আন্দোলনকারী অনেক সময় বোয়ারাদের কাছে লাগাত। চন্দ্রলালবাবুর মুখেই শুনেছি। কোন সম্পাদক সফল পর সোনাগাছির কোন বাড়িতে যেতেন, পত্রিকার কর্তৃপক্ষ ড্রাইভারের মাধ্যমে সে সংবাদ সংগ্রহ করতেন। বোয়ারা বা ড্রাইভারের কার্ফা কম নয়, মেনে নিচ্ছি। তবে 'মাতৃগর্ভের লজ্জা' লেখাটা কার সে বিষয়ে বিশ্লেষণ করা যাক।

নিরঞ্জনবাবু যদি যোড়ার মুখের খবর বলতে পারতেন, তাঁকে ফুলমার্ক দেওয়া যেত। রেসের যোড়সওয়ারের মুখের খবর হলেনও না হয় তার নির্ভরতা কিছু বাড়ত। এ তো যারা যোড়াকে দলাই-মলাই করে চান্সা রাখে, তাদের দেওয়া খবর। লেখক বোয়ারাদের অপর্ণি বলে সম্বোধন করে তাদের খ্যাতি বোঝাতে বটে তবে তারাও সমস্কার এবং অনুশ্রদ্ধি-স্ব কবে থেকে হল জানি না। হয়ত আন্দোলনকারীদের বোয়ারা অন্য জাতের। স্ট্রিটের চন্দ্রলালবাবু বসন্তে মোতারার এক নড়বড়ে ঘরে। আমি তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্নালিস্টিক্স ক্লাসের ছাত্র। চন্দ্রলালবাবু ছিলেন সে দপ্তরের সেক্রেটারি। আরও দু'একজন ছাত্র মিলে অফিসে দেখতই চলে যেতাম চন্দ্রলালবাবুর ঘরে। সে সময় নিরঞ্জনবাবু এখন বেড়ালাল ছিল না। সোজা চলে যাওয়া যেত। প্রায়ই দেখতাম চন্দ্রলালবাবু বোয়ারা কমলা লেবু খাচ্ছিল তার সব থেকে আগে। আসুন না, আমরা কোনওদিন তার ভাগ পাইনি। যেমন হুমুনাথ বিশী একবার রবীন্দ্রনাথের সোনার

বরণ শাখী দেখে লোভ সংবরণ করতে পারেননি। চাইবা মাত্র তা পেয়েও গেলেন। রবীন্দ্রনাথ রসিক। সেটা ছিল নিমপাতা সিদ্ধ জল।

যাইহোক চন্দ্রলালবাবু নিজে সম্পাদকীয় লিখতেন না, তাঁর একজন চেনা বা সেক্রেটারি ছিলেন, সোমনাথ ভট্টাচার্য। বসন্তে আমার থেকে সোমনাথ বড়। দাদার দ্রাসতন্ত্রে হিসাবে তাকে সোমনাথলা বলে ডাকতাম। সংকুচে এম এ। তবে সাংবাদিকতা ক্লাসে একই বছরে জলযোগ্য করেছি। তখন কাঁধে হাত দেওয়া বন্ধ। সম্পাদকীয় নিবন্ধ চন্দ্রলালবাবু বলে যেতেন, সোমনাথলা লং-হ্যান্ডে তা লিখে নিতেন। লেখা শেষ হলে বোয়ারার হাত দিয়ে লেখাটা পাঠিয়ে দিতেন প্রেসে। সে বোয়ারার উচ্চ ইন্টেলেকচুয়াল লেভেলের পরিচয় অবশ্য আমরা পাইনি।

এখন প্রশ্ন, 'মাতৃগর্ভের লজ্জা' সম্পাদকীয় কার লেখা? তার ভাষা, বক্তব্য এবং পরিবেশনা দেখলে বলা যায়, এ চন্দ্রলালবাবুর কলম-নিঃসৃত নয়। এ ঘটনটা বর্ধনি আগের তাই ঠিক মনে নেই; এটা যোড়ার মুখের খবর ছিল। এক সপ্তাহে বলতে পারেন, তবে তাঁর ঘরে বসেই শুনেছিলাম, 'সত্যেই মজুমদার ওটা লেখেননি। আসলে নেশায় চুর হয়ে গেলো'ব কর্তে চলেছিলেন।'

অনেক পরের ঘটনা, চন্দ্রলালবাবু জার্মানিতে নিমন্ত্রণ পেয়ে ইউরোপে যান। সেখান থেকে লন্ডন গিয়ে আবার বাড়িতে কয়েকদিন ছিলেন। সম্ভবত সেটা ১৯৫৮ সাল; তাঁর বিশেষ সফরের সময়ই বাড়িতে ডাকযোগ্য তাঁকে ডাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়। অবশ্য এ খবর আমি আগেই পেয়েছিলাম। লন্ডনে বরখাস্তের মুক্তি, এম পি হিসাবে দীর্ঘ সময় তাঁকে দমিত্তে কাটাতে হয় সুতরাং তিনি সম্পাদকের দায়িত্ব পালনে অক্ষম। ফলে পত্রিকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তা হতে পারে, তবে বিদায়ের ক্ষমলটটা অভিনব।

পরবর্তী সম্পাদক হলেন, অশোককুমার সরকার— আর্থিক কাম সম্পাদক। তবে অমৃতবাজার পত্রিকার তুমারকান্তি ঘোষের মতো তিনি নিজেই পেশাদার সাংবাদিক বলে পরিচয় দিতেন না। বলছেন, তিনি পেশায় একজন আর্কাইভিস্ট-ও। সেটা তাঁর গর্বের বিষয় ছিল। আর যাই হোক, ব্যবসটা তাঁর পক্ষে ভালভাবে বোকাই থাকারিক। আন্দোলনকারীদের প্রতিষ্ঠা এক ক্রমোন্নতির মূল ওই ব্যবসায়িক বুদ্ধির কাঠামোই। হতে হত।

এই সংযোজনটা হয়ত চিত্রির শেষে পুনশ্চ বোঝার মতো। 'নির্বাসিত সাহিত্যে' আমার মাথা বোকা ছিল এক যুগের মতো। তাই বায়েগুণ্ডি বই প্রসঙ্গে লেখকের অসঙ্গতি উল্লেখ না করে পরামর্শ না। যুগান্তর নেওগও লিখেছেন, 'শরৎচন্দ্রের প্রায় সকল উপন্যাসেরই প্রকাশক ছিল এই সংস্থা। চন্দ্রলাল নিজেও



সনস)। “পথের দাবী” প্রকাশ করে কারারুদ্ধ হয়েছিলেন ওকদাসবাবু। “পথের দাবীর” পাতুলিপি ইরাজ সরকার এখান থেকেই ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকার অফিস থেকে সংগ্রহ করেই বাজেয়াপ্ত করেছিল।

এ মন্তব্যটা লেখকের চোখ বুঁজে অন্ধকারে ঢিল ছোড়া। আর সে ঢিল আসল জায়গায় যা দেওয়া তো দূরের কথা, তার ধারে কাছে যেতে পারেনি। ‘পথের দাবী’ বিটোর সঙ্গে ‘বাংলার ঐতিহাসিক প্রকাশনা’ ওকদাস চট্টোপাধ্যায় আ্যন্ত সনসে’র কোনও সম্পর্ক ছিল না।

এ বিটো কোনও প্রকাশক ছাপাবে না ধরে নিয়ে শরৎচন্দ্র কয়েক পাতা লিখে ফেলে রেখেছিলেন। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ছেলে উমাগ্রসাদ ছিলেন ‘বঙ্গবাণী’ পত্রিকার একজন কাণ্ডারী। তাঁর ইচ্ছে শরৎচন্দ্রের নতুন লেখা তাঁদের পত্রিকায় প্রকাশ করা। তাঁর ‘মহেশ’ এবং ‘অভাগীর বর্ণ’ ইতিমধ্যে ‘বঙ্গবাণী’তে ছাপা হয়েছে। শরৎচন্দ্রের বক্তব্য ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকায় নিবাসিত লেখা দিতে পারছি না, তোমাদের কী করে দেব?

উমাগ্রসাদ শিবপুরে শরৎচন্দ্রের বাসায় ‘পথের দাবী’র কয়েক পৃষ্ঠা লেখা অবিস্মার করেন। শরৎচন্দ্র লেখাটা দিতে শঙ্কিত বোধ করেন। বলেন, তুমি স্যার আন্তোভোয়ের ছেলে, এই লেখা ছাপিয়ে শেষে জেলে যাবে, বিটো বোমার মতো বিস্ফোরক, ছাপালেই জেলে যেতে হবে।

উমাগ্রসাদ উত্তর দিলেন- তা না হয় যাব। আগে তো ছাপিয়ে নিই। বলা বাহুল্য ‘পথের দাবী’ ধারাবাহিকভাবে ‘বঙ্গবাণী’তে ছাপা হতে থাকে। সরকার লারী উচিয়ে থাকে। ফাইল তৈরি। বই হিসাবে প্রকাশিত হলেই বীপিয়ে পড়বে। এম সি সরকার বিটো ছাপাবার জন্য অগ্রিম রয়্যালটি দিয়েও পিছিয়ে গেল। আইনবিদ্যা পরামর্শ দিয়েছিল— এই বই ছাপানো আর

জেলাখানার দরজায় টোকা দেওয়া একই কথা। তার বিশদ বিবরণ লিখলে ‘চতুর্ভুজ’-র সম্পাদক মশাই তাঁর সোনার তরীতে ঠাই নাই ঠাই নাই বলে তেড়ে আসতে পারেন। এর বিশদ বিবরণ আছে আমার লেখা ‘রসিক শরৎচন্দ্র’ বইতে।

‘পথের দাবী’ বইতে আসল প্রকাশকের নামের বদলে সে হুঁড়িকাঠে মাথা গুলিয়েছিলেন উমাগ্রসাদ। প্রকাশক মিলল কিন্তু কোনও ছাপানো বিটায় হাত দিতে চান না। শরৎচন্দ্র একদিন উমাগ্রসাদকে জিজ্ঞাসা করেন— জেলে যেতে হলে কী করবে? উমাগ্রসাদ বলেন শুধু প্রকাশক তো একা জেলে যান না, তার সঙ্গে লেখকও যান। তাঁর দায়িত্ব বেশি। তাহলে দু’জনে একসঙ্গে জেলে কাটানো যাবে।

শরৎচন্দ্র কি ঘাবড়ে গেছেন? বলেন— তাহলে যাতে একটা পড়পড়া নিয়ে যেতে পারি তার ব্যবস্থা করা। কিন্তু আফিং? জেলের মধ্যে তো আফিংয়ের প্রবেশ নিষেধ। শরৎচন্দ্র ঠিক করলেন আফিং খাওয়া ছেড়ে দেবেন। যেমন ভাবা তেমন কাজ। ফলে জুরে পড়লেন। ঘটনাতো উপন্যাসেরও বড়। সূত্রযাত্র সে পাতুলিপি ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকার অফিসের আলমারি জাকিয়ে ছিল— শুনলে আমার মনে হয় wild imagination। ‘পথের দাবী’ বাজেয়াপ্ত করার সরকারি ফরমান লেখার শেষে পেশ করছি যাতে সন্দেহের অবকাশ না থাকে।

এইসব sedition-এর মামলায় লেখক এবং প্রকাশক উভয়ের সশ্রম কারাদণ্ড হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কেউ জেলে যাননি। এর পিছনেও আছে এক চমকপ্রদ কাহিনি জানতে হলে সহজ উপায় ‘রসিক শরৎচন্দ্র’র সন্ধান করা।

হিরণ্ময় ভট্টাচার্য  
কলকাতা-৪৭

Bandyopadhyay at the Cotton Press, 57 Harrison Road, Calcutta and published by Sri Umapada\* Mukhopadhyay, 77 Ashutosh Mukherjee Road, Calcutta, on the ground that the said book contains words which bring or attempt to bring into hatred or contempt and excite or attempt to excite disaffection towards the Government established by law in British India, the publication of which is punishable under section 124A of the Indian Penal Code.

W.D.R. Prentice  
Chief Secretary to the Government of Bengal  
(Offg).

\*উমাপদা ছাপার ভুল

#### A 4. The Calcutta Gazette: January 13, 1927.

##### Political Department: Notification.

No. 103P: The 4th January 1927—In exercise of the power conferred by section 99A of the Code of Criminal Procedure, 1898, as amended by the third schedule of the Press Law Repeal and Amendment Act, 1922 (Act XIV of 1922), the Governor in Council hereby declares to be forfeited to His Majesty all copies, wherever found, of the Bengali book entitled ‘Pather Dabi’ [47] written by Sri Sarat Chandra Chattopadhyay printed by Sri Satya Kinkar

#### Children's Literature in English translation

The Cosmic Explosion	30.00
Jayant V. Narlikar / Tr. Sujatha Godbole	
Gotya	25.00
N.D. Tamkankar / Tr. Sutekha Panandikar	
A Night in the Wood	25.00
Leelavati Bhagwat / Tr. D.R. Bhagwat	
To Catch a Thief	25.00
Gangadhar Gadgil / Tr. Sujatha Godbole	
The Forest Nymph	25.00
Kavi Gopalakrishnan / Tr. Indira Ananthakrishnan	
Fascinating Stories	65.00
Bibhutibhusan Bandyopadhyay / Tr. Ashok Dev Choudhary	
The Flying Doll	40.00
Kavi Gopalakrishnan / Tr. Indira Ananthakrishnan	

#### SAHITYA AKADEMI

Head Office  
Rabindra Bhavan  
33 Ferozshah Road  
New Delhi 110 001



Regional Office  
Jeevan Tara  
23/A/4X, D.H. Road  
Kolkata 700 053

সাঁউথ অব পার্ক স্ট্রিটে একমাত্র বাঙালি রেস্টোরাঁ

পারিজাত

অপেক্ষাকৃত ন্যায্য মূল্যে এখানে পাওয়া যায়

মাছ ও মাংসের বিচিত্র উপাদেয় খাদ্যসম্ভার

বিড়লা তারামণ্ডলের বিপরীতে মাত্র

কয়েক সেকেন্ডের পথ

খিয়েটার রোড ও চৌরঙ্গি রোডের সংযোগস্থল।